সলিল চৌধুরী

জীবন উজ্জীবন

প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড

জীবন উজ্জীবন ॥ সলিল চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা। জানুয়ারি ১৯৯৬

প্রকাশক
প্রিয়ব্রত দেব
প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৭ জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রক
প্রতিক্ষণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১২বি, বেলেঘাটা রোড
কলকাতা-৭০০০১৫

৩৫ টাকা

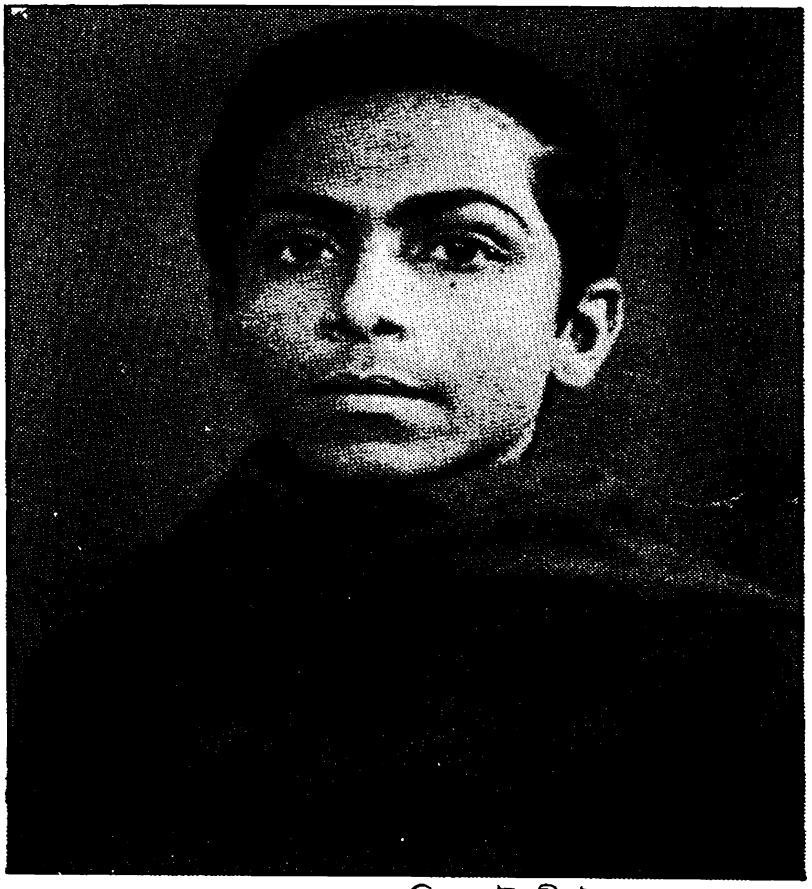

সলিল চৌধুরী কৈশোরে। ১৯৪১

ভাবতীর কোলে অন্তরা

হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সবিতার সঙ্গে

কানু ঘোষ, দ্বিজেন মুখার্জী ও শৈলেন্দ্রর সঙ্গে

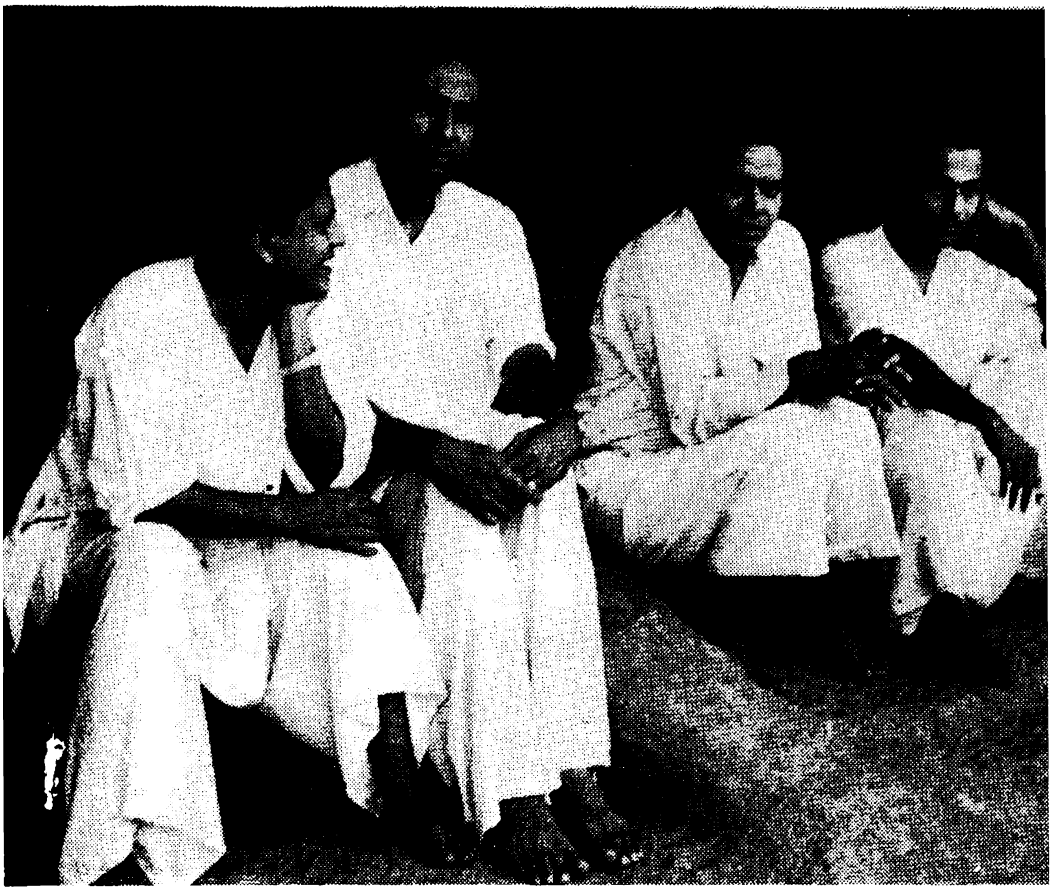

কেরালার ত্রিবান্দ্রমে মাছ ধরার আনন্দে

হস্টেল থেকে ছেলেদের নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে

বোম্বাইতে রেকর্ডিং-এর সময়

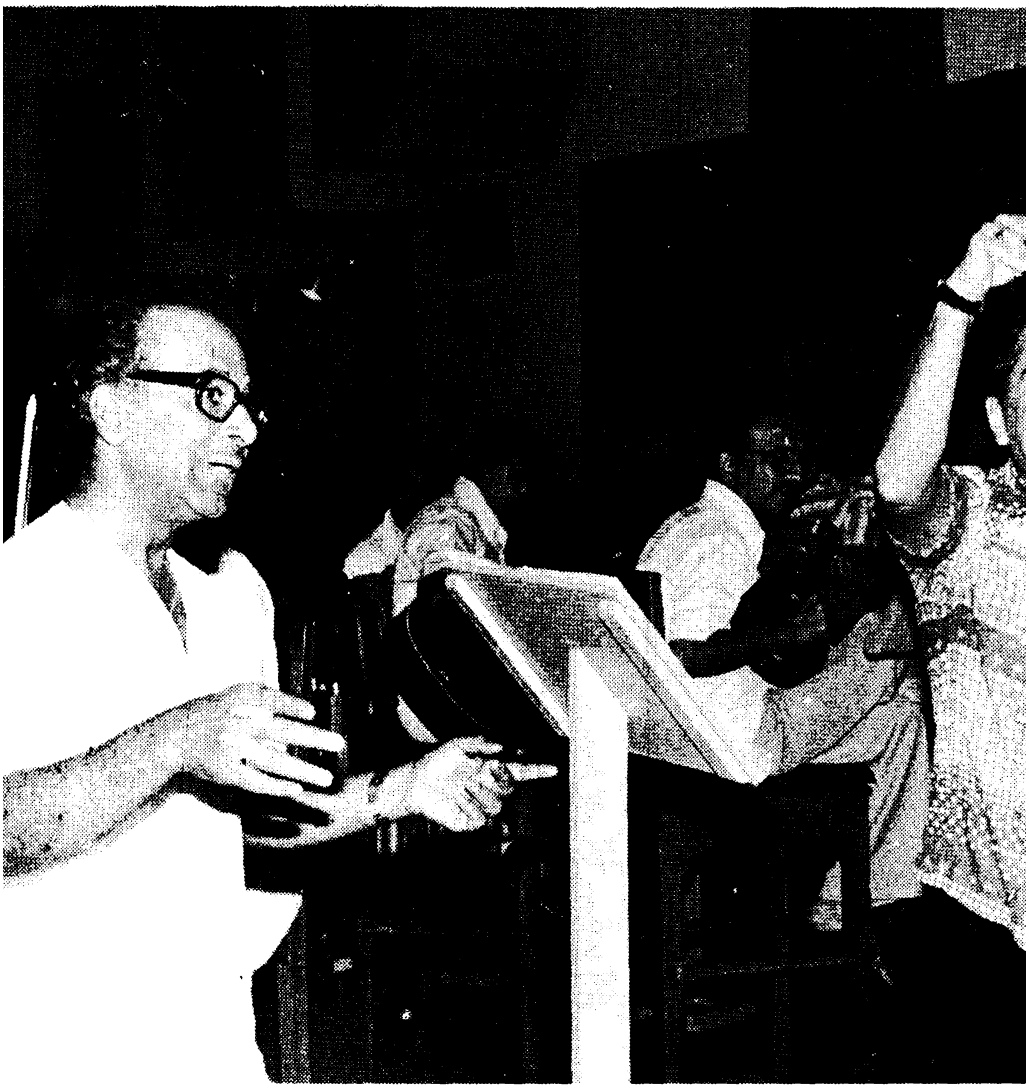

সমবেত সংগীত পরিচালনা করছেন

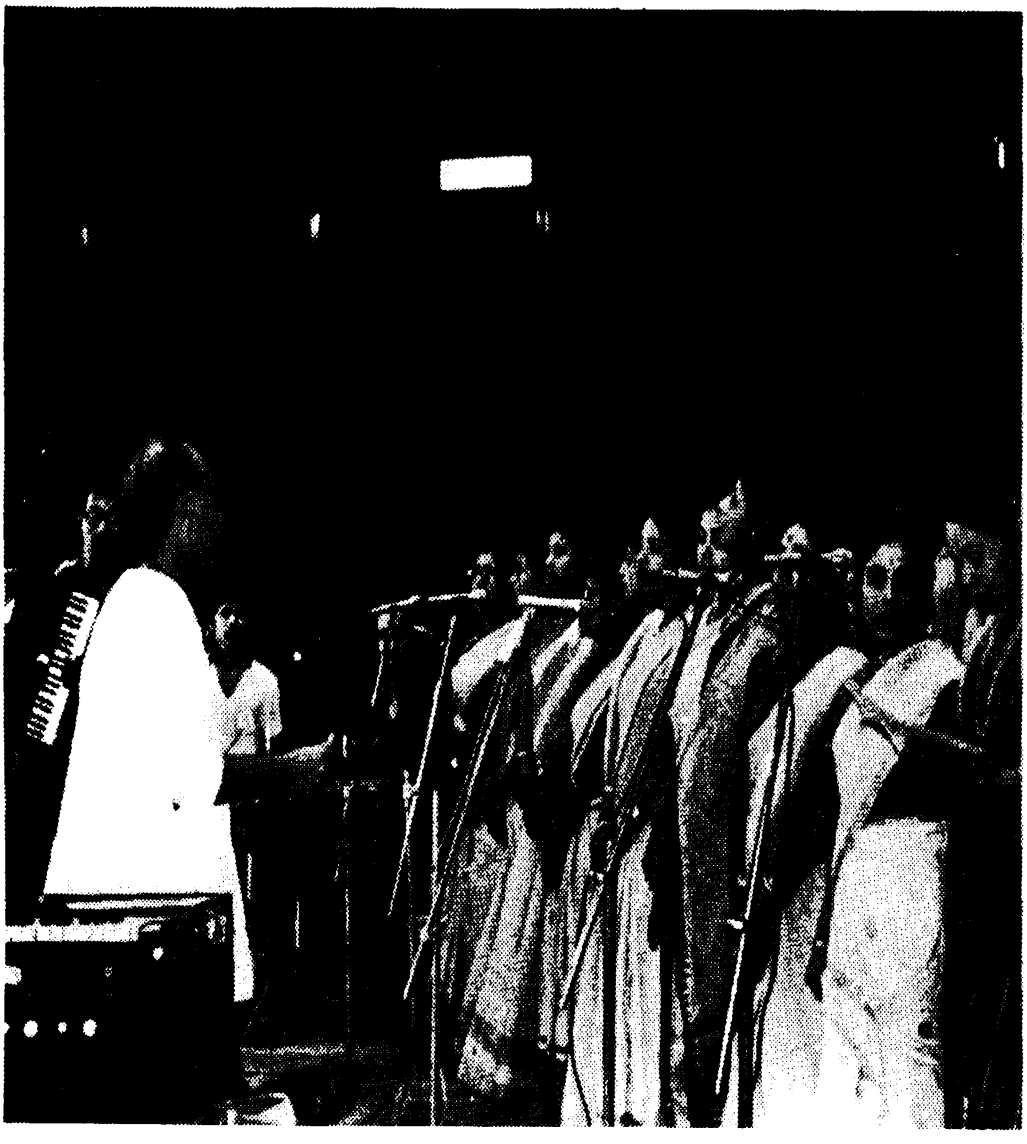

নিজের গ্রাম সোনারপুরে পিকনিক। একেবারে বাঁদিকে সলিল চৌধুরী

এক

আমার তখন বছর তিনেক বয়স হবে। আমার বাবা ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী দুম করে এক কাণ্ড করে বসলেন। আসামের শিবসাগর জেলার লতাবাড়ি চা বাগানের সাহেব ম্যানেজারের তিনটে দাঁত এক ঘুষিতে ভেঙে দিলেন। তখনকার কালের হিশেবে সাহেব খুব একটা অন্যায় করেননি। শুধু বাবাকে বলেছিলেন 'কাম হিয়ার ডার্টি নিগার।' বাবা গেলেন এবং কিছু না বলে—দুম!! এবং নক আউট!! তখনকার দিনের চা বাগানের সাহেব ম্যানেজাররা ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কুলিরা নেটিভদের খুন করে গুম করে ফেললেও কেউ কিছু বলতে পারত না। এ হেন সাহেবকে মার! সারা বাগানে চাপা হইচই। "ডাগদারবাবু সায়েবটির দুটা দাঁত ভাঙিয়া দিলেন।" বাবা একটি বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন। সেটা হল মারার পর কোম্পানির হাতির মাহুতের কথা রেখেছিলেন। সে বলেছিল "তু ইহাঁসে ভাগ যা ডাগ্‌দারবাবু, সায়েব গুলি মারি দিবেক।" হাতির পিঠে চেপে বাবা গেলেন সোজা সিএমও ডাঃ মালোনির কাছে। চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ মালোনি ছিলেন আইরিশ এবং বাবার কাছে শুনেছি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর তাঁর ছিল সহানুভূতি। তিনি রাতারাতি আমাদের স্টিমারে তুলে শীলঘাট থেকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন। আমরা বলতে তখন ছিলাম আমার মা, আমার দাদা, আর আমার ছমাসের ছোট বোন। সেই দ্রুত পলায়নের তাগিদে আমাদের বাড়িতে যা কিছু ছিল বাবা হয় বিলিয়ে নয়তো জলের দরে বেচে দিলেন। শুধু একটি জিনিশ বাবা সঙ্গে নিয়ে চললেন—সেটা হল একটা চোঙা দেওয়া কুকুর মার্কা কলের গান আর শতখানেক ইংরেজি বাজনার রেকর্ড। ডাঃ মালোনি বাবাকে দিয়েছিলেন। আমার বাবার একাধারে এই দুঃসাহস আর আত্মসম্মানজ্ঞান, অন্যদিকে অসম্ভব সংগীতপ্রীতি আমার পরবর্তী জীবনকে গড়ে তুলতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। জ্ঞান হওয়া থেকে এইসব সিম্ফনি রেকর্ড আর হঠাৎ হঠাৎ বাবার দরাজ গলায় আলাপ আমার চৈতন্যে মিশে গেছে। আজ যখন ছোটবেলার কথা ভাবতে চেষ্টা করি বুঝতে পারি আমার বাবা আমার জীবনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছেন। আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে তা হল আসামের কাজিরাঙ্গা অরণ্য আর তার গাছপালা পশুপাখি আর কীটপতঙ্গের অসাধারণ আরণ্যক সিম্ফনি। আজ যখন ছোটবেলার দিন আর বাবার কথা ভাবতে চেষ্টা করি কিছুতেই সেই পরিবেশ বাদ দিয়ে আলাদা করে আর তাকে মনে করতে পারি না।

একটা কথা বলা প্রয়োজন। আসামের চাকরি ছেড়ে আমার বাবা আমাদের পৈতৃক দেশ দক্ষিণ বারাসতে ডিসপেনসারি খুলে বসলেন। কিন্তু দু-তিন বছরের মধ্যেই আবার পাততাড়ি গুটিয়ে আসামমুখী হতে হল। সমস্ত গাঁয়ের লোককে ধারে এবং বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে বাবা যখন পাওনা আদায়ে বেরোতে শুরু করলেন

অমনি শুরু হয়ে গেল বিচিত্র সব কুৎসা। "আসামের জংলি ডাক্তার কিচ্ছু জানে না। কুলির ডাক্তার ভদ্রলোকের চিকিৎসা জানে না" ইত্যাদি। ইতিমধ্যে আরো দু-তিন জন ডাক্তার এসে বসেছে গাঁয়ে। বাবা উত্ত্যক্ত হয়ে আবার ডাঃ মালোনিকে স্মরণ করলেন, আবার তিনিই কাণ্ডারি হলেন। এবার যে বাগানে আমরা গেলাম তার নাম একড়াজান।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগে আসামের গহন অরণ্য, তার আলোছায়া বিচিত্র গন্ধ আর শব্দ চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। সভ্যতা বাড়ছে—জঙ্গল সাফ করে বসতি বসেছে—বিদ্যুৎ এসেছে—মালবাহী ট্রাক আর যাত্রীবাহী বাস ঘড়ঘড় শব্দে ছুটে চলেছে। পশুপাখিরা ভয়ে দূর-দূরান্তে আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। যারা পারেনি তারা লুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষের সর্বগ্রাসী আরো অর্থ আরো মুনাফা আরো ক্ষমতার রথচক্রে আমার সেই ছোটবেলার দিনগুলো পিষ্ট হতে হতে অবলুপ্ত প্রায়। তাকে উজ্জীবিত করে আজকের মানসপটে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা আমার নেই। অথচ মনে হয় এই তো সেদিনের কথা! বাবা বিশাল একটা চিতল মাছ সাইকেলের হ্যান্ডেলে বেঁধে হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালের সামনের মাঠটায় ঢুকছেন। মাছের ল্যাজ মাটিতে ঘষছে। বাবার ডাক শুনতে পাচ্ছি—বাচ্চু! খোকা! শিক্‌গির দেখবি আয়। দাদা আমি ধরাধরি করে সেই বিশাল মাছ নিয়ে বাড়ি ঢুকলাম। মা-র মাথায় হাত। এতবড় মাছ কুটবে কে? বাবা নিজেই লেগে গেলেন বঁটি, দা, ডাক্তারি স্ক্যালপেল ইত্যাদি নিয়ে মাছ কুটতে। তারপর সেই মাছ বিলোনো হল কম্পাউন্ডার, নার্স, ড্রেসার, টানা পাখাওলা, জমাদার সকলকে ডেকে ডেকে। হাসপাতালের প্যান্ট্রিতে পাঠানো হল রুগিদের জন্য। তারপর বাবা বললেন : আজ আমি রান্না করব। ব্যস! হৃদকম্প শুরু হয়ে গেল। বাবার রান্না করা মানে তিনি গ্যাঁট হয়ে একটা মোড়া পেতে বসবেন উনুনের ধারে খুন্তি হাতে, তারপর শুরু হবে: আদা বাটা নিয়ে আয়। ওরে প্যাঁজগুলো কুচে ফেল, সরষের তেল মাত্র এইটুকু?—যা দৌড়ে পাঁইয়ার দোকান থেকে নিয়ে আয়। এই জগা। ধনে জিরে বাটার কি হল! মানে সে তুলকালাম কাণ্ড! তার ওপর এক একদিন বাবার শখ হত তিনি আমাদের খাইয়ে দেবেন। আমরা তখন পাঁচ ভাইবোন সব গোল হয়ে বসব। আর বাবা তরকারি মাখা ভাত এক একজনের গালে তুলে দেবেন—নাক-মুখ ভাতে মাখামাখি। অনুযোগ করলে বাবা সেই ভাতমাখা হাত দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতেন। তাতে আরো ল্যাবড়া লেবড়ি। তার উপর বাবার গল্প চলত "বুঝলি! আজ ওই বুড়ো মুহুরির পাছার ফোঁড়াটা কাটলুম! ওঃ সে কি থাবা থাবা পুঁজ। নে খা—" বলে মুখে ভাত গুঁজে দিতেন। আমরা চিৎকার করে উঠতাম "ওমা! দেখ না!" মা রাগে গজগজ করতেন—ঘেন্নাপিত্তি বলে যদি কিছু থাকে, নিজেই ওয়াক ওয়াক করতে করতে মা বেরিয়ে যেতেন। বাবা গম্ভীর মুখে বলতেন—'ঘেন্না জয় করতে শেখ! লজ্জা ঘৃণা ভয়—তিন থাকতে নয়।' এমনিতে বাবা ছিলেন ভীষণ রাশভারী। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যখন বিদেশ থেকে আগত নানারকম মেডিক্যাল জার্নাল নিয়ে পড়তে বসতেন—কারো সাধ্য থাকত না ট্যা-ফুঁ করবার। আমরা রান্নাঘরে গিয়ে মা-র কাছে বসতুম । কিংবা এক একটা বই নিয়ে বসে পড়তুম। কখন নটা বাজবে। নটা বাজলেই কলের গানে বাবা রেকর্ড লাগাবেন আর খাবার দিতে বলবেন। তখন আবার বাবার অন্য চেহারা।

একবার বাবা হাসপাতালে গিয়ে দেখেন এক বিশাল ষাঁড় হাসপাতালের সিমেন্টের চত্বরে শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছে একেবারে যাতায়াতের পথের ওপর। রুগিরা ভয়ে তাকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করছে না। বাবা কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে নিজের চেম্বারে গিয়ে ডাক

ছাড়লেন 'কম্পাউন্ডারবাবু!' 'দরোসী' (মানে ড্রেসার) ঘনিয়া এক লাফে ষাঁড় ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকল। বাবার হাতে তখন স্মেলিং সল্টের বিরাট জার। ঢাকনা খুলে বললেন—"ষাঁড়কা নাকমে পাকড়ো! ড্রেসার ইতস্তত করতেই বাবার এক ধমক! ঘনিয়া তো পা টিপে টিপে এসে ষাঁড়ের নাক থেকে দেড় হাত দূরে বসে কাঁপতে কাঁপতে সেই খোলা জার ষাঁড়ের নাক বরাবর নিয়ে এল। তারপর যা ঘটল তা চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। সেই বিশাল বিশমণি ষাঁড় গাঁক একটা শব্দ করে শূন্যে লাফিয়ে উঠল প্রায় ছ-ফুট উঁচু। তারপর ভূমিস্থ হয়ে আর একটা আর্তনাদ করে পুচ্ছ তুলে প্রচণ্ড স্পিডে এক নিমেষে মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। রেখে গেল আধমণ গোবর। এদিকে হাসতে হাসতে মেয়ে রুগিরা লুটোপুটি খাচ্ছে। বাবার গম্ভীর মুখে কোনো বিকার নেই। "দাওয়াই আলমারিমে রাখ দো"—বললেন ড্রেসারকে। এমনি বহু খুঁটিনাটি ঘটনায় বাবার মধ্যে শিশুটি বাইরে বেরিয়ে পড়ত। আমরা একদিকে যেমন বাবাকে শ্রদ্ধা করতাম, সমীহ করতাম, অন্যদিকে আবার একবয়সী বন্ধুর মতো ভালোবাসতাম। আমরা ভাইবোনেরা মাঝেমধ্যে এক হয়ে যখন বাবার গল্প করতে বসি তখন শেষই হতে চায় না। অথচ দেখতে দেখতে তিরিশ বছর পেরিয়ে গেল বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু এখনো কি জীবন্ত সাম্প্রতিক মনে হয় সব ঘটনা। বাবা নিজে ডাক্তার ছিলেন বলেই হয়তো আমাদের কারো সামান্য অসুখ করলেই ভীষণ নার্ভাস হয়ে যেতেন। দূরের কোনো বাগান থেকে অন্য ডাক্তার ডেকে আনতেন। আমরা পাশের ঘরে গল্প করতে করতে হঠাৎ কেউ জোরে হেঁচে ফেললাম হয়তো, ব্যস! হয়ে গেল!—কে হাঁচল রে? বাবার আওয়াজ এল। আমার ছোটভাই বাবু সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল—ছোড়দি বাবা! তখনকার দিনে কাশির মিষ্টি সিরাপ ছিল না। খেতে হত ভীষণ তেতো কুইনিন অ্যামোনিয়া মিক্সচার। ছোড়দি মানে আমার ছোটবোন লিলির বানানো প্রতিবাদ—আমার সর্দি হয়নি বাবা! আমি নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে হেঁচেছি। 'মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা বাবা! নাকে কিছু না দিয়েই হেঁচেছে' বলতে বলতে বাবুই আচমকা হেঁচে ফেলল। দুজনকেই খেতে হল কুইনিন অ্যামোনিয়া। এমনি কত ঘটনার কথা মনে পড়ে অসম্ভব স্নেহশীল সুরসিক অথচ কর্তব্যে দৃঢ় সেই পিতার পক্ষচ্ছায়ে আশ্রিত আমাদের সেই সুন্দর ছোট্ট সংসার ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে কে কোথায় হারিয়ে গেল! মা-ও চলে গেলেন। ভাইবোনেরা কেউ বোম্বে কেউ ত্রিপুরা কেউ গ্রামে কেউ কলকাতায় নিজের নিজের সংসার আর বাঁচার তাগিদে সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। সেই সব দিন! গন উইথ উইন্ড!!

লতাবাড়ির চাকরি ছেড়ে যাবার আগে পর্যন্ত বাবা পোশাকে-আশাকে ছিলেন খাঁটি সাহেব। স্যুটবুট ছাড়াও রুমালটা পর্যন্ত আসত তখনকার হোয়াইট অ্যাওয়ে লেডল্-এর বাড়ি থেকে। বারাসাতে ফেরার পর মনে আছে আমাদের বাড়িতে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আর বিদেশী বয়কটের ঢেউ আসতে শুরু হল। কি একটা উপলক্ষে বাবা দু-তিন ট্রাঙ্ক ভরতি দামি দামি স্যুট সব পোড়ালেন ঠাকুরদালানের সামনের মাঠে। গুজব রটল বাবাকে জেলে নিয়ে যাবে। আতঙ্কে কদিন কাটল কিন্তু বাবার স্বাদেশিকতা এটুকু পর্যন্ত ছিল বলেই বোধহয় ইংরেজ আর তাঁকে ঘাঁটায়নি। সেই থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাবা ধুতি আর টুইলের শার্ট পরে কাটিয়েছেন। শার্ট কোনোদিন কেনেননি। মা নিজে কলে সেলাই করে দিতেন। আমার পরবর্তী জীবনে বাবার ওই বিলিতি কাপড় পোড়ানোর ঘটনা গানের মধ্যে এসেছে। 'নাকের বদলে নরুন পেলুম' গানটিতে আছে :

"আমার বাবাও বোকা ছিল
আমি তো তার ছেলে
সে বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে
গিয়েছিল জেলে
আর তোমরা কেমন দেশী সুতোয়
বানালে গাঁটছড়া
তার এক কোণ বাঁধলে গাউনের সাথে
আর এক কোণ গলায় দিয়ে ঝুললুম!!"

আমার মনে আছে আমাদের বারাসাতে থাকাকালীনই চিত্তরঞ্জন দাশ মারা গেলেন দার্জিলিঙে। মনে থাকার কথা নয়, কারণ আমার তখন বছর পাঁচেক বয়স। কিন্তু একটি বাউলের মুখের গানের মধ্যে আমার সেই স্মৃতি বিধৃত হয়ে আছে। তাঁর গান শুনে বাবা তাঁকে বাড়িতে ডেকে এনেছিলেন। তাঁর চেহারার কিছুই আমার মনে নেই। কিন্তু সেই গানের প্রথম কয়েকটি কলি সুর সমেত আজও আমার মনে আছে। গানটি হল :

"চিত্তরঞ্জন
স্বদেশের প্রাণধন
ত্যজিলেন জীবন
দার্জিলিং গিয়ে—"

পরে বুঝেছি আশাবরী রাগাশ্রিত এই সামান্য কটি কথা সুরে যাদুতে কি অসামান্য বিস্তার সৃষ্টি করেছিল আমার শিশুমনে। ছন্দ এবং সুর যে ব্যবহারে জীর্ণ সাধারণ কথাকে কোথায় নিয়ে কোন দিগন্তে পৌঁছে দিতে পারে—এখনো আমার কাছে অজ্ঞাত অখ্যাত এক কবি-সুরকারের গানটি তার নজির হয়ে আছে।

নিজের দেশ গ্রাম থেকে অপমানিত এবং একরকম বিতাড়িত হয়েই বাবা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর কখনো দেশে ফিরবেন না। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর বাবা ওই জঙ্গলে নিজেকে বনবাস দিয়েছিলেন। বই, বিদেশী জার্নাল, ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকা আর গানের রেকর্ড ছাড়া সভ্য জগতের সঙ্গে তাঁর আর কোনো যোগাযোগ ছিল না প্রায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। একড়াজান থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই পদোন্নতি হয়ে বাবা এলেন কাজিরাঙ্গা অরণ্যের গা ঘেঁষা হাতিকুলি, ডিরিং আর রাঙ্গাজান এই তিনটি বাগানের এ এস ও হয়ে। হাজার হাজার একর বিস্তৃত এই বিশাল বাগানের বাবা যেন ছিলেন একচ্ছত্র রাজা। কুলিকামিন থেকে চা বাগানের শিলেটি অসমীয়া মহুরী কেরানি সকলেই শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে। অসম্ভব স্বাধীনচেতা, সহৃদয়, ধবধবে শাদা পোশাক পরিহিত, স্নেহশীল সেই মানুষটির মতো করে পৃথিবীতে আর কাউকে কোনোদিন আমি ভালোবাসতে পারিনি। একেবারে শেষের দিকে জোর করে রিটায়ার করিয়ে মা এবং আমাদের পীড়াপীড়িতে বাবা যখন দেশে ফিরতে সম্মত হলেন—তাঁকে এনে তুললুম কসবার এক ঘিঞ্জি গলিতে দু-কামরার ছোট এক ফ্ল্যাটে। বাবা হাঁপিয়ে উঠতেন। বারবার ফিরে যেতে চাইতেন সেই জঙ্গলাকীর্ণ স্বাধীনতায়। তারপর তিনমাসও বাঁচলেন না। কসবায় কলেরার মহামারী তাঁকে গ্রাস করল। আজ যখন কখনো তাঁকে স্বপ্নে দেখি—দেখি সেই হাতিখুলি বাগানের হাসপাতালে বাবা একা বসে আছেন। কসবার গলির সেই ছোট্ট ঘরে অবচেতন মনেও তাঁকে যেন ভাবতে পারি না। ক্ষোভে হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছে করে। কেন মুক্ত নভোচারী ঈগলকে খাঁচায় বন্দী করলাম। আমার মাঝেমাঝে ভাবতে অবাক লাগে যে

বাবার মতো অখ্যাত অজ্ঞাত কত অসাধারণ মানুষ যে আমাদের বাবা কাকা মামা দাদা বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে আছেন যাঁদের কথা কেউ কোনোদিন জানবে না। অথচ কয়েকটি প্রচার যন্ত্রের মহিমায় কয়েকটি বিশেষ যন্ত্রের দাক্ষিণ্যের সুযোগে কত অতি সাধারণ নগণ্য মানুষ যে প্রখ্যাত বিখ্যাত হয়ে লাঠি ঘোরাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। দুঃখ করে অবশ্য লাভ নেই। বর্তমান যুগই হচ্ছে প্রচারের যুগ, ঢাক পেটানোর যুগ। কোথায় গেল অজন্তা-ইলোরা-কোনারক আর দক্ষিণের শয়ে শয়ে মন্দিরের সেই সব অসাধারণ শিল্পীরা—যাঁদের নাম কেউ কোনোদিন জানবে না।কোন মানসিকতা উদ্বুদ্ধ করেছিল শুধু সৃষ্টির আনন্দেই সৃষ্টি করতে—স্বাক্ষর না রাখতে! বর্তমান সভ্যতার এজাতীয় মানসিকতা কল্পনারও অসাধ্য! আমাদের সিনেমা লাইনে তো কার নাম আগে যাবে কার নাম পরে, কার অক্ষর বড় হবে কার অক্ষর ছোট তাই নিয়ে কত তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে এবং ঘটছে। শুধু সিনেমা কেন এই সেদিন আমাদের এক গণনাট্য শিল্পীর নাম ঘোষণার আগে ঘোষককে বলা হল পৃথিবী বিখ্যাত অমুক বলুন। কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় জানলুম যে তিনি যুব উৎসবে নাকি কিউবা ঘুরে এসেছেন। সে যাকগে।

বাবার কথা শেষ করার আগে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ তথা ভারতবর্ষ জড়িয়ে পড়ার আগে আমরা দুধ কিনতাম এক টাকায় আট সের। খাঁটি ঘি ছিল এক টাকা সের। আসামের গোয়ালারা ছিল অধিকাংশই নেপালি। জঙ্গলের মধ্যে ছিল তাদের ছোট ছোট কুঁড়েঘর। তাদের মোষ চরত জংলি মোষেদের সঙ্গে। তাদের ঔরসেই জন্মাত। অনেক সময়ে প্রেমের অমোঘ মায়ায় জংলি মোষও এসে ধরা পড়ত এদের খোঁয়াড়ে। জীবনযাপন লড়াই করে জঙ্গল সাফ করে এরা চাষবাসও করত এবং দুধের ব্যবসা করত। আজ শুনছি এরা নাকি আসামে বিদেশী। সে যাই হোক—যুদ্ধের গন্ধ পেয়ে বাগানের কাঁইয়া মাড়োয়ারি এই অতি দরিদ্র গোয়ালাদের মোটা টাকা দাদন দিয়ে সব দুধ এবং ঘি হাত করে বসল যুদ্ধে চালান দেবে বলে। একদিন ঘি কিনতে গিয়ে বাবা হঠাৎ শুনলেন, কাঁইয়া বলল—ঘিউ নেহী হ্যায়! মগর আপকে লিয়ে হ্যায় চার রুপয়া সের। কেন? চার টাকা সের কেন?—বাবা জিজ্ঞেস করলেন। কাঁইয়া জানাল, 'যুদ্ধ বেধেছে। নিয়ে যান—আজ চার টাকায় পাচ্ছেন কাল দশ টাকাও হয়ে যেতে পারে।' বাবার অকাট্য যুক্তি "যুদ্ধ যেখানে বেধেছে সেখানে বেধেছে, বাগানে তো বাধেনি। এখানে দর বাড়বে কেন?" সাহেব ম্যানেজারের কাছে নালিশ করেও কিছু হল না। তিনি বাবাকে বোঝালেন যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে প্রধান জাতীয় কর্তব্য ইত্যাদি। মনের রাগ মনে গুমরে বাবা চুপ করে গেলেন। যুদ্ধ যে দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাবে, যুদ্ধে সাপ্লাই করে আর কালোবাজারি করে আজকের অনেক রথীমহারথীদের বাবা দাদা যে কত কোটি টাকা কামিয়ে সমাজের মাথায় চেপে বসবে এবং একমাত্র বাংলায় যে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ 'ফেন দাও ফেন দাও' করে মারা যাবে সেকথা কল্পনাও করা বাবার কেন কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। তাই তিনি ভাবলেন ওই কাঁইয়াটাই বদমাস! ও বেটাকে শায়েস্তা করতে হবে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

এক মাস যেতে না যেতেই একদিন সকালে আমরা চা খাচ্ছিলাম, খবর এল কাঁইয়া এসেছে হাসপাতালে এক্ষুনি বাবাকে তলব করেছে। কেন জিজ্ঞাসা করে জানা গেল তার দাঁতের গোড়া ফুলে ঢোল। অসম্ভব যন্ত্রণায় কাঁইয়ারূপী গাল ফোলা গোবিন্দর বাবা যন্ত্রণায় ছটফটাচ্ছে। বাবা কম্পাউন্ডারকে বললেন, 'ঠিক আছে—বসিয়ে রাখুন

শালাকে।'—অ্যাসপিরিন দেব? —'কিচ্ছু না— থাক বসে।' আমাদের বাড়ি থেকে হাসপাতাল প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে। সেখান থেকেই আমরা শুনতে পাচ্ছি কাঁইয়ার গোঙানি— 'আরে বাপরে, মর গয়া! ডাগদারবাবু বাঁচাইয়ে।' বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর মা অনেক কষ্টে বুঝিয়ে বাবাকে পাঠালেন। আমরা জানলা দিয়ে দেখছি বাবা গিয়েই বললেন, 'কম্পাউন্ডারবাবু দাঁত তোলার বড় সাঁড়াশিটা নিয়ে আসুন।' কাঁইয়া আর্তনাদ করে উঠল 'মর যায়েগা ডাগদারবাবু—দাওয়াই দিজিয়ে।' কাঁইয়ার চিৎকারে ইন্ডোর আউটডোরে রুগিদের বেশ একটা ভিড় জমেছে। বাঘের গলায় হাড় ফোটার মতো অবস্থা আর কি। হাতে সাঁড়াশি নিয়ে বাবা এক ধমক দিলেন 'হাঁ করো'—হাঁ করতেই সাঁড়াশি দিয়ে দাঁতটা বাবা চেপে ধরে একটু করে নাড়ান আর কাঁইয়া চেঁচিয়ে ওঠে— 'মর গয়া'। বাবা বলেন— 'অব বাতাও ঘিউ কা ভাও কেয়া হ্যায়—!' বাগানের কুলি রুগিরা তো হেসে লুটোপুটি! ব্যস ওই পর্যন্তই। মাড়ি ফোলা অবস্থায় দাঁত তোলার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এমনিই ছিল বাবার প্র্যাকটিক্যাল জোক। এবং এটা ছিল শুধু জোকই। কাঁইয়াকে জব্দ করার পিছনে রাগের চেয়ে কৌতুকবোধই তাঁর মধ্যে বেশি কাজ করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

দুই

আমার বাবার গানবাজনা ছাড়া ছিল নাটকের শখ। হাতিখুলি চা-বাগানে বাঙালি অসমীয়া সবাইকে দিয়ে দুর্গাপূজার প্রবর্তন বাবাই করেন এবং সেই পূজা উপলক্ষে প্রতিবছর নাটক অভিনয় হত। বাগানের-কেরানি মুজুরি-বাবুরাই অভিনয় করতেন—পরিচালনা এবং সংগীত পরিচালনা বাবা করতেন। একবারের কথা মনে আছে—তখন আমার বয়স হবে বারো-তেরো বছর। সংগীতে হাতেখড়ি এবং বেশ কিছু যন্ত্রপাতি বাজানোর কিছুটা দক্ষতা তখনই আমি অর্জন করেছি। কেমন করে সে কথা পরে বলব। পুজোর ছুটিতে আসামের বাড়িতে গিয়ে শুনলুম, সে বছর নাটক হচ্ছে ঠিকই তবে বাবা তার মধ্যে নেই। নাটক বাছাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় বাবা ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু অত্যন্ত মনঃকষ্টে আছেন। নিজের হাতে গড়া দল থেকে বেরিয়ে আসতে হল।...কিন্তু তার বদলে মনে মনে যে প্ল্যান বাবা নিয়েছিলেন তখনকার দিনে তা ছিল রীতিমতো বৈপ্লবিক। বাবা ঠিক করেছিলেন 'বেহুলা' পালা নাটক পালটাভাবে করবেন এবং তা করবেন বাগানের মজুর-কুলি ছেলেমেয়েদের দিয়ে। তখনকার দিনে ছেলেরা গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সাজত। বাবার ধারণা ছিল যে ভদ্রঘরেব মেয়েরা পর্দানশীন হতে পারে কিন্তু চা-বাগানের কামিন মেয়েদের তো সে বালাই নেই কাজেই এটাই হবে নাটকের নতুন দিগন্ত খুলে দেবার রাস্তা। এই সব আদিবাসী কোল ভীল সাঁওতাল কয়া জাতির মেয়েদের মধ্যে এমন সব সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা থাকে যারা অনায়াসে ফিল্‌মের হিরোইন হতে পারে। কাজেই বাবার মনে মনে একটা ওয়ার্ম আপ্ জাতীয় ফিলিং ছিল। আমি যেতে বাবা খুশি হয়ে বললেন, 'এই প্রথম ছেলেমেয়ে একসঙ্গে নাটক করবে, বারোটা গান আছে। ছটাতে তুই সুর কর আর ছটা আমি সুর করে রেখেছি। আর কাস্টিং করে ফেলেছি, সন্ধ্যাবেলা বৈঠকখানায় রিহার্শাল। অভিনয় ওরা ওদের চেয়ে ভালো করবে কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বাংলা ডায়লগ নিয়ে। কিছুতেই বলানো যাচ্ছে না। ভাবছি কুলি ভাষাতেই যদি বেহুলা করি, কিন্তু তোর মা-র ভীষণ আপত্তি।' মা বললেন 'দেখ তো, ঠাকুর দেবতা নিয়ে কি ছেলেখেলা! মা মনসা কুলি ভাষায় কথা বলবে?' বাবার যুক্তি;—মা মনসা মোটেই বৈদিক দেবতা নন। তিনি লৌকিক দেবী, কাজেই তিনি যদি কথা বলেন তো আদিবাসীদের ভাষাতেই বলবেন।' আসামের চা বাগানের মজুরদের মধ্যে সারা আসাম জুড়ে এক বিচিত্র ভাষা প্রচলিত আছে। তা হচ্ছে হিন্দি-বাংলা-অসমীয়া এবং লৌকিক ভাষার এক অদ্ভুত খিচুড়ি। 'কাঁহা যাচ্ছিস?'—'কে দিবেক?' 'মাইকী মোটা ছোকরা-ছুকরি সব পাত তুলতে যাইছেং'—মাইকী মোটা—অসমীয়া ভাষায়—স্ত্রীপুরুষ!—শেষ অবধি ঠিক হল মা মনসাকে কষ্টেসৃষ্টে বাংলা বলিয়ে নেয়া যাবে—বাকি সবাই কুলি-ভাষায় কথা বলবে।

এক চামসা-পড়া কোমর ভাঙা কানী বুড়িকে বাবা মনসার পাট দিয়েছিলেন আর এক দো-আঁসলা সাঁওতালি মেয়েকে বেহুলার পাট। সুখিয়া নাম্নী এই মেয়েটির মা সাঁওতাল এবং বাবা ওই বাগানের এক প্রাক্তন ব্রিটিশ ম্যানেজার। রং মাজা-মাজা চোখ কটা এবং চুল যাকে বলে ব্লন্ড-সোনালি রঙের। অসাধারণ সুন্দরি ছিল মেয়েটি। আমার প্রথম যৌবনে এই মেয়েটির একটি ভূমিকা ছিল। সে কথা পরে বলব। তখনকার দিনে সায়েব ম্যানেজাররা ভালো মাইনে দিয়ে ভালো দেখতে কুলি মেয়েকে 'মেম' করে রেখে দিত। তারা ভালো শাড়ি পরত; গয়না, মাথায় পাতাকাটা চুল, পায়ে জুতো, সঙ্গে সঙ্গে একজন আয়া থাকত। বাইরে বেরুলে সেই আয়া মাথায় ছাতি ধরত। হাটের দিনে কতবার এই মেমদের দেখেছি। সাধারণত তারা ছিল ঘৃণার পাত্রী কিন্তু কুলিরা তাদের সমীহ করে চলত। বিলেত চলে যাবার সময় সায়েব তাদের কিছু মোটা টাকা দিয়ে যেত। সুখিয়া ছিল এমনি এক মেমের মেয়ে। শুনেছি অনেক সায়েব অন্য বাগান থেকেও তাকে মেম করতে চেয়েছিল। সুখিয়া পাত্তা দেয়নি। চাঁদ সদাগরের রোলে ইয়া লম্বা চওড়া বিশাল গোঁফওয়ালা হাসপাতালের জমাদার মান্নিয়াকে বাবার পছন্দ, কিন্তু মুশকিল হল সে কুলি ভাষাটাও ভালো করে শেখেনি, বলে তেলেগু ভাষা। বাবা তার ডায়লগ যথাসাধ্য কেটেকুটে হুঁ হাঁ-হঙ্কারের মধ্যেই রাখবেন ঠিক করলেন। রিহার্শাল শুরু হল। সারা বাগানে হইচই মেয়েদের স্টেজে নামানো হচ্ছে। এটা কি ভালো হচ্ছে? বাগানের বাবুদের মধ্যে কলরব। আমি দুটো গান একটু পঙ্কজ মল্লিক স্টাইলে সুর করে বাবাকে শোনালুম। তার আগেই অবশ্য মা আর বোনেরা শুনে ভালো বলেছেন। বাবা শুনে খানিক চুপ করে থেকে বললেন। 'আমার গানগুলোও তুই সুর কর। আমারটা এত ভালো হয়নি।' তাতে অবশ্য আমরা সবাই আপত্তি তুললাম। বলতে গেলে বাবার সহযোগী হয়ে সেই আমার প্রথম সংগীত পরিচালনা। হাতিখুলি থেকে ছ-মাইল দূরে ডিরিং চা-বাগানের হাসপাতালের দায়িত্বে ছিলেন বাবার সিনিয়র কম্পাউন্ডার সুকুমারবাবু। তিনি ছিলেন শিলেটের লোক। অসাধারণ সংগীত রসিক এবং বেশ ভালো তবলিয়া ছিলেন এই সুকুমারকাকা। ছুটিতে আসামে গেলে সন্ধ্যায় বাড়িতে গানের আসর বসত। আর সুকুমারকাকাই হতেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। আমি বাংলা সিনেমার গান এবং রেকর্ডের মৃণালকান্তি ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কমলা ঝরিয়া ইত্যাদির গান হুবহু নকল করে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতাম, সুকুমারকাকা সংগত করতেন। আর আমি গাইতাম পঙ্কজ মল্লিকের গান। তখনকার 'ডাক্তার' ছবির গান 'ওরে চঞ্চল' ছিল আমার প্রিয় গান, তাছাড়া হিমাংশু দত্তের চাঁদ কহে চামেলি গো, কিংবা রাতের ময়ূর ছড়াল যে পাখা, বা নজরুলের 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ' ইত্যাদি ছিল আমার কণ্ঠস্থ। বাবা বাগানের বাবুদের সস্ত্রীক বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে আমার গান আর বাঁশি শোনাবার আসর বসাতেন প্রায়ই। আবার গান শুনে সবাই তারিফ করলে বাবার মুখে গর্ব ফুটে উঠত। বলতেন—আরো ভালো হওয়া উচিত, তারপর খাওয়া-দাওয়া হত। এসবই আমার গলাভাঙার বয়ঃসন্ধির আগের কথা। মেয়েদের মতো মিষ্টি গলা ছিল আমার। তখন ভাবিনি যে সেই গলা ভেঙে একদিন হেঁড়ে আর ভারী হয়ে যাবে। সে যাই হোক বেহুলার মহড়া রীতিমতো চলতে লাগল। ঠিক হল বেহুলার গান আমি গাইব, সুখিয়া ঠোঁট নাড়বে, আর চাঁদ সদাগরের গান গাইবেন বাবা। সবচেয়ে ভালো হল সখীদের সঙ্গে বেহুলার একটা নাচের সিন—মাদলের তালে বাঁশির সঙ্গে একটা সাঁওতালি নাচের দৃশ্য বাবা ঢুকিয়ে দিলেন বেহুলার বিয়ের উৎসবে। বাছাবাছা সাঁওতালি ছেলেমেয়েদের ঠিক

করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেই এল বিনামেঘে বজ্রপাত। পুজোকমিটির মিটিঙে স্থির হল পুজো প্যান্ডেলে মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করানো চলবে না। বাবা থুম হয়ে গেলেন। রিহার্শাল বন্ধ হয়ে গেল। কোনো কথা কাউকে না বলে দুদিন বাবা হাসপাতাল যাওয়া, কলে বেরোনো সব করলেন চুপচাপ, যেন কিছুই হয়নি। তৃতীয় দিনে বাবা হাসপাতাল থেকে ফিরে ঘোষণা করলেন 'নাটক হবে।' কুলিরাই করবে এবং ছেলেরা মেয়ে সাজবে। কাস্টিং হয়ে গেছে।

সেই নাটক মঞ্চস্থ হল। বাবুরা করেছিলেন 'সাজাহান' আর আমরা করলাম 'চাঁদ সদাগর'। একবাক্যে সবাই বললেন, কুলিদের নাটক অনেক ভালো। পরের বছর থেকে পুজোই বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে আছে সে বছর আমি স্টেজে নবদ্বীপ হালদারের কিছু 'কমিক' অভিনয় করেছিলাম। নাকে ক্লিপ দেওয়া এক বিশাল গোঁফ এঁটে খইনি টেপার তালে তালে একবার ডানদিক একবার বাঁদিক করার সময় অট্টহাসিতে চতুর্দিক ভরে গিয়েছিল আজও মনে পড়ে। আমার মা সে কথা মারা যাবার আগে পর্যন্ত প্রায়ই বলতেন, আর বলতেন "তুই ইচ্ছা করলে খুব বড় কমেডিয়ান হতে পারতিস।" প্রসঙ্গত বলি আমার মা অসাধারণ হাসতে পারতেন। তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ রসবোধ—সূক্ষ্ম কৌতুককেও তিনি উপভোগ করতে পারতেন। একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমাদের কসবার বাড়ির বাড়িওয়ালার একছেলের নাম ছিল 'গোদে', তার বড়ভাইয়ের নামটা কারও মনে আসছিল না। আমি বললাম বোধহয় 'বিষফোঁড়া' হবে। মা হেসে লুটোপুটি, ঘরে অন্য যারা ছিল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। মা-ই বললেন তুই জানিস না গোদের ওপরে বিষফোঁড়া। তখন সবাই হাসল। মায়ের কথা পরে বলব। আজকে যখন ভাবি আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের বাবার সেই কুলিদের দিয়ে নাটক করানোর দুঃসাহসিকতার কথা, মনে হয় পরবর্তী যুগে গণনাট্য আন্দোলনে আমার শামিল হবার এবং সংগীতকার হবার বীজ বাবাই নিজের অজান্তে বপন করেছিলেন আমার মধ্যে।

আমাদের বাড়িতে পুজো-আচ্চা ঠাকুর-দেবতা এসবের বিশেষ রেওয়াজ ছিল না, যদিও বাবা-মা ঠিক যে নাস্তিক ছিলেন তা নয়। মনে আছে মা একবার লক্ষ্মী পেতেছিলেন এবং পণ করেছিলেন প্রতি বৃহস্পতিবার প্রসাদ চড়িয়ে ধুপধুনো দিয়ে পাঁচালি পড়বেন। দু-একবার হবার পর মালক্ষ্মী ধূলি ধূসরিত হয়েই পড়ে থাকতেন। তার অবশ্য একটা কারণ ছিল মা-র অসুস্থতা। পিত্তস্থলীতে পাথর জমায় মা অসম্ভব যন্ত্রণায় কাটা পাঁঠার মতো ছটকাতেন। গলব্লাডার অপারেশন তখনকার দিনে মৃত্যুরই নামান্তর ছিল। তাই বাবা কোনোদিন মত দেননি। কিন্তু তাঁর অসম্ভব যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বাবা প্রথম প্রথম পেথিড্রিন, পরে মরফিন ইনেজকসন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। মা-র এই অসুখ ছিল বাবার জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। মা তাঁকে ফেলে আগে মারা যাবেন একথা তিনি চিন্তা করতে পারতেন না। সেই বাবা চলে যাবার পর ২২ বছর মা বেঁচে রইলেন এবং বাবার ভয় এবং সেই দুর্বলতার অভিশাপ মাকে শেষ পর্যন্ত বহন করতে হয়েছে মরফিন এ্যাডিকট্ বা নেশাগ্রস্ত হয়ে দুমাসে একবার থেকে মাসে একবার পরে সপ্তাহে হয়ে তখন শুধু যে প্রতিদিন তা নয় দিনে চার বার পাঁচ বার অবধি মা-র ব্যথা উঠত এবং মরফিন ছাড়া তার উপশম হত না, এই অভিশাপ কাটিয়ে ওঠার বহু চেষ্টা করেও তিনি পারেননি শেষ দিন পর্যন্ত। এই অভিশাপের আর একজন বলি হল আমার সবচেয়ে ছোট বোন কাজল। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা মায়ের পাশাপাশি থেকে তাঁকে ইনজেকশন দেওয়া থেকে খাওয়ানো, পরানো—তাকেই করতে হয়েছে। তাতে তার

লেখাপড়ার, মানসিক বিকাশের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। মা সেটা জানতেন, তাই তাঁর সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা ছিল কাজলের ওপর। যখন মারা যাচ্ছেন তখন এই কাজলই কাছে ছিল না। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তাই শুধু তাকে খুঁজেছেন—হ্যাঁরে, কাজল এল না? কাজল আসেনি? এই ছিল তাঁর শেষ কথা।

যে কথা বলছিলাম ঠাকুর দেবতা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে বাবার একটা থিওরি ছিল, সেটা অনেকটা হেগেলের 'God is not being. He is the becoming' গোছের। বাবা একবার আমাকে বলেছিলেন, দেখ, আগে যখন কুইনিন বেরোয়নি ম্যালেরিয়া হয়ে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত তখন ম্যালেরিয়া হলে রুগিকে বলতুম 'ভগবানকে ডাকো।' কুইনিন বেরোলে ভগবান ম্যালেরিয়া থেকে পিছু হটে কালাজ্বরে বসলেন। আসামে কালাজ্বরে শয়ে শয়ে রোগী রক্ত পায়খানা পেচ্ছাব করে মারা যেত। তারপর এল ডাক্তার ব্রহ্মচারীর ওষুধ। ভগবান কালাজ্বর ছেড়ে নিউমোনিয়ায় এবং টাইফয়েডে বসলেন। বেশ কয়েক বছর গেল। তারপর এল পেনিসিলিন এবং অন্যান্য wide spectrum এন্টিবায়োটিক। এবার ভগবানকে একসঙ্গে অনেকগুলো গদি ছাড়তে হল। এখন আছেন ক্যান্সারে এবং থ্রমবোসিসে। হলে বলি 'ভগবানকে ডাকো।'

হাসির ছলে এইসব কথা বললেও বাবার এই জাতীয় কথা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। খুব ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বর ভাগ্য নিয়তি জন্ম মৃত্যু নিয়ে মনে আলোড়ন এসেছে। তার ফলে একটা একাকিত্ব ও নিসঃসঙ্গতা হই-হট্টগোল ভিড়ের মধ্যে থেকেও বারবার আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। তার ফলে বিশেষ একটা সময়ে দেখা অনেক চেনা মানুষকেও হঠাৎ চিনতে ভুল হয়ে যায়। লোকে ভাবে অহঙ্কারী—জীবনের এক একটা পিরিয়ডকে কেমন ধোঁয়াটে স্বপ্নময় মনে হয়, তার মধ্যে থেকেও যেন থাকিনি। একটা বিচিত্র দ্বৈত অস্তিত্বের অনুভূতি উদ্‌ভ্রান্ত করে মনকে। সেই জন্যই বোধ হয় আমার মধ্যে Possession বা নিজস্বতাবোধটা কম। এর কারণ এও হতে পারে যে আমি প্রায় জন্ম থেকেই প্রবাসী। কলকাতাতেও যখন থেকেছি হয় বোর্ডিঙে, নয়তো ভাড়াভাড়িতে। তাই যখন বম্বেতে আমার প্রাসাদোপম প্রায় কুড়িলক্ষ টাকার বাড়ি—ক্রাইসলার, বুইক ওপেল ফিয়াট সমেত ছটা গাড়ি এবং ১৬ লক্ষ টাকার ছবির কনট্রাকট এক দুর্ঘটনায় ছমাসের মধ্যে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল—আমি জানতাম আমার প্রচণ্ড দুঃখ হওয়া উচিত, কিন্তু কিছুতেই দুঃখ পেতে পারিনি। তার কারণ আমি মনেপ্রাণে ওগুলোকে possessই করিনি। আমি যখন বাসে চেপে কানু ঘোষের হাত ধরে স্টুডিও গিয়েছি বন্ধুবান্ধব শুভাকাঙ্ক্ষীরা অবাক হয়ে ভেবেছেন কেন আমি এখনো পাগল হয়ে রাস্তায় না ঘুরে দিব্বি হেসে খেলে বেড়াচ্ছি। আমার এই জাতীয় মানসিকতার জন্য আমাকে কষ্ট পেতে হয়েছে প্রচুর। হেনস্থা হয়েছি অপমানিত হয়েছি, স্ত্রী বাচ্চাদের চূড়ান্ত দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলেছি। প্রতিবারেই ভেবেছি এবার আমার শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু কোথায়? নতুন নতুন সুর বেরিয়েছে, চিন্তায় ধার এসেছে, ব্যাস ওই টুকুই লাভ। শিক্ষা আমার কোনোদিনই হবে না এ জীবনে। জীবনের জুয়ায় বোকার মতো বারবার ব্লাইন্ড খেলে সর্বস্বান্ত হতে হতে আবার বেঁচে উঠেছি। পথ হারাব বলেই বারবার পথে নেমেছি। তার ফলে.কত যে দেখেছি শুনেছি বুঝেছি—কত মন কত মানুষ কত মুখ কত শরীর কত নিমজ্জন শোকে ভেসে উঠে তীরে ফেরা তার ইয়ত্তা নেই। তাই যখন নিজের কথা লিখব ভাবি খেই হারিয়ে যায় কোথা থেকে শুরু করব—কীভাবে এগোব—কোথায় জীবনের মধ্যবিন্দু—কোথায় আলাপ, কোথায় গৎ কোথায়

ঝালা—কোন রাগ?—কীসে তাল? হাজার মুখ এসে উঁকি মারে, আমাকে দেখ, আমাকে লেখ, আমাকে ভুলে গেছ?—বছর দশেক আগের লেখা কয়েকটা কবিতার ছেঁড়া পাতা সেদিন খুঁজে পেয়েছি। তার একটিতে শেষ কটি লাইন—

"হঠাৎ কেন যে 'তুমি'
হয়ে যাও 'তোমরা'?
আর আমি?
বিচিত্র ফুলের বনে
একা এক ভোমরা।।"

যে কথা বলছিলাম। বাবার জীবন দর্শন বলতে যে বিশিষ্ট কিছু নির্দিষ্ট ছিল বলে মনে হয় না। আমাদের কারোরই বোধহয় তা অব্যয়ভাবে থাকে না। তবে বাবা সংগীতনাটকপ্রেমী হলেও তাঁর মনটা ছিল মূলত বৈজ্ঞানিক। কার্যকারণ বাদ দিয়ে কোনো কিছু তিনি গ্রহণ করতেও চাইতেন না। সাহিত্যপ্রীতি বাবার চেয়ে আমার মায়ের মধ্যে ছিল অনেক বেশি। বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র মা-র প্রায় কণ্ঠস্থ। মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ, গল্পলহরী, দীপালী এই সব পত্রিকার মা ছিলেন নিয়মিত গ্রাহিকা এবং পাঠিকা, বাবা পড়তেন Modern Review আর বিলিতি মেডিক্যাল জার্নাল আর জুরিস প্রভেন্সের বই। সেই জন্য—যখন কোনো তথাকথিত অলৌকিক বা আধিভৌতিক কোনো ব্যাপার ঘটত—তাকে ব্যাখ্যা না করতে পারলে বাবা স্পষ্টই বিব্রত বোধ করতেন। আমাদের বাড়ির গুদাম ঘরের জানালা থেকে দেখলে হাসপাতাল মাত্র তিরিশ গজ দূরে ছিল। এই হাসপাতালে এক এক রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটত যার কোনো ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারত না। বাবার চেম্বারের মধ্যেই সারিসারি আলমারি ভরতি ওষুধের ডিসপেনসারি। হঠাৎ একদিন রাত বারোটা নাগাদ ঝড় নেই বৃষ্টি নেই প্রচণ্ড শব্দে মনে হল আলমারিসুদ্ধ শিশি বোতলগুলো কে যেন আছড়ে ফেলে দিল ঝন ঝন করে। পুরো হাসপাতালটা যেন কেঁপে উঠল, ঘেউ ঘেউ করে কয়েকটা কুকুর ডাকতে লাগল। বাবার এবং মা-র মুখটা যেন শুকিয়ে গেল—আমাদের বললেন: যাও তোমরা শুয়ে পড়। ভয়ে বললাম, কে সব শিশি বোতল যেন ভেঙে ফেলল। বাবা একটা টর্চ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, কিছু ভয় নেই—আমি দেখছি। আমাদের রাত-চৌকিদার জগা তার বিশাল লোহার বল্লম আর হ্যারিকেন নিয়ে ততক্ষণ এসে গেছে। বাবা বললেন; চল দেখি। মাকে জিগ্যেস করতে মা বললেন, এর আগেও দু-একবার ওই রকম শব্দ হয়েছে। অথচ শিশি-বোতল যেমন তেমনি থাকে। কী যে হয় কে জানে! বাবা ফিরে এসে বললেন কিছু নয়—সব ঠিক আছে। তাহলে ওই আওয়াজটা কিসের? বাবার অবশ্য একটা ব্যাখ্যা ছিল সে কথা বলছি। জগার গল্প ছিল এবং সেটা মোটামুটি সব কুলিরাই বিশ্বাস করত যে, অনেক আগে এক সায়েব ডাক্তারকে এক নার্স ছুরি মেরে ওই ঘরে খুন করে, তারপর সে নিজে বিষ খায়। মাঝেমধ্যে সেই ডাক্তারই নার্সের ওপর রাগ দেখায়। বাবার থিওরি হচ্ছে—হাসপাতালে টিনের চাল। সারা দিন রোদ্দুরে গরমে বড় হয়ে সেটা ফ্রেমের মধ্যে বেঁকে যায়। রাতে যখন সেটা ঠাণ্ডা হয়ে যায় নিজের সাইজে এবং স্থানে ফিরে আসে তখন ওই প্রচণ্ড শব্দ হয় এবং সেই শব্দে কাচের আলমারিগুলোও কেঁপে ঝনঝন করে ওঠে। আর একটা ব্যাপার ঘটত।

চা বাগানের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে মিকির পাহাড়ে মধ্যরাতে একটা পাখি ডাকত ঠিক মেয়েমানুষের কান্নার মতো। সেই কান্না সারা পাহাড় বেড়িয়ে যেত মাইলের পর মাইল। যেদিনই ওই পাখি ডাকত হাসপাতালে কেউ না কেউ রোগী মরত। এর কখনো কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। বাবাও আমার মনে হত ওই পাখিটাকে ভয় পেতেন। ওই পাখির ডাক শুনলে হাসপাতালের রোগীরা সব ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যেত—বলাবলি করত আজ কাকে নেবে কে জানে। এবং সত্যিই একজন না একজন মারা যেত। এই অলৌকিক ব্যাপারটা বাবাকে এত বিব্রত করত যে উনি রীতিমতো নিজের ওপরই রেগে যেতেন, যেন ওর অক্ষমতার জন্যই রুগিটা মারা গেল। বাবা যেন নিজেকেই নিজে বোঝাবার জন্য বলতেন—হাসপাতালে এমারজেন্সি ওয়ার্ডে প্রায় সব সময়ই কোনো না কোনো রুগি থাকেই। এদের কুসংস্কার এত গভীর এবং এত ভয় পায় যে ডাক শুনে সিরিয়াস দুর্বল রোগী হার্টফেল করে মারা যায়। জগার কাছে শুনেছি সে এবং কেউ কেউ জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে নাকি ওই পাখিটাকে দেখেছে। বিরাট কালো রঙের পাখি শাদা শাদা গোল গোল চোখ আর মাথায় একরাশ মেয়েদের মতো খোলা চুল। বাবা হেসে বলতেন ন্যাচারাল সায়েন্সে এ জাতীয় কোনো পাখির অস্তিত্বই নেই, ওটা গুল। মা বলতেন একবার নাকি হাসপাতালে সিরিয়াস কোনো রুগি ছিল না। ওই পাখিটা ডাকল আর ডিসেন্ট্রি ওয়ার্ডে একটা রুগি গলায় দড়ি দিয়ে মরল। বাবা উড়িয়ে দিতেন ও বেটা মেনটালি ডিরেনজড আধপাগল ছিল। পাখিটা না ডাকলেও ও আত্মহত্যা করত। একবার এমন ঘটনা ঘটল যে বাবা অবধি তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে না পেরে চুপ করে গেলেন। সালটা হবে ১৯৩৭-৩৮, ঠিক মনে নেই। আমার দাদু মানে মা-র বাবা বেনারসে গিয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন ডবল নিউমোনিয়ায়। টেলিগ্রাম করা হল কেমন আছে জানান। সপ্তাহ খানেক পরে খবর এল দাদু অনেক ভালো আছেন, পরের সপ্তায় দেশে ফিরবেন। মা যেন চিন্তা না করেন। ঘটনাটা ঘটল সেই দিন সন্ধ্যায়। হলঘরে আমরা সবাই গল্প করছি। মা একা রান্নাঘরে রান্না করছিলেন। আমাদের রান্নঘরটা ছিল হলঘরের দরজার বাইরে একটা চওড়া দাবা পেরিয়ে উঠোনের বাঁপাশে। হঠাৎ মা-র প্রচণ্ড আর্তনাদ—বাবা—চমকে উঠে এক দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে দেখি মা মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন—হাতে খুন্তি তখনো শক্ত করে ধরা। ধরাধরি করে মাকে এনে বিছানায় শুইয়ে জলের ঝাপটা, স্মেলিং সল্ট ইত্যাদি দিয়ে জ্ঞান ফেরাতেই মা-র ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না—বাবা গো—তুমি কেন অমন করলে? বাবার অনেক সান্ত্বনা এবং অভয়ের পর মা যা বললেন তা হল এই। রান্না করতে করতে হঠাৎ পিছনে যেন শুনতে পেলেন দাদুর গলা—'ভূমা!' আমার মায়ের নাম ছিল বিভাবতী আর ডাক নাম ভূমা। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখেন দরজায় দাদু দাঁড়িয়ে। মা ভাবলেন হয়তো হঠাৎ অবাক করে দেবেন বলে না বলে কয়ে দাদু আসামে চলে এসেছেন। উঠে দাঁড়িয়ে মা সবে বলতে গেলেন—'তুমি হঠাৎ!' চেহারাটা মিলিয়ে গেল। চিৎকার করে মা অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। বাবা অনেক বোঝালেন, দুশ্চিন্তা থেকে মানুষ ওরকম হ্যালুসিনেস্‌ন দেখে, ওটা কিছু নয়। পরের দিনও সারা দিনরাত মা-র কেঁদে কেঁদেই গেল 'আমি কেন বাবাকে দেখলুম।' তার পরের দিন এল টেলিগ্রাম। শনিবার রাত্রি নটা পনেরো মিনিটে দাদু মারা গেছেন। আর শনিবার রাত্রেই নটা পনেরো মিনিটে মা দাদুকে দেখেছিলেন। এর কি ব্যাখ্যা? সিক্‌সথ সেন্স—টেলিপ্যাথি ইত্যাদি আমি আর দাদা ব্যাখ্যা করতে গেলাম। বাবা গুম মেরে গেলেন। পরে একসময় বলেছিলেন—দেখ! একটা কোকিলেই

বসন্ত হয় না। লক্ষ কোটি ঘটনার মধ্যে একটা বুদ্ধির অতীত অলৌকিক কিছু যদি ঘটেই থাকে তারও নিশ্চয় কোনো কারণ আছে যেটা আমরা জানি না—যেমন আমরা এখনো ক্যানসারের কারণ জানি না। তাই নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো।

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বাবা শেষ পর্যন্ত জীইয়ে রাখতে পারেননি। ভাগ্য নিয়তি 'অদৃষ্ট'কে বাদ দিয়ে বহু কিছু অঘটন বা অপ্রত্যাশিতকে ব্যাখ্যা করার রাস্তা খুঁজে পেতেন না। বিশেষ করে আমার দাদা ও আমাকে বাবা যেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন আমরা তার ধারকাছ দিয়ে না যাওয়ায় তাঁর প্রচণ্ড আশাভঙ্গ হয়েছিল। দাদাকে ডাক্তার করার জন্য বাবা তাঁর সামর্থ্যের বাইরে গিয়েও প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন। স্কুল জীবনে লেখাপড়ায় দাদা ছিলেন অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। তাছাড়া লেখায় অভিনয়ে সংগীতে দাদার বহুমুখী প্রতিভা ছিল। আমার চেয়েও দাদার ওপর মা-বাবার প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। সেই দাদা যখন শেষ পর্যন্ত কি জানি কি কারণে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে রেলে কেরানির চাকরি নিলেন বাবা এটা দাদার 'কপালের লিখন' ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে চাইলেন না। আমার সম্বন্ধেও একই কথা। আমার ঠাকুরদাদা রামতারণ চৌধুরী সেকালের খুব নামজাদা উকিল ছিলেন। বারুইপুর কোর্টে প্র্যাকটিশ করতেন। শুনেছি বঙ্কিমচন্দ্রের কোর্টেও তিনি ওকালতি করেছিলেন। সে যাই হোক বাবার ইচ্ছে ছিল আমি ঠাকুরদাদার নাম রাখব অর্থাৎ বিলেত ফেরৎ ব্যারিস্টার হব। সেই আমি যখন সংগীতকে পেশা হিশেবে গ্রহণ করলুম, বাবা কিছুতেই মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। গানবাজনা ভালো কিন্তু তাকে যারা পেশা করে তারা আর যাই হোক সমাজে গণ্যমান্য বলতে যাদের বোঝায় তাদের থেকে অনেক নীচে তাদের স্থান। কথাটা যে মিথ্যে নয় জীবনে অনেকবার হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। বাবার যুগে তো ছিলই কিন্তু আজ আমাদের যুগেও অরিজিনাল কম্পোজার বা স্বতন্ত্র সুরস্রষ্টা বলতে আমরা যাঁদের বুঝি ইউরোপ বা আমেরিকায় এমনকী জাপানেও তাঁদের যে সম্মান সে তুলনায় এদেশে তাঁদের সম্মান কোথায়। তা যদি থাকত কাজী নজরুলকে তাঁর দীর্ঘ শেষ জীবন পাঁচশো টাকা সরকারি দাক্ষিণ্য নিয়ে মরতে হত না। তিমিরবরণের মতো সুরস্রষ্টা যাঁকে ভারতীয় অর্কেস্ট্রেশনের জনক বলে আমরা জানি তাঁকে মাসিক দুশো টাকা সরকারি ভিক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকতে হত না। উনি যদি স্বতন্ত্র সুরসৃষ্টি না করে সরোদটা নিয়েই চর্চা চালিয়ে যেতেন দেশের লোক মাথায় তুলে নাচত এবং আমেরিকা ইউরোপের সমঝদার মহলের ধনভাণ্ডার খুলে যেত। ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটতে না ঘটতে পেঁচোয় পাওয়া বাচ্চার মতো সামন্ততান্ত্রিক পিসির কোলে যে দেশে মানুষ হচ্ছে, সে দেশে এটাই স্বাভাবিক। শিল্পে সাহিত্যে পোশাকে-আশাকে জীবনযাত্রার ধরণে সবেতেই আমরা মডার্ন—আধুনিক হতে পারি, কিন্তু সংগীতে আধুনিক হতে গেলেই পিসিদের 'গেল' 'গেল' রব উঠবে। আলখাল্লা পরে নেচে বাউল গাও—দেখবে বছরে দুবার আমেরিকা যেতে পারবে—সেতার বাজাও সরোদ বাজাও সারেঙ্গী তবলা বাজাও—ইউরোপ আমেরিকা মাথায় তুলে নেবে। আর ওরা যাদের মাথায় তুলবে, তারা তো আমাদের কাছে ভগবান।

নিজস্ব সৃষ্টি কিছু করতে যেও না—তাহলে আমেরিকাও তোমাকে চাইবে না, আমরাও চাইব না। ওরা আমাদের সাপুড়ে মূর্তিটাই দেখতে ভালোবাসে—যোগী মূর্তি দেখতে ভালোবাসে—কাজেই হয় 'বাবা' হও নয়তো সাপুড়ে হও। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমাদের যে সমস্ত সংগীত সাধক ভারতীয় সংগীতকে বিদেশের মানুষের কাছে পরিচিত করেছেন, দেশে সম্মান এনে দিয়েছেন, তাঁরা সকলেই আমার নমস্য ব্যক্তি,

আমার গুরুস্থানীয়, ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার পাত্র। আমার অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে নয়। আমার অভিযোগ ভারতীয় সংগীতকে যাঁরা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় বেঁধে রাখতে চান, তাকে মিউজিয়ামের বাইরে যেতে দিতে যাঁদের আপত্তি, তাঁদের বিরুদ্ধে। তাতে অর্কেস্ট্রা করতে গেলে অল ইন্ডিয়া রেডিওর বাদ্যবৃন্দের মতো ভ্যাদভেদে রাগসংগীত বাজাতে হবে। সম্প্রতি দিল্লিতে বাদ্যবৃন্দের একজন কম্পোজার কন্ডাক্টর নির্বাচনের জন্য সিলেকশন কমিটিতে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনিল বিশ্বাসও ছিলেন কমিটিতে। ছসাত জন পদপ্রার্থী তাঁদের অর্কেস্ট্রা রেকর্ড করে এনে শোনালেন। তাঁরা সকলেই যন্ত্রী হিশেবে প্রথিতযশা—কিন্তু তাঁদের কল্পনার হাত-পা বাঁধা। লিখিতভাবে না বললেও অলিখিত নির্দেশ বোধহয় আছে রাগ ছাড়া অর্কেস্ট্রা হবে না। তাতে না হচ্ছে রাগ না হচ্ছে অর্কেস্ট্রা। রাগটা খালি বিচারকদেরই হল,ফলে কাউকে নির্বাচন করা গেল না। এত বড় দেশ, যে দেশে হাজার হাজার সংগীত শিক্ষায়তন ছড়িয়ে আছে, শয়ে শয়ে ইউনিভার্সিটিতে সংগীতের ডিপ্লোমা দেয়া হয়—সে দেশে কোথাও কি আছে কি করে কম্পোজ করতে বা স্বতন্ত্র সুরসৃষ্টি করতে হয় তার বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি?—নেই। যা চলছে, যা গতানুগতিক তাই শেখ, নতুন কিছু করতে যেও না। বহুবার বহুস্থানে এ আলোচনা আমি করেছি কিন্তু 'হা হতোস্মি'! কে কার কড়ি ধারে।

স্বতন্ত্র সুরস্রষ্টা হিশেবে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই এদেশে যা কিছু কৌলিন্য পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর শান্তিনিকেতনে সংগীতভবনে কি সুরসৃষ্টি সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া হয়?—না হয় না। রবীন্দ্রসংগীত শেখানো হয় এবং কিছু হিন্দি ভজনটজন শেখানো হয়, অন্য কিছুর প্রবেশাধিকার নেই। কারণ রবীন্দ্রসংগীতই হচ্ছে সমকালীন বাংলা গানের জমিনের শেষ প্রান্ত—তারপরেই বঙ্গোপসাগর। রবীন্দ্রনাথ যে নিজে একথা বিশ্বাস করতেন না তার প্রমাণ তাঁর বহু লেখায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বোধহয় বছর কুড়ি আগে একবার মোহরদি (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়) আমার কথা ও সুরে এইচ এম ভি-র জন্য দুখানা গান্ রেকর্ড করেন। রেকর্ডের টেস্টপ্রিন্টও আমার কাছে এল, এক কথায় অনবদ্য। বম্বেতে হঠাৎ আমার কাছে মোহরদির স্থানে স্থানে চোখের জলে অস্পষ্ট একখানা চিঠি এল—'কর্তৃপক্ষ বলেছেন তোমার গান গাইলে আমাকে শান্তিনিকেতন ছাড়তে হবে। কাজেই আমাকে ক্ষমা কোর ভাই'—ইত্যাদি। গান দুটি ছিল

আমার কিছু মনের আশা
কিছু ভালোবাসা
তাই দিয়ে বেঁধেছি আমার বড় সাধের বাসা
তোরা দেখে যারে।

আর অন্যটি:

প্রান্তরের গান আমার
মেঠো সুরের গান আমার
হারিয়ে গেল কোন বেলায়
আকাশে আগুন জ্বালায়
মেঘলা দিনের স্বপন আমার
ফসল বিহীন মন কাঁদায়।

গান দুটি পরে শ্রীমতী উৎপলা সেন রেকর্ড করেন। ভাগ্যিস সুচিত্রাদি শান্তিনিকেতনে

ছিলেন না, তাহলে তাঁকে দিয়ে 'সেই মেয়ে' গানটি গাওয়ানো আমার ভাগ্যে ঘটত না।

সম্প্রতি এলিজাবেথ অ্যালিসন নাম্নী এক ব্রিটিশ মহিলা বম্বেতে প্রায় ছয় ঘণ্টাব্যাপী আমার এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেন। বিষয়বস্তু—'হিন্দি সিনেমার গান—তার ক্রমবিকাশ এবং আন্তর্জাতিক সংগীতে তার প্রভাব।' এটি হচ্ছে ওঁর ডক্টরেটের থিসিস। আমেরিকার Illionois universityর সংগীতে উনি এম মিউজ্ করে Ethnomuscilogy-র ওপর রিসার্চ করতে ভারতবর্ষে এসেছেন এক বছরের জন্য স্কলারশিপ নিয়ে। আছেন পুনাতে। ফিল্ম ইনস্টিটিউটের archive-এ একেবারে হিন্দি ছবির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তৈরি যা যা আছে দেখছেন। রাইচাঁদ বড়াল, তিমির বরণ, পঙ্কজ মল্লিক থেকে নওসাদ, শচীনদেব, শঙ্কর জয়কিষন মায় বাপী লাহিড়ী পর্যন্ত কাউকে বাদ দেননি মহিলা। বেশ কিছুদিন যাবৎ ভারতীয় সংগীত শিখছেন বাজাচ্ছেন বাঁশের বাঁশি আর ওঁর আমেরিকান স্বামী যিনি বাজান চেলো, শিখছেন সরোদ। পৃথিবীর নানা দেশের সংগীত সম্বন্ধে এত ওয়াকিবহাল মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। ওঁদের কাছেই জানলাম যে পৃথিবীতে জনপ্রিয়তায় হিন্দি সিনেমার গানের স্থান পপ সংগীতের ঠিক পরেই। মহিলা যে কথা বললেন তা হল এই যে সমকালীন ভারতীয় ফিল্ম সংগীতে আধুনিকতম অর্কেস্ট্রেশন পদ্ধতি এবং ভারতীয় সংগীতের সংগতে পাশ্চাত্য রীতির হারমোনি ও কাউন্টার পয়েন্ট ইত্যাদির ব্যবহার যে সার্থকভাবে এ দেশে হয়েছে এবং হচ্ছে একথা পাশ্চাত্যে কেউ জানে না বললেও হয়। আমি ওঁকে বললাম—'শুধু পাশ্চাত্যে কেন, এ দেশে আমাদের সংগীত সমালোচকরাও জানেন না।' রিসার্চ করা তো দূরের কথা হিন্দি সিনেমার গানের নাম শুনলেই তাঁরা নাক সিঁটকে বসে থাকেন। অর্থাৎ বিগত পঞ্চাশ বছরে প্রধানত সিনেমার মাধ্যমে সমকালীন ভারতীয় সংগীতে যে পরিমাণ পরীক্ষা নিরীক্ষা ঘটেছে—তার বিবর্তনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের লোকসংগীত, মার্গ সংগীত এবং পাশ্চাত্যের ক্ল্যাসিকল্ এবং লোকসংগীত ও পপ সংগীতের যে মিশ্রণ ঘটে, তাকে ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় সংগীতে পরিণত করেছে এবং একটি সর্বভারতীয় সাংগীতিক ভাষা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে, এ-বিষয়ে গবেষণার জন্য আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তার জন্য সাগরপার থেকে ছেলেমেয়েরা আসবে। আর আমরা তার অবক্ষয়ের দিকটাকেই বড় করে দেখে তাতে থুথু ছেটাব। সে থুথু স্বভাবতই পড়বে যাঁরা স্বতন্ত্র সুরস্রষ্টা তাঁদের সবার মুখে। কাজেই আমার বাবার ভীতি যে নেহাৎ অমূলক ছিল তা নয়। কিন্তু বেঁচে থাকতেই বাবা আমার রচিত গণনাট্যের গান, গাঁয়ের বধূ, রানার, অবাক পৃথিবী ছাড়া পরিবর্তন, বরযাত্রী, পাশের বাড়ি ইত্যাদি ছবির গান শুনে গেছেন এবং তাঁর শুধু সমর্থনই নয়, প্রাণভরা আশীর্বাদ আমি পেয়েছিলাম। বলছিলাম বাবার যুক্তিবাদী মনের ভিত ক্রমশ নড়ে যাবার কথা। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে বেদনাদায়ক বাবার সেই অসমসাহসী সাহেবের নাকে ঘুসি মারার মন, সাধারণ্যে ঢালাও করে হাজার হাজার টাকার বিলিতি কাপড় পোড়াবার মনটাকে অন্যায় আর অবিচারের সামনে কুঁকড়ে যেতে দেখা—অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেখা। একে একে আমরা আট ভাই বোন তখন তাঁর ঘাড়ে এসে ভর করেছি এবং ক্রমশ বড় হচ্ছি। তাদের মানুষ করার দায়িত্ব। দুরারোগ্য রোগে পীড়িতা মাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব এবং নিজের দেশে ফেরার বিড়ম্বনার স্মৃতি বাবাকে অস্থির করে তুলত। বাবাকে বরাবর দেখেছি হাসপাতালের ওষুধ ইনডেন্ট বা আমদানি করার ব্যাপারে সাহেব ম্যানেজারের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করতে—তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে যে হাসপাতালে কুলিদের জন্য যে ওষুধ আনা

হয় তা সবই প্রায় obsolete অচল, পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশেই তার ব্যবহার হয় না। বাবার দৃঢ় ধারণা ছিল যত রোগী মরে তার শতকরা ৫০ জনকে অন্তত বাচানো যায় যদি ঠিক ওষুধ পড়ে এবং শুয়োরের খোঁয়াড় থেকে মজুরদের যদি একটু স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা যায়। শেষ পর্যন্ত ডাঃ মালোনিকে দিয়ে সই করিয়ে পাস করিয়ে নিতেন বটে কিন্তু যা দামি ওষুধ আসত সাহেবদের জন্যে তোলা থাকত ম্যানেজারের বাংলোয়। মরণাপন্ন কুলি রোগীকে বাঁচাবার সে ওষুধ আছে জেনেও তা আদায় করতে পারতেন না বাবা—রোগী মরত।

অসহায় আক্রোশে আউটডোর রোগীদের বাবা গালাগাল দিতেন—'তোরা মর!—সব শুয়োরের মতো মর, তোদের মরাই ভালো।' অপারেশন করার যন্ত্রপাতি ছিল না। ছিল কয়েকটা স্ক্যালপেল আর কাঁচি। বহু অনুরোধ উপরোধ করেও একটা মাইক্রোস্কোপ বাবা আনতে পারেননি। রক্ত, বাহ্য, পেচ্ছাপ পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয়ের কোনো উপায় ছিল না। রোগ নির্ণয় সবই আন্দাজে হত। সবচেয়ে ট্র্যাজিডি ছিল যে মেডিক্যাল জার্নাল পড়ে পড়ে এবং অভিজ্ঞতায় বাবার ডাক্তারি মন ছিল অত্যাধুনিক আর হাতে ছিল বিগত যুগের অচল চিকিৎসা পদ্ধতি। প্রায়ই রেগে বলতেন—'বুঝলি আমি ডাক্তার নই—নিধিরাম সর্দার। ছেড়ে দোব শালার চাকরি।' আবার পরের দিন সুড় সুড় করে হাসপাতালে বেরোতেন। বাবার অন্তর্দ্বন্দ্ব আর অসহায়তাকে তখন না বুঝে তাঁকে একসময়ে ভীরু ভাবতাম। আজ বুঝতে পারি কত বড় অন্যায় করতাম।

প্রায়ই বলতেন, 'কবে তোরা বড় হবি মানুষ হবি—এই দাসত্বের অপমান থেকে আমায় বাঁচাবি।' সেই আমি কোথায় পাশটাশ করে চাকরি করে বাবার ভার লাঘব করব—তা না করে বাবার কানে গেল আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে ঢুকেছি। দাদার ডাক্তার না হওয়ার পর আমার এই বিচ্যুতি বাবাকে পাগল করে তুলেছিল। আজ করজোড়ে স্বীকার করব বাবার সেদিনের মানসিক যন্ত্রণাকে বোঝার বুদ্ধি আমার ছিল না। আমাদের দুভাইয়ের পর ছ-ছটা ছোট ছোট ভাইবোন এবং রুগ্‌ণা মায়ের দায়িত্ব এবং বাবার কিছুটা অন্তত ভার লাঘবের দায়িত্বকে কী করে অস্বীকার করে একটা বেআইনি পার্টিতে আমি যোগ দিলাম—এই কথা লিখে বাবা আমাকে একটা চিঠি লিখলেন পত্রপাঠ পার্টির সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করে পড়াশোনায় মন দিতে এবং মানুষ হতে। বাবার যন্ত্রণা এবং হতাশাকে না বুঝে আমি উলটে রেগে গেলাম আমার স্বাধীনতায় উনি হস্তক্ষেপ করছেন বলে। লিখলাম আমাকে আর টাকা পাঠাবেন না, আমি নিজের ভার নিজে নিতে পারব।' বাবাকে যে কত বড় আঘাত দিয়েছিলাম তা আজ কল্পনা করতেও আমার চোখে জল আসে। যে মানুষ স্বেচ্ছায় বনবাস নিয়ে নিজের সমস্ত সাধ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে নিজের রক্তজল করা পয়সায় বি এ পাশ করালেন ছেলেকে, সে ছেলে আজ নিজের দায়িত্ব নিজে নিল আর কিছু তার দায়িত্ব নেই! 'এসবই আমার অদৃষ্ট!'—এই হাহাকার তখন থেকেই বাবার জীবনে প্রবেশ করল। আজ ভাবি কমিউনিস্ট পার্টি করে কী এমন তীর মারলাম। মা-বাবার মনে এত বড় একটা আঘাত দিয়ে, তাঁদের প্রত্যাশাকে ধূলিসাৎ করে জীবনের যৌবনের শ্রেষ্ঠ কয়েকটা বছরকে ছাই করে দিয়ে কার কি লাভ হল? যা হারালাম তা তো চিরকালের জন্যই গেল।

তিন

আজ জীবনের প্রায়ান্তে এসে পিছন দিকে যখন সে-দিনগুলোর দিকে তাকাই ভাবি সেই জ্বলন্ত সূর্যের মতো স্বপ্নগুলো কোথায় গেল? কিসের প্রত্যাশায় বাবা-মা ঘরবাড়ি সব ছেড়ে পথকে ঘর করেছিলেন? চোখের সামনে কত তরতাজা ফুটন্ত ফুলকে আগুনে ঝলসে যেতে দেখলাম—তাদের কে মনে রেখেছে?—ছাত্র শহিদ রামেশ্বরের রক্তে আমার গা ভেসে গেছে—বুলেট আমাকেও বিদ্ধ করতে পারত। তাতে পৃথিবীর কার কি যেত আসত এক আমার মা-বাবা ছাড়া? জানি বিপ্লবের জন্য আত্মাহুতি চাই—বিপ্লব কেউ হাতে তুলে দেয় না। কিন্তু যে বিপ্লবকে চল্লিশের দশকে পথের মোড়েই আমরা দেখতে পেতাম—আহার নিদ্রা সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং বেঁচে থাকাকে অবধি বাজি রেখে নেতাদের কথায় যার জন্য ব্লাইন্ড খেলেছিলাম সে বিপ্লবটা গেল কোথায়? কে সৃষ্টি করেছিল সে মরীচিকা যার প্রলোভনে হাজারো কয়েকের ঘর পুড়ল—শয়ে শয়ে অহল্যা মরল—শ্রমিক ছাত্রের রক্তে রাজপথ ভাসল? আমাদের সে-দিনের স্বপ্নের সারথি স্তালিনকে, মাও-সে-তুংকে কারা হত্যা করল? রুশকে চীনের—চীনকে রুশের শত্রু কারা করাল?

বিপ্লবের আতসবাজির মতো শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে কারা দল ভাঙাল? এর জবাব কে দেবে? যাঁরা বলবেন সেদিনের নীতি ভুল ছিল, তাঁরা তো দিব্যি বেঁচেবর্তে রয়ে গেছেন—সে ভুলের মাশুল যারা দিল তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে? জানি এর জবাব দেবার কেউ নেই। উত্তরে শুধু কয়েকটা বিশ্লেষণ শোনা যাবে—'প্রতিক্রিয়াশীল! সুবিধাবাদী! কেরিয়ারিস্ট!' যে বয়সে এসব কথা শুনলে মনে হত জীবনটাই বৃথা গেল, সে বয়েস বহুদিন পেরিয়ে এসেছি। এখন এত দেখেছি—এত শুনেছি যে এ সব কথা শুনলে কাতুকুতু লাগে—হাসি পায় ভীষণ!

বাবাকে লিখলাম বটে টাকা পাঠাবেন না, কিন্তু বাবা প্রতি মাসে টাকা পাঠাতেন মামার বাড়ির ঠিকানায়। আমি নিতাম না।

সে টাকা ফেরত চলে যেত। মায়ের কাছে শুনেছি এক একবার টাকা ফেরত যেত আর বাবার চোখ থেকে নিঃশব্দে জল পড়ত। মা রাগ করতেন—খবরদার তুমি আর টাকা পাঠাবে না—ও ছেলে উচ্ছন্নে গেছে—চুলোয় যাক। কিন্তু বাবা পাঠাতেন যতদিন আমার ঠিকানা ছিল ততদিন। তারপর আমার ঠিকানাই গেল হারিয়ে। সেটা ছিল ১৯৪৬ সাল। বাংলায় এমএ পরীক্ষা দিচ্ছি তখন। বোধহয় তিনটে কিংবা চারটে পেপার পরীক্ষা দিয়েছি, টেলিগ্রাম এল বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে শিলং হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে—appendix অপারেশন হবে। একা আছেন। বাবা জানতেন আমার পরীক্ষা চলছে তাই নির্দেশ ছিল কিছুতেই যেন আমি না টের পাই। পরীক্ষা

চুলোয় গেল। আমি ছুটলাম শিলং। যেদিন পৌঁছুলাম সেদিনই সকালে বাবার অপারেশন হয়েছে। তখনো জ্ঞান হয়নি। শেষে যখন নার্স ভেতরে যাবার অনুমতি দিল বাবার আচ্ছন্ন চোখ আমাকে দেখে যেন হঠাৎ ঝলসে উঠল—বললেন—পরীক্ষা? মিথ্যে কথা বললাম, 'শেষ হয়ে গেছে।' বাবা চোখ বুজলেন প্রশান্তিতে। হাসপাতালে বাবার দশ দিন থাকাকালীন সে মিথ্যাকে জিইয়ে রেখেছিলাম। তারপর হাতিকুলি ফেরার পথে ট্রেনে বাবাকে বললাম—তিনটে পেপার দিতে পারিনি।—'কেন?' বললাম টেলিগ্রামের কথা। আসলে বাবা যে বারণ করেছিলেন এবং মা ভয় পেয়ে আমাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন আমি তা জানতাম না। মায়ের ওপর বাবার যে রাগ আমি দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলব না। যে মাকে বাবা কোনোদিন একটা কড়া কথা অবধি বলেননি, সেদিন তাঁকে দায়িত্বজ্ঞানহীন, অশিক্ষিতা, গেঁয়ো ইত্যাদি বলে বাবা বকলেন। মা-র কাঁদা ছাড়া কোনো রাস্তা ছিল না। সবচেয়ে অপরাধী লাগল আমার নিজেকে! কেন বললাম টেলিগ্রামের কথা।. যাই হোক বাবাকে কথা দিলাম পরের বছর আমি পরীক্ষা দেব এবং ফার্স্ট ক্লাস পাব নিশ্চয়ই। কিন্তু আসাম থেকে ফিরেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিপ্লবে। এমএ-র ছাপ নেওয়া আর হল না। এর আগে বিএ ডিপ্লোমা দেবার কনভোকেশন আমরা বয়কট করেছিলাম—গভর্নর ফেসী যার হাত ছাত্রদের রক্তে রাঙানো তার হাত থেকে নেব না বলে। বাবার প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল আমার গ্রাউন পরা হাতে ডিপ্লোমা নেয়া ছবি ঘরে বাঁধিয়ে রাখবেন। তাঁর এই সাধের মূল্য সেদিন বুঝিনি—বলেছিলাম কি হবে বাবা ক্লাউনের মতো ওই ছবি ঘরে রেখে? আজ বুঝতে পারি কত সামান্য জিনিশই তিনি চেয়েছিলেন এবং চাইবার তাঁর হাজারবার অধিকার ছিল, আর সেটুকু সাধও নিজের অহংকারে আমি ভরাতে পারিনি। তাঁকে কেবল আঘাতের পর আঘাতই দিয়েছি আমার তথাকথিত বিপ্লবী মন দিয়ে। বাবা দ্বিতীয়বার কোনো কথা বলেননি। নিশ্চয় বুঝেছিলেন অর্বাচীনকে বলে কোনো লাভ নেই। বাবার এক অদ্ভুত আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল এবং সেটাকে তিনি মৃত্যুর শেষ নিশ্বাস অবধি জীইয়ে রেখেছিলেন। বাবার হয়েছিল কলেরা কিন্তু চিকিৎসা বিভ্রাটে তিনি মারা গেলেন স্যালাইন ওভার ডোজে। কসবায় সেবার কলেরার মড়ক লেগেছে—ডাক্তারদের নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। কাকে কী ওষুধ দিচ্ছে, কতবার দিচ্ছে তার হিশেব রাখবার সময় নেই। শকুনির মতো ভাগাড়ে ভাগাড়ে ঘুরতে হচ্ছে। আমার মনে আছে বাবা ডাক্তারকে বারণ করেছিলেন স্যালাইন আর দিতে, কিন্তু তাঁরা বাবাকে চুপ করিয়ে দিলেন এই বলে যে আপনি এখন ডাক্তার নন রোগী, কাজেই তাঁর চুপ করে থাকাই বাঞ্ছনীয়। শুধু বাবা একা নন আমার তিন বছরের ছোট বোন কাজল এবং নয় বছরের ছোটভাই মুনুরও (সুহাস চৌধুরী—এখন অল ইন্ডিয়া রেডিওর এ এম ডি) কলেরা। দুজন মেঝেতে পড়ে আছে স্যালাইনের টিউব লাগিয়ে। বাবা মারা যাবার ঘণ্টাখানেক আগের কথা বলছি। মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে—কাজল মুনুর সমানে বমি আর পায়খানা চলছে, বোনেরা দেখছে। বাবার পেচ্ছাপ বন্ধ হয়ে গেছে—ইউরিমিয়া। কিডনির অসম্ভব যন্ত্রণায় ছটকাচ্ছেন। বাবার যা কিছু ময়লা আমি নিজ হাতে পরিষ্কার করতুম—তিনদিন তিনরাত পরপর জেগে মাঝে মাঝে ঢুলুনি আসছে। তখন সন্ধ্যা প্রায় আটটা, বাবা আমায় ডেকে বললেন—'বাচ্চু, আমার ওই কাঠের বাক্সে দেখবি পেথিড্রিন আছে আর সিরিঞ্জ। একটা অ্যাম্পুল ভেঙে আমাকে একটা ইনজেকশন দে বাবা—আর আমি সহ্য করতে পারছি না।'

আমি জানতুম বেলেডোনায় চামড়া টেনে ধরে আরো ছোট করে দেয়—কাজেই

পেচ্ছাপের থলি নিশ্চয় আরো shrink করবে। বলতে বাবা বললেন, 'আমি জানি, আমাকে শেখাসনি। আমি যা বলছি তাই কর।' তখনো যদি জানতাম বাবা আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চলে যাবেন নিশ্চয় দিতাম ইনজেকশন, বাবাকে অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাতে। আমি বললাম 'না বাবা, ডাক্তার না বললে আমি দিতে পারব না।'

—আমি ডাক্তার নই? কত হাজার কলেরা রোগীর আমি চিকিৎসা করেছি। আমি যা বলছি শোন। বাবা কাতরভাবে বললেন। আমি বললাম, 'না আমি দেব না।' একটি বার শুধু স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আর একটি কথাও না বলে বাবা চোখ বুঝিয়ে পাশ ফিরলেন। তার ঠিক পরেই তাঁর শ্বাস উঠল। মারা যাবার মিনিট খানেক আগে আমার মাথাটা বুকের ওপর টেনে বললেন 'সব রইল বেঁচে থাক বাবা'—সেই তাঁর শেষ কথা।

মাথার উপর বিশাল বটগাছের মতো যে বাবা এতদিন সব চিন্তা ভাবনার ঝড় ঝাপটা কড়া রোদ্দুরকে ঠেকিয়ে এসেছেন তিনি চলে গেলেন। আমার পৃথিবী শূন্য হয়ে গেল। সেটা ১৯৫১ সাল। আমার সমস্ত দায়িত্বহীনতা আত্মমন্যতাকে চূড়ান্ত সাজা দিয়ে মাথার ওপর বিধবা মা চার বোন দুই ভাইকে চাপিয়ে বাবা হয়তো মনে মনে বলে গেলেন, "এবার দেখি তুই কি করিস।" আমার পুরোনো পৃথিবী চোখের সামনে বিরাট ধসের মতো তলিয়ে গেল—সেদিন থেকে আমার জীবনের মানে গেল বদলে। মাকে বাঁচাতে হবে, ছোট ছোট ভাইবোনগুলোকে মানুষ করতে হবে, এই প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া চিন্তা আমায় পেয়ে বসল।

তার মানে কিন্তু এই নয় যে বাবা মারা যাওয়ার পর বিধবা মা আর ছটি ছোট ছোট ভাইবোনের দায়িত্ব মাথায় চাপল বলেই আমার জীবনের মানে বদলে গেল। মানে বদলাচ্ছিল আগে থেকেই। বাবার মৃত্যুটা ছিল শেষ আঘাত, যাকে বলে last nail in the Coffin. আমার সৃষ্টিশীল শিল্পী জীবনের সঙ্গে সমাজে সুস্থ মানসিকতা এবং বিপ্লবী চেতনা গড়ে তোলার কাজে শিল্প সাহিত্য সংগীতের ভূমিকা নিয়ে সংকীর্ণতাবাদী স্থূল দৃষ্টিভঙ্গির বার বার সংঘাত ঘটেছে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে প্রগতি সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীণ ধ্যান ধারণার অভাব এবং সংকীর্ণ নীতি গণনাট্য আন্দোলনকে বার বার দিশাহারা করেছে। সর্বভারতীয় গণনাট্য সম্মেলন থেকে আমাদের শুনতে হয়েছে তৎকালীন পার্টি সম্পাদক অজয় ঘোষ বলেছেন—"সংস্কৃতি ফংস্কৃতি নিয়ে এখন ভাববার সময় নেই, নেতৃত্বে রদবদলেরও প্রয়োজন নেই। যা চলছে চলুক!" স্বভাবতই পার্টি নেতৃত্বের সংস্কৃতি আন্দোলন সম্বন্ধে যখন কোনো পরিষ্কার নীতিই নেই, তখন পার্টি সময়ে সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের যে কৌশল বা নীতি নির্ধারণ করে তাকেই গানে নাটকে রূপ দেওয়াটাকেই আমাদের শিল্পীরা কমিউনিস্ট শিল্পীর দায়িত্ব বলে মনে করলেন। এরই ফল হল শ্লোগানধর্মী গানের পর গান এবং স্থূল চরিত্রের কিছু নাটক। আমি এই জাতীয় শিল্পরচনার বার বার বিরোধিতা করেছি, মৌলিক রচনা করতে চেয়েছি, ফলে চূড়ান্ত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। পার্টির বিভিন্ন গণআন্দোলনের ভিত্তিতেই আমার অধিকাংশ গণসংগীত রচিত হয়েছে বটে কিন্তু সততই সচেতনভাবে চেষ্টা করেছি যাতে সেগুলি স্থানকালের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানুষের চিরন্তন সংগ্রামের সাথী হতে পারে। কতটা পেরেছি না পেরেছি সেটা আলাদা কথা। স্বাধীনতার পর পার্টি লাইনের ভ্রান্তি এবং উগ্র বাম বিচ্যুতিই গণনাট্য আন্দোলনকে শেষ করে দিল। সাহিত্যিক

শিল্পী-সংগীতকার নাট্যকার-অভিনেতাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এসে যেখানে ভিড় করেছিলেন অতিষ্ট হয়ে পালাবার পথ পেলেন না। যাঁরা কামড়ে পড়ে থাকলেন চূড়ান্ত অবহেলায় আর দুর্দশায় জীবনপাত করে একদিন হয় শেষ হয়ে গেলেন নয়তো ধ্বংসস্তূপের মতো বেঁচে রইলেন। প্রচুর বেদনার স্মৃতি এই সব শিল্পীদের কেন্দ্র করে জমা হয়ে আছে মনে। প্রসঙ্গত এসে পড়লেও এসব কথা আলোচনার আদৌ ইচ্ছা আমার ছিল না কারণ আমি আমার জীবনের কথা বলতে বসেছি—গণনাট্যের ইতিহাস লিখতে বসিনি। সে ক্ষমতাও আমার নেই। তবু একথাও ঠিক আমার শিল্পী জীবনের এক মূল্যবান অধ্যায় সৃষ্ট হতে পেরেছিল গণনাট্য আন্দোলনের দৌলতে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত যে বিচিত্র সংস্কৃতির ভাণ্ডার যুগ যুগ ধরে মানুষ জীইয়ে রেখেছে—তার সঙ্গে পরিচিতিও ঘটেছে প্রধানত সর্বভারতীয় গণনাট্য সম্মেলনগুলির মধ্য দিয়ে। কত সুর কত ছন্দ কত প্রকাশভঙ্গি কত বাদ্য এক জায়গায় একত্রে আর কোথায় পেতে পারতাম? গোর্কির মতো বলতে ইচ্ছে করে, "এগুলিই ছিল আমার সংগীতের বিশ্ববিদ্যালয়!"

চল্লিশ দশকের একেবারে শেষের দিকের কথা। আমি বুঝতে পারছিলাম চূড়ান্ত বাম-বিচ্যুতির মধ্যে শিল্পী হিশেবে দম আটকে মরা ছাড়া আমার কোনো গত্যন্তর নেই। 'গাঁয়ের বধূ' গানকে গণনাট্যের আসরে নিষিদ্ধ করা হল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পালকির গান' প্রতিক্রিয়াশীল ঘোষিত হল। আর একটি গান, যেটি আমাদের তখনকার ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রিটে ঝড় তুলেছিল:

সেটি হল সন্ধ্যা মুখার্জির গাওয়া এইচ এম ভি রেকর্ডে আমার গান—'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে'। সংস্কৃতি নেতারা ঘোষণা করলেন এটি একটি প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার ফসল। ওটা গণনাট্যে গাওয়া তো যাবেই না বরং এই ধরণের গীত রচনার জন্য একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। আপত্তি হল প্রধানত 'বিধি' এই কথাটি ব্যবহারের জন্য। গানটির কথা লিখে দিচ্ছি পাঠকদের সুবিধার জন্য:

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে
আয় রিমঝিম বরষার গগনে
কাঠ ফাটা রোদের আগুনে
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে আয়রে।
হায় বিধি বড়ই দারুণ
পোড়া মাটি কেঁদে মরে ফসল ফলে না
হায় বিধি বড়ই দারুণ
ক্ষুধার আগুন জ্বলে আহার মেলে না
কি দিব তোমারে নাই যে ধান খামারে
মোর কপাল গুণে
কাঠ ফাটা রোদের আগুনে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপত্তি হল 'হায় বিধি' কেন বলা হবে তাই নিয়ে। কমিউনিস্ট শিল্পী হয়ে ভগবানের নাম নেওয়া কেন? 'হা ভগবান'! বা 'হায় আল্লা'! যে বাংলা ভাষায় একটি এক্সক্লামেশন বা উচ্ছ্বাসের প্রয়োগ—শাব্দিক অর্থে তার মানে হয় না—একথা বোঝানো গেল না। আমি যখন প্রশ্ন তুললাম—আপনারা 'আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে' গানটা কি করে গান গণনাট্যের

মঞ্চে? ওঁদের যুক্তি হল ওটা প্রচলিত গান। কাজেই ওতে বাধা নেই।

'বিধি' কথা ব্যবহার করে আমি নাকি 'ঈশ্বরবাদ' এবং 'ভাগ্যবাদ' প্রচার করছি। এরপর কিছু বলার থাকে না। প্রধানত আমাকে সেনসর করার জন্য বিচারকমণ্ডলী তৈরি হল।

তাঁরা গান শুনে পাস করলে তবে সে গান গণনাট্য মঞ্চে গাওয়া যাবে। কারা হলেন বিচারক? সে কথা আর বললাম না। জ্বলে যাওয়া আগ্নেয়গিরির মতো তাঁদের কেউ কেউ বক্ষে ফুটো নিয়ে আজও বেঁচে আছেন চূড়ান্ত হতাশার শিকার হয়ে। তাঁরা আজ পার্টিতেও নেই।

মন বিদ্রোহ করে উঠল, আমি শোনাব না। কতকগুলো অসুরের কাছে আমায় পরীক্ষা দিতে হবে? এরাই পার্টির সংস্কৃতির ধারক-বাহক? ছবছর বয়স থেকে সংগীত শিক্ষা শুরু করে, সংগীতকেই ধ্যান-জ্ঞান করে কত শত ঘণ্টা তার পিছনে ব্যয় করে সেই শিক্ষাকে দেশের কাজে ব্যয় করব বলে জীবনের এতগুলি অমূল্য বছর পথে পথে অনাহারে পুলিশের তাড়া খেয়ে হন্যে কুকুরের মতো ঘুরেছি কিসের জন্য, কোন আদর্শে? সেই আদর্শের ধ্বজাধারীদের বুদ্ধির আর মুখের চেহারা কি এই?

এতদিন পার্টি বলতে এক বিমূর্ত আদর্শ উদ্বুদ্ধ করত আমাদের, তার জন্য হেলায় প্রাণ দিতেও পিছপা হতাম না আমরা। তখন পার্টি বলতে কতকগুলো মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল যাঁরা সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে বসেছেন। আমার আত্মত্যাগের এক শতাংশও যাঁরা করেননি—শহরে বসে লাঠি ঘুরিয়ে যাঁরা ইনটেলেকচুয়াল হয়েছেন। মৃত্যুর মুখোমুখি জীবনে কোনোদিন হননি। আমি তার বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহ করলাম। শুনলাম ডিসিপ্লিন ভঙ্গের অপরাধে আমাকে পার্টি থেকে বের করে দেয়া হবে। গণনাট্যের যতগুলি বিখ্যাত গান তার অধিকাংশই তখন আমি রচনা করেছি, সুকান্তর 'অবাক পৃথিবী', 'রানার' সুর করেছি—সাধারণ্যে তা আগুনের মতো ছড়িয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও, একবার নয় দুবার নয় বার বার ছাত্র আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন করতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি—তা সত্ত্বেও, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোনারপুর অঞ্চলে কোদালিয়া, মালঞ্চ, মাহিনগরে পার্টির ভিত্তি আমিই স্থাপন করেছি—। চব্বিশ পরগনায় স্থানে স্থানে গণনাট্যের শাখা আমিই গড়ে তুলেছি—তা সত্ত্বেও। অপরাধ? ডিসিপ্লিন ভঙ্গ। কার ডিসিপ্লিন? পার্টির। পার্টি কে?—ওই কতকগুলি মুখ! এ সবই ঘটে গেছে বাবার মৃত্যুর আগেই। তাই বলছিলাম, পার্টির সাংস্কৃতিক নীতি ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটছিল বেশ কিছু বছর ধরেই। বাবার মৃত্যু তাতে শীলমোহর লাগিয়ে দিল। সেটা ১৯৫১ সালে ৫ মে। মহম্মদ আলি পার্কে তখন বিশ্ব শান্তি সম্মেলন চলছে। সেই উপলক্ষে আমার শান্তির গান রচিত হয়েছে এবং সম্মেলনে গেয়েছিলাম "যখন প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধ কি শান্তি"—! সেই যুগে গণনাট্যের জন্য রচিত সেইটিই বোধহয় আমার শেষ গান। এক বছরের মধ্যেই ১৯৫২ সালে আমি দেশ ছাড়লাম সংসারের চাপে।

বাবার মৃত্যু ছাড়াও ওই ১৯৫১ সাল আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে আর দুটি কারণে। ওই বছরই পৃথিবী খ্যাত চিত্রপরিচালক পুদভকিন ও বিশ্ববিদিত অভিনেতা চেরকাশভ কলকাতায় আসেন। ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রিটে ও আরো কয়েকটি সম্বর্ধনায় ওঁদের আমার গান শোনাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। চেরকাশভ তাঁর অসম্ভব ভারী গলায় গাইতেন—'আর রোকতো নই নই! আর ধোংসো নই নই।' দেশে ফিরে ওঁরা ভারতের

স্মৃতিকথায় 'ওগোনিয়ক' পত্রিকায় আমার সম্বন্ধে একটি অধ্যায় লিখেছিলেন। চেরকাশভ আমাকে বলেছিলেন প্রধানত মেজর স্কেল-এ রচিত আমার গান তাঁকে Repin-এর পেন্টিং-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। ১৯৫৪ সালে রাশিয়ায় প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে ডেলিগেট হয়ে যখন মস্কো হয়ে লেনিনগ্রাদ যাই চেরকাশভ লেনিনগ্রাদ স্টেশনে নিজে এসেছিলেন ডেলিগেশনকে স্বাগত জানাতে। প্রায় সাত ফুট লম্বা সেই শিশুর মতো সরল মানুষটি তাঁর কম্বুকণ্ঠে 'সালিল! সালিল!' বলে আমার ক্ষুদ্র দেহকে শূন্যে তুলে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং গেয়েছিলেন ওই দু-লাইন। তারপর ১৯৬৪ সালে হেলসিংকি থেকে ফেরার পথে মস্কোতে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা। তখন মনে হয়েছিল মানুষটি যেন ভেঙে পড়েছেন। বললেন: মায়াকোভস্কির ভূমিকায় অভিনয় করবেন—তাঁর জীবননাট্যের প্রস্তুতি চলছে। সে নাটক হয়েছিল কিনা জানি না। তবে চেরকাশভের জীবননাট্যের ওপর যবনিকা নেমে এসেছিল বোধহয় দু-তিন বছরের মধ্যেই। 'ওগোনিয়ক' পত্রিকায় ওঁদের সেই লেখা এদেশে সোভিয়েট ল্যান্ড-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলায় বেরিয়েছিল সোভিয়েত দেশেও। বোধহয় ১৯৫১ সালেই জীবনের অন্যান্য বহু কিছুর মতো ওই সংখ্যা দুটিও আর আমার কাছে নেই। যদি কোনো সহৃদয় পাঠকের কাছে তা থেকে থাকে জানালে বাধিত হব। ওই ১৯৫১ সালেই গ্র্যান্ড হোটেলে আমি আর ঋত্বিক (ঘটক) পুদভকিন চেরকাশভের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম এবং সেখানেই ওঁদের হাত থেকে রাশিয়ান পিবা বা বিয়ার পানই ঋত্বিকের ও আমার জীবনের প্রথম মদ্যপান। আজ কেউ বিশ্বাস করবেন না যে সেদিন 'ঋত্বিক' সেই একটা ছোট টিন বিয়ার খেয়ে এমন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে ওঁরা একটি সংবর্ধনায় বেরিয়ে যাবার পরও প্রায় আধঘণ্টা ব্যালকনিতে একটা সোফায় বসে রইল। বলল, 'আমার ভীষণ মাথা ঘুরছে—চলতে পারছি না।' সেই ঘটনা নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে আমাদের অনেক হাসাহাসি হয়েছে। গ্র্যান্ড হোটেল থেকে বেরিয়ে ঋত্বিক বলল, 'চল একটু ফাঁকা হাওয়ায় যাওয়া যাক।' হাঁটতে হাঁটতে আমরা ইডেন গার্ডেন ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলুম। ঋত্বিক বলেছিল, 'দূর শালা! মহা বাজে জিনিশ! আর কোনোদিন নয়।' অদৃশ্য থেকে নিয়তি বোধহয় সেদিন অট্টহাস্য করেছিল।

সেই মদ্যপানই ঋত্বিকের জীবনের অভিশাপ হয়ে দেখা দিল এবং আমার জীবনেরও বহু অমূল্য মুহূর্তের জলীয় সমাধি ঘটাল। ১৯৪৭ সাল থেকেই ঋত্বিক, মৃণাল (সেন) এবং আমি ছিলাম অবিচ্ছেদ্য বন্ধু। মৃণালেরই অবস্থা কিছুটা ভালো ছিল। ও ছিল বোধহয় 'মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ', আমরা ছিলাম বেকার। কাজেই ওর পয়সাতেই আমাদের চা-সিগারেট চলত। প্যারাডাইস কাফের আড্ডা জমত। ঋত্বিক বিড়ি খেত। তখন এক আনায় দুটো ক্যাপসটান পাওয়া যেত। একদিন এক আনাই ছিল মৃণালের কাছে। তাই দিয়ে দুটো সিগারেট কিনে আমি পানওয়ালাকে বললুম: "ভাই, এই যে লম্বা লোকটি দেখছ ওর সিগারেট খেলেই ভীষণ মাথা ঘোরে, রাস্তায় পড়ে যায়। একটা বিড়ি ফাউ দেবে?"—দিয়েছিল কিন্তু লোকটা। আমাকে গালাগাল দিতে দিতে বিড়িটাও ঋত্বিক খেয়েছিল। উত্তর-জীবনে আমি আর ঋত্বিক দুজনেই বয়ে গেলাম,—মৃণালটাই কি করে জানি সচ্চরিত্র রয়ে গেল। মদ ছুঁল না জীবনে।

বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে বোম্বে যাওয়া পর্যন্ত এই এক বছর কিভাবে এক দুঃস্বপ্নের মতো আমাদের কেটেছে তার বিবরণ যদি কখনো প্রসঙ্গত এসে পড়ে বলব।

এই সময়কার আমার মানসিক এবং আর্থিক টালমাটালের কথা জানতেন ক্ষেপুদা (কমরেড খগেন রায়চৌধুরী—২৪ পরগনা জেলার কৃষক এবং পার্টি নেতা। এখন মারা গেছেন)। আমি মূলত ২৪ পরগনার ছেলে এবং কৃষক আন্দোলন থেকেই আমার সংস্কৃতি আন্দোলনে প্রবেশ। তার মূলে ছিলেন প্রধানত ক্ষেপুদা এবং হরিধন চক্রবর্তী (২৪ পরগনা জেলার কৃষক নেতা)। কৃষক আন্দোলনের ওপর গান লিখতে শুরু করি এঁদেরই প্রেরণায় ১৯৪০-৪১ সালে। তখন গণনাট্য জন্মায়নি এবং আমি ১৬-১৭ বছরের কিশোর। ক্ষেপুদাই আমায় বলেছিলেন 'যাই বলো শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে ব্যক্তির কাজ—সমবেতভাবে তা হয় না। তোমার সৃষ্টি তুমি করে যাও। আর তোমাকে কে বলেছে যে দেশের সংস্কৃতিকে উদ্ধার করার যত দায় সব তোমার? তাই নিয়ে এত দলাদলিই বা কিসের, কাদা ছোঁড়াছুঁড়িই বা কেন?'

ক্ষেপুদা এবং কমরেড হরিধন দুজনেই জানতেন যে ভূমিহীন কৃষকের রিকশাওয়ালা হবার কাহিনীর স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমি বোম্বে যাচ্ছি বিমল রায়ের কাছে। সেই হবে ভারতে প্রথম কৃষিজীবন এবং দিনমজুরের জীবনের ওপর ছবি (যার নাম হল 'দো বিঘা জমিন')। কাজেই তাঁদের পুরোপুরি সায় ছিল। ভাবতে অবাক লাগে কলকাতা শহরের অনেক বড় বড় নেতাদের চেয়ে আমাদের এই কৃষক নেতা কমরেডদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কত স্বচ্ছ এবং উদার। 'দো বিঘা জমিন' যখন পৃথিবীর সিনেমার প্রাঙ্গণে প্রথম ভারতীয় ছবির দরজা খুলে দিল, ক্ষেপুদা গর্ব করে বলতেন, শুনেছি: 'সলিল আমাদের জেলার ছেলে—কৃষক আন্দোলনে ওর হাতেখড়ি আমার কাছে।'

কলকাতার গণনাট্য এবং পার্টি বলল, 'সংস্কৃতি আন্দোলনের পিঠে ছুরি মেরে সলিল চৌধুরী কেরিয়ার বানাতে বোম্বে গেছে।'

সিনেমা কি সংস্কৃতির বাইরে?—কে বলবে!

নিজের দুঃখের আশাভঙ্গের প্যানপ্যানানি গাইতে আমার চিরকালের অনীহা। কিন্তু যখন অন্যায়ভাবে খোঁচা খাই মুখ খুলতেই হয়। অপপ্রচার মিথ্যাভাষণ জীবনেই বলুন রাজনীতিতেই বলুন প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে, হাওয়ায় ভর করে বীজ ছড়াতে থাকে, সে তুলনায় 'সত্য'-র জমি বরাবরই অনুর্বর। বোধহয় সত্যের তুলনায় মিথ্যা অনেক বেশি মুখরোচক, কারণ মিথ্যার মতো সত্যের মধ্যে কল্পনা নেই, তার সাহিত্যমূল্য কম। মিথ্যা বা নিন্দার কোনো যুক্তির জমির প্রয়োজন হয় না—ক্যানসার সেলের মতো দেহের মধ্যে জন্মালেও সে দেহনির্ভর হয়—নিজে নিজেই বাড়তে থাকে। মা-র কাছে একটা গল্প শুনেছিলুম। এক ভদ্রলোকের স্ত্রী এসে তার সইকে বললেন: 'সই! সই! কাউকে বলিসনি! আজ ওঁর পায়খানার সঙ্গে পালকের সোঁয়ার মতো দু-তিনটে বেরিয়েছে।' সই গিয়ে পাড়ায় তাঁর এক বান্ধবীকে বললেন—'শুনেছিস? কাউকে যেন বলিস না—আমাদের পদ্মর স্বামীর পায়খানার সঙ্গে একটা পাখির পালক বেরিয়েছে।' বান্ধবী তাঁর সইকে বললেন—'শুনেছিস পদ্মর স্বামীর কি হয়েছে? কাউকে যেন বলিস না—যতবার পায়খানা যাচ্ছে একটা করে পাখি বেরোচ্ছে।'—ক্রমশ গাঁয়েগঞ্জে রটে গেল, 'পদ্মর স্বামীর পায়খানার সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বেরোচ্ছে আর উড়ে যাচ্ছে।'

এই কল্পনাশক্তি সত্যের কোথায়? তাই 'সত্য' পড়ে পড়ে মার খায়, 'মিথ্যে' হাওয়ায় গজায়। হাল আমলে কিছুদিন আমার স্ত্রী সবিতার গলায় 'সিঙ্গার্স নোড' বা অত্যধিক ব্যবহারে একজাতীয় ছোট দানা জন্মানোয় ডাক্তার ওকে এক-দেড় মাসের জন্য গান

গাইতে এমনকী কথাও বলতে বারণ করেন। কিন্তু অনুষ্ঠানের শ্রোতারা তো সে সব বিশ্বাস করেন না, ভাবেন ধাপ্পা দিচ্ছে। কাজেই তার থেকে বাঁচবার জন্য তথাকথিত 'ফাংশান পার্টি' এলেই আমাকে বলতে হত—'সবিতা কিন্তু গাইবে না—ওর নাম দিও না।' তিন-চার মাসের মধ্যেই বাড়িতে টেলিফোন আসতে লাগল, 'শুনলাম সবিতা চৌধুরীর গলায় ক্যানসার হয়েছে?'—যত বলি 'না না বাজে কথা! এখন ভালো আছে নিয়মিত গান করছে'—ওঁদের যেন বিশ্বাস হয় না! এতবড় একটা মুখরোচক খবর মিথ্যে হয়ে গেল? একে কি বলবেন? মানব প্রকৃতি? যাই হোক, আবার পিছন ফিরি।

জীবনকে যদি টেপের মতো Rewind করা যেত তাহলে হয়তো অনেক কিছুই ধরা পড়ত যা পরিণত মনকে আর নাড়া দেয় না। জীবন তো আর গল্প নয়। তার বাঁধুনি তাই ঢিলেঢালা, গতি মন্থর—শ্লথ তালে তার গড়ে ওঠা, খুব ঢিমে তেতালায় যেমন তবলচি একটা তাল ঠুকে প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে 'সম'-এ পড়তে পারেন। কিন্তু ভাবি সেদিন যে মন নিয়ে বেঁচেছিলুম সেই একেবারে ছোটবেলার মন, তাকে কি করে খুঁজে পাব? আজকের মন দিয়ে যখন সেই মনটাকে ধরবার বোঝবার চেষ্টা করি তাতে তো ফাঁকি থেকেই যায়। কল্পনার মশলা মিশিয়ে ভদ্রলোকের পাতে দেবার মতো করে রাঁধতে হয়। সেই যে বিশাল আমাদের দক্ষিণ বারাসতের তিনমহলা বাড়ি, তার বিশাল ঠাকুর দালান, বার-বাড়ি, মন্দির পেরিয়ে অন্দরমহল, সেই ভীষণ উঁচু উঁচু সিঁড়ি ডিঙিয়ে রান্নাঘর পেরিয়ে বারান্দা আর ছাদ একদিকে অন্য দিকে আমাদের দুখানা বড় বড় শোবার ঘর! কিছুদিন আগে গিয়ে দেখি কি করে কুঁকড়ে সব ছোট হয়ে গেছে। সিঁড়িগুলো তেমন আর উঁচু নয়! সেই যে সিঁড়ি থেকে মা পড়ে গিয়েছিলেন! তখন আমার ছোট বোন লিলি পেটে। এমনিতেই সিঁড়িটা অন্ধকার তায় সন্ধ্যাবেলা, মা যেন দেখলেন জ্যাঠাইমা দাঁড়িয়ে আছেন। 'দিদি' বলে যেই ধরতে গেলেন ছায়ামূর্তি সরে গেল। মা তিন-চারটে সিঁড়ি গড়িয়ে নীচে পড়লেন। সেই ভয়ংকর উঁচু বিশাল সিঁড়িটাকে কেমন যেন নিচু আর নিরীহ মনে হল। সেই জন্যই নিশ্চয় মা-র খুব লাগেনি—লিলিও বেঁচে গেছে। কতদিন স্কুল থেকে ফিরে ওই সিঁড়ি ভেঙে উঠেই সোজা রান্না ঘরে মা-র পাতে বসে আম বা কলা চটকে দুধ ভাত খেয়েছি। সেই সিঁড়ি আর স্থানে স্থানে ইট উঠে ফোকলা বৃদ্ধের মতো পড়ে থেকে শেষের দিন গুনছে। মন্দিরের সামনের সেই বেলগাছটা আজও বেঁচে আছে। ওরই তলায় মা-র সেলাইয়ের কলের মাকুটা পুঁতেছিলাম। মনে পড়ে প্রায়ই মা-র কলের মাকু বা ববিন যথেষ্ট পাওয়া যেত না। তাই মা-র এই সমস্যার সমাধানকল্পে মাকু গাছ হবে বলে মাটিতে পুঁতেছিলাম। ওই গাছে শয়ে শয়ে মাকু ফলে থাকবে আর আমি পেড়ে এনে দেব। মা বলবেন, দেখত! আমার বাচ্চুর কী বুদ্ধি! তারপর একদিন মা আর মাকু খুঁজে পান না। দাদাকে বলেন, হ্যাঁরে খোকা, তুই দেখেছিস? আমাকে বলেন, হ্যাঁরে বাচ্চু, তুই দেখেছিস! দুটো ঘাড়ই নড়ল—কেউ দেখেনি। সেদিন সেলাই হল না। পরের দিন মাকে দেখে আমার খুব কষ্ট হল। বেলতলায় গেলুম মাকুটা তুলে আনতে। কিন্তু কোথায় পুঁতেছি খুঁজে পাই না। দাদা বলল, কি খুঁজছিস? কিছু বল্লুম না। দাদা কিন্তু গিয়ে মাকে বলল, বাচ্চু তোমার মাকু বেলতলায় পুঁতেছে গাছ হবে বলে—এখন আর খুঁজে পাচ্ছে না। সেই মাকু পরে অবশ্য পাওয়া গেল। কিন্তু কি হাসাহাসি! শুধু বাবাই গম্ভীর ভাবে বললেন 'আহা দু-চারদিন আরো দেখলেই পারতে, কে জানে হয়তো মাকু গাছ বেরত!' তখন আমরা সবে লতাবাড়ি থেকে দেশে ফিরেছি। বছর তিন-চার হবে আমার বয়স। সেদিনের দেখা বাবার সেই বিরাট শোবার ঘরটাও কত যে ছোট হয়ে

গেছে আজ দেখলে কষ্ট হয়। ওই ঘরের মেঝেয় একদিন আমার ছোট বোন হাসি শুয়ে ঘুমোচ্ছিল—তখন মাসছয়েক বয়স তার। ঘরে প্রাইমাস স্টোভ জ্বলছে, বোধহয় জল গরম হচ্ছিল। পাশেই পড়ে রয়েছে পোকারটা। এখন যদি ওই পোকারটা স্টোভে তাতিয়ে হাসির পায়ে চেপে ধরি তাহলে কি হয়? ও তো আর কথা বলতে পারে না। কি করে মা বুঝবে কি হয়েছে? হাসি জন্মাবার পরে মা-র বুকের দুধে ভাগ বসিয়েছিল। (তখনো আমি লুকিয়ে লুকিয়ে মা-র দুধ খেতুম—হিংসে হওয়া স্বাভাবিক!) যা ভাবা তাই কাজ। গরম পোকারটা পায়ে ঠেকাতেই হাসি ককিয়ে চিৎকার করে উঠল। আমি সেটা ফেলেই এক ছুট। এত জোরে চেঁচাবে বুঝতে পারিনি। মা ছুটে এলেন—'কি হল?' কেন এত কাঁদছে কেউ বুঝতে পারে না। জ্যাঠাইমাও ছুটে এসেছেন। আমি দূর থেকে শুনছি সব। তার পরে বোধহয় মা-র হাতে ঠেকল গরম পোকারটা এবং দেখতে দেখতে হাসির পায়ে একটি নিরেট ফোস্কা গজিয়ে উঠল। আর কারো বুঝতে বাকি রইল না। মা বললেন, 'এ নিশ্চয় বাচ্চুর কাজ।' ডাক পড়ল, 'বাচু! বাচু!' আমি একছুটে সেখান থেকে হাওয়া। বাবা ডিসপেনসারি থেকে ফিরে এসে সব শুনে কি করেছিলেন আজ আর মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে আমরা ভাইবোনেরা বাবা-মা-র হাতে মার খাওয়া তো দূরের কথা কানমোলা অবধি খাইনি। সেই জন্যই বোধহয় বাবার একটু কড়া কথাতেই আমাদের হৃদকম্প শুরু হত।

বাবার ঘরের পাশেই ছিল আমার আর দাদার শোবার ঘর। সেই ঘরের মেঝেয় মাদুর পেতে বসে মা প্রতি দুপুরে চোঙা দেওয়া কলের গান বাজাতে বসতেন। পাড়ার মেয়েবউরা এসে গোল হয়ে বসত। মা পালা বাজাতেন 'আলিবাবা', 'দক্ষযজ্ঞ' 'শ্রীমন্ত সদাগর', 'সিরাজদৌলা'। চোঙার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে কৌতূহলী সব চোখ বিস্ময়ে উঁকি দিত—যদি মানুষটাকে দেখা যায়। গান বাজত 'কে মল্লিক', 'গহরজান', 'আঙ্গুরবালা', 'ইন্দুবালার'। চোখের সামনে আজও যেন দেখতে পাই মা-র দীর্ঘ খোলা চুল মাদুরে লুটোচ্ছে—মা কলের গানের চাবি ঘুরিয়ে গ্রামোফোনে দম দিচ্ছেন।

দক্ষিণ বারাসতে এসেই বাবা আমাকে আর দাদাকে বাংলা স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আমাদের হাতেখড়ি হয়েছিল মা-র কাছে। ওইটুকু বয়সেই মা-র তালিমে আমি প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ (ঈশ্বরচন্দ্রের) শেষ করে কথামালা পড়তাম। ধারাপাতও আমার ছিল মুখস্থ। মনে আছে পর পর দু-বছরই আমি ডবল প্রমোশন পেয়েছিলাম কিন্তু বাবা আমাকে উঠাতে দেননি, পাকা হয়ে পড়ার ভিত তৈরি হবে বলে। বাংলা স্কুলে আমাদের ইংরেজি পড়ানো হত না, ইংরেজি পড়তাম বাড়িতে মাস্টারমশায়ের কাছে। তখনকার ইংরেজি লেখার যে বঙ্গানুবাদ আমরা শিখতাম তা ছিল মজার—মানে বুঝতাম না কিছুই। যেমন I am—আমি হই, He is—সে হয়, I am up— আমি হই উপরে, A sly fox met a hen—একটি ধূর্ত খেঁকশিয়াল সাক্ষাৎ করিল একটি মুরগির সহিত, Wine made him mad—মদে করিয়াছিল তাহাকে পাগল, ইত্যাদি। শুধু পাখির মতো মুখস্থ করতাম। আমার মনে আছে আমার আর দাদার জন্য দুজন আলাদা মাস্টারমশাই ছিলেন। দাদার মাস্টারমশাই ছিলেন অল্পবয়সী যুবক—আর আমার ছিলেন শাদা-চুল বৃদ্ধ। দাদার মাস্টারমশায়ের নাম মনে নেই, আমারটা যে মনে আছে তার কারণ দাদা আমাকে খ্যাপাবার জন্য তাঁর নামে একটা দুলাইনের ছড়া বেঁধেছিল। সেটা শুনলে আমি ভীষণ রেগে গিয়ে মা-র কাছে নালিশ করতাম, কারণ আমার মাস্টারমশাইকে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম। তাঁর নামে অশালীন উক্তি আমি সহ্য

করতে পারতাম না। তাঁর নাম ছিল প্রসন্ন দত্ত। ছড়াটা ছিল—'প্রসন্ন দত্ত/পাছায় তিনটে গর্ত'।

দক্ষিণ বারাসতে বোধহয় আমরা বছর দুয়েক ছিলাম। সেই প্রথম এবং সেই শেষ আমাদের নিজের দেশের বাড়িতে থাকা। তার কারণ আগেই বলেছি। সে সময়কার স্মৃতি কয়েকটা টুকরো টুকরো ছবির মতো যেটুকু মনে আছে—বাকিটা ধোঁয়াটে আবছা। আমার মনে আছে আমাদের বাড়িতে বিরাট দুর্গোৎসব হত—তিনদিন ধরে যাত্রা, পুতুল নাচ, ঢপ নাচ, কবির লড়াই হত। মেয়েরা চিকের আড়ালে বসে শুনত। মা-র কোলে বসে চিকের আড়াল থেকে যাত্রা দেখেছি আজও মনে পড়ে। আর একবারের কথা মনে আছে আমরা রেলে চেপে বোধহয় ধপধপির দক্ষিণেশ্বরের মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। ওদিকে বোধহয় সবে রেল লাইন বসেছে তখন। ট্রেন ছাড়ার সময় আর থামার সময় এমন হ্যাঁচকা দিত যে ভালো করে না ধরে থাকলে এক বেঞ্চের লোক অন্য বেঞ্চের লোকের ঘাড়ে পড়ত। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে তাঁর প্রথম ট্রেন চড়ার অভিজ্ঞতার কথা পড়েছি, তাঁর আশাভঙ্গ ঘটেছিল। আমার অভিজ্ঞতা উলটো। ট্রেন ছাড়ল আর বাবার কোল থেকে ছিটকে মা-র কোলে গিয়ে পড়লুম। ধপধপির মেলায় গিয়ে আমি হারিয়ে গিয়েছিলুম মনে আছে। কখন মা-র আঙুল ছাড়িয়ে একটা মনিহারীর দোকানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম। হঠাৎ এক সময় দেখি মা বাবা দাদা কেউ নেই, শুধু শয়ে শয়ে লোকের পায়ের মিছিল চলেছে তো চলেছেই। ভাগ্য ভালো মাকে খুঁজতে ওই ভিড়ে ঢুকিনি। সেখানেই দাঁড়িয়েছিলাম ভয়ে পাথর হয়ে। এক সময় বাবা এসে উদ্ধার করলেন। আর মনে পড়ে আমাদের বাড়ির পিছনে ছিল লম্বা টানা দুই বিঘাব্যাপী এক পুকুর। নাম ছিল পদ্মপুকুর। পানা ছিল তাতে, পদ্ম কোনোদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আসলে ওটা মজে যাওয়া আদি গঙ্গা, ওই গঙ্গা দিয়েই নাকি শ্রীমন্ত সদাগর তাঁর সপ্তডিঙা নিয়ে বাণিজ্যে গিয়েছিলেন। পুকুর ধারে একটা প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ ছিল। তার গায়ে নোঙর করা জাহাজের চেন বাঁধার দাগ নাকি তখনো ছিল। ওই অশ্বত্থকে বারি দিয়ে পুজো করেছিলেন শ্রীমন্ত সদাগর। তাই বারি-অশ্বত্থ থেকে নাকি জায়গার নাম 'বারাসত' হয়েছে। সেই ছোটবেলায় শোনা এই সব গল্প বলতেন আমার বড় জ্যাঠাইমা। রূপকথা মনে হত বলেই হয়তো আজও মনে আছে। আমার মনে আছে ওই পদ্মপুকুরের ঘাটে নামবার পথটা ছিল বেশ ঢালু। একবার এক দৌড়ে ওই ঘাটে পৌঁছতে গিয়ে সোজা গিয়ে পড়েছিলুম ডুবজলে। কে যেন দেখতে পেয়ে তুলে এনেছিল। জীবনে আর একবার আমি ডুবে গিয়েছিলুম। তখন আমি বঙ্গবাসী কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। ডুবেছিলুম যশোরে একটা দিঘিতে। কেন যশোরে গিয়েছিলুম, কেন ডুবতে গেলুম সে এক মজার ব্যাপার। কলেজ জীবনে যদি যাই তো তখন সে কথা বলা যাবে। বারাসতের ওই পদ্মপুকুরের কাছেই ছিল উঁচু একটা ঢিবি আর তার তিনপাশ জুড়ে বাঁশবন। বড়দের জন্য খাটা পায়খানা ছিল। ছোটদের পায়খানা ছিল ওই ঢিবি। ওই ঢিবি কাঠি দিয়ে খুঁড়ে একবার আমি অনেক পুরোনো তামার পয়সা পেয়েছিলুম মনে আছে। বাবা বলতেন 'হয়তো সেকালে কোনো জাহাজডুবী হয়েছিল ওইখানে কে জানে? আর একটা দারুণ ব্যাপার ঘটেছিল ওই ঢিবিতে একবার। ওই বাঁশবনটা ছিল শেয়ালের আড্ডা। দিনেদুপুরে রাত্রে অষ্টপ্রহর শেয়াল ডাকত। আমার ছিল ভীষণ শেয়ালের ভয়। মা না দাঁড়ালে আমি পায়খানা যেতাম না। একবার দুপুরে ঢিবিতে গিয়েছি—মা জ্যাঠাইমা কাছেই ঘাটে আছেন। হঠাৎ পিছনে মনে হল গরম হাওয়া লাগছে। পিছনে ফিরে তাকিয়ে

দেখি একটা পেটমোটা ভুঁড়ো শেয়াল আমার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে—তার দুটো সতৃষ্ণ চোখ আমার দিকে তাকিয়ে। ও মাগো! বলে চিৎকার করে এক লাফে ছুটে সোজা মা-র কাছে। ঘটনাটা বলতেই জ্যাঠাইমা শেয়ালের উদ্দেশে বললেন: আ মরণ! মুখপোড়ার আর তর সইছে না! পেটের গু টেনে বার করে খাবে। শেয়ালের ভ্রূক্ষেপ নেই। তখন নির্বিকারে সে জিব দিয়ে ঠোঁট চাটছে। সেই ঢিবি এখনো নিশ্চয় আছে।

সেই বাঁশবনও হয়তো আরো বিস্তার করেছে। সেই ভুঁড়ো শেয়ালের বংশধররা এখনো নিশ্চয় অষ্টপ্রহর চিৎকার করছে। শুধু আমার মা জ্যাঠাইমা আর বেঁচে নেই। সেই দিনও নেই। সেই মনও নেই। বেঁচে থাকলেও আমিও আর নেই। বারাসত তবু আছে বারাসতেই।

বছর পাঁচেক বয়সের মধ্যেই আমি যে কোনো বাংলা বই গড়গড় করে পড়তে পারতুম। 'বসুমতী' 'ভারতবর্ষ' ছাড়া মা নিতেন 'গল্পলহরী' পত্রিকা। আমি বিশেষ কিছু না বুঝলেও সব পড়তুম। একবার বারাসতে আমার দাদু (মা-র বাবা) এসেছিলেন। দাদুর ছিল ভীষণ মাছ ধরার শখ। পুকুর থেকে বড় মাছ ধরলেই বারাসতে দিতে আসতেন। তাছাড়া আনতেন মামার বাড়ির বাগানের আম-জাম-কাঁঠাল-নারকেল বস্তা ভরতি করে। দাদু ছিলেন ভীষণ গোঁড়া মানুষ। টেরি কাটা, গুনগুন করা, শিষ দেওয়া বড়দের কথার মধ্যে কথা বলা সবই ছিল তাঁর কাছে বখাটের লক্ষণ। সেদিন আমি আমাদের শোবার ঘরে খাটে শুয়ে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়ছিলুম। দাদু হঠাৎ কখন ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে বলে উঠলেন—'এই! ওটা কি পড়ছ তুমি?' বললুম—'চরিত্রহীন!' দাদুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল! 'এ্যাঁ?' ততক্ষণে মা এসে ঘরে ঢুকেছেন। দাদু বললেন, 'তোরা এই সব অশ্লীল বই ছেলেপুলের ঘরে যেখানে সেখানে ছড়িয়ে রাখিস?' আমাকে ধমক দিয়ে বললেন—'দাও। দিয়ে দাও এ বই।' মা বললেন—'না বাবা অশ্লীল কেন হতে যাবে, তাছাড়া ও আর কতটুকুই-বা বুঝবে? তাছাড়া ও সব বই-ই পড়ে—আমরা বারণ করি না।'—'না না, এটা মোটেই ভালো নয়'—দাদু বললেন—'এখন নাড়াচাড়া করছে ঠিক আছে—যখন পড়তে শিখবে সরিয়ে রেখ।' মা হেসে বললেন—'ও আমার চেয়ে ভালো পড়ে বাবা। আমার মাথা ধরলে ওই আমাকে পড়ে শোনায়।'

তারপর আমার কৃতিত্ব দেখাবার পালা—মা-র কথায় আমি গড়গড় করে একপাতা পড়তেই দাদু আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললেন—'বাঃ দাদু বাঃ।' কিন্তু মাকে আড়ালে কি সব বললেন। মা পরে বলতেন—"অত ছোটবেলায় আমার কাছে তোরা পড়তে শিখে আজ কত বিদ্বান হয়ে গেলি আর আমি যেখানে ছিলুম সেখানেই রয়ে গেলুম। মুখ্যু নাম আর আমার ঘুচল না।" হাসতে হাসতে বলতেন বটে কিন্তু মা-র একটা বেদনা ছিল। মামার বাড়ি গোঁড়া হলেও মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোয় তাঁদের সায় ছিল। মা ছিলেন বাংলা স্কুলের সবচেয়ে ভালো ছাত্রী। ১৪ বছর বয়সেই তাঁর হল বিয়ে আর ১৬ বছর বয়সেই হলেন জননী। তাও সব সভ্যতার বাইরে আসামের দুর্গম জঙ্গলে। সেই আসামেই মা-র কাটল দীর্ঘ ৩৫ বছর।

বিবাহিত জীবনে আমার বাবা মায়ের মতো পারস্পরিক নির্ভরতা এবং উজাড় করা ভালোবাসা আমি আমার জীবনে দেখিনি। ৩৫ বছরেরও বেশি বিবাহিত জীবনে মৃত্যু পর্যন্ত পারতপক্ষে একদিনের জন্যও একজন আরেকজনকে ছেড়ে থাকেননি। বাবার মৃত্যুর পর যে মা বেঁচে রইলেন দীর্ঘ ২২ বছর সে এক চূড়ান্ত নিঃসঙ্গতার দীর্ঘশ্বাসের জীবন। প্রায় এক বছর তিনি প্রায় বোবা হয়েই কাটিয়ে দিলেন। তারপর ছোট ছোট

শিশুদের মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় জীবনধারণের সূত্র খুঁজে পেলেন। আমার সেই ছোটবেলার কৈশোরের এবং প্রথম যৌবনের দেখা মা, সেই শ্যামবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী, হাঁটু ছাড়িয়ে খোলা চুলের ঢল, দীর্ঘ আয়ত সপ্রতিভ চোখের চাহনি. আত্মসম্ভ্রমটির গর্বে ঋজু যে মা—যাকে মা বলে ডাকতে গর্বে বুক ভরে উঠত তাঁকে আমরা চিরদিনের জন্য হারালাম বাবার মৃত্যুর সাথে সাথেই। বাবার মতো সূর্যের আলোতেই মায়ের মুখেচোখে ছিল ভরা পূর্ণিমা—সেটা স্পষ্টতই নিভে গেল।

আমাদের হাতিখুলির আসাম জীবন ছিল স্বচ্ছন্দ। মনে আছে বাবার ঘরে টানা-পাখা টানার জন্য গ্রীষ্মকালে সকাল রাত্তির দুজন করে পাখাওয়ালা থাকত পালা করে। এক বিশাল চুলোয় পিপেয় করে গরম জল করার আলাদা লোক ছিল—ঠাণ্ডা কাঁচা জলে আমরা কেউ চান করতাম না। ঝরনা থেকে বাঁকে করে জল বয়ে আনার লোক ছিল। কাঠ কাটার লোক ছিল। তাছাড়া মা-র ছিল প্রায় দুবিঘে জমির ওপর শাক-সবজি বাগান। তার জন্য দুটো মালি। আলু, মুলো, কপি, কড়াইশুঁটি, বেগুন থেকে শুরু করে টমাটো, গাজর, ওলকপি, শালগম সব মা নিজ হাতে ফলাতেন। গোয়ালে তিনটে দুগ্ধবতী গরুর দুধ রোজ সকালে নেপালি গোয়ালা এসে দুয়ে দিয়ে যেত। ছাগল, হাঁস, মুরগি, পায়রা সব ছিল মায়ের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে। এই জাতীয় প্রায় সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী পরিবেশে মা ছিলেন সর্বময়ী কর্ত্রী। তাছাড়া ছিল মা-র সেলাই। বাবার শার্ট কখনো কেনা হত না, মা সেলাই করতেন। আমাদের ছোটবেলায় ভাইবোনেদের শার্ট-প্যান্ট ফ্রক ইজের সব কিছু ছিল মা-র হাতে তৈরি। তাছাড়া সাহায্য করার লোক থাকলেও রান্না মা নিজ হাতে করতেন। আজ ভাবতে অবাক লাগে এত কিছু মা একসঙ্গে কি করে করতেন! এই মোটামুটি প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও আমাদের জীবনে সঞ্চয় বলে কোনো জিনিশ ছিল না। যা কিছু উদ্বৃত্ত হত মা দুহাতে বিলোতেন কম্পাউন্ডার, ড্রেসার, রোগী থেকে শুরু করে বাগানের মজুর কুলি-কামিনদের। অভাব কাকে বলে বাবার মৃত্যুর আগে মা কোনোদিন চোখে দেখেননি। চিরদিন ভাইবোন, আত্মীয়স্বজনকে মা দিয়েই এসেছেন, কারো কাছে কিছু নেননি। আগেও বলেছি আসামের ওই পরিবেশ থেকে কসবায় ঘিঞ্জি গলির মধ্যে দুখানা ঘরে এসে ওঠায় কি বিড়ম্বনায় বাবার দিনগুলো কেটেছিল। বাবা তো তিনমাসেই রেহাই পেয়ে গেলেন কিন্তু মাকে সেই সাম্রাজ্য ছেড়ে এসে দীর্ঘ ২২ বছর কখনো কখনো চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে ওই কসবাতেই কাটাতে হল। কিন্তু উপায় ছিল না। প্রথম কারণ ছিল আমার পরের দুটি বোন বড় হচ্ছিল। এবং পরের দুটি ভাইকে লেখাপড়া শেখার জন্য আমাদের মতো তাদেরও পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা মা-বাবার ছিল না। তাছাড়া আমাদের দুভাইকে দীর্ঘ ১৬ বছর ছেড়ে থাকার পর ওঁরা চেয়েছিলেন দেশে ফিরে একসঙ্গে সবাই থাকব। প্রবাস জীবন একেবারে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার মায়ের ভাগ্যে একসঙ্গে সবাই মিলে থাকার সুখ তিনমাসও সইল না। শুধু তাই নয়, বাবার মৃত্যুর পর এক বছর পেরোতে না-পেরোতে মাকে ছেড়ে আমাকেও প্রবাসী হতে হল এবং আমার সেই প্রবাস জীবনকালীনই মারও মৃত্যু ঘটল। একসঙ্গে থাকা তাঁর ভাগ্যে আর ঘটল না।

আগেই বলেছি বারাসতের বাড়ি ছেড়ে আসামে যে নতুন বাগানের অ্যাসিস্টান্ট মেডিক্যাল অফিসার (এ এম ও) হয়ে বাবা গেলেন তার নাম একড়াজান। ওই চা বাগান সম্বন্ধে আমার যেটুকু মনে পড়ে তাহল বারাসতের জন্য আমার ভীষণ মন কেমন করত। বিশেষ করে স্কুলের জন্য, আমার মাস্টারমশায়ের জন্য আর আমার খেলার সাথী দুই

জ্যাঠতুতো বোন পদ্মদি আর জয়ার জন্য। জয়া ছিল আমার খেলাবাড়ির বউ। ধপধপে ফরশা গোলগাল বেঁটেখাটো তিন বছরের বউ! স্বভাবতই স্বামী হিশেবে আমি ডাক্তার হতুম। পদ্মদি হত কোনো পড়শি। আমি আর জয়া পাশাপাশি শুয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছি, পদ্মদির ডাক আসত—ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! শিগ্‌গিরি চলুন—মেয়েটার বড্ড বাড়াবাড়ি। জয়া বউ তার আধো আধো ভাষায় বলত—"আবার লাত দুপুরে দালাতন করতে কে এল?" আমি উঠে গলায় কাল্পনিক স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে হাতে কচুপাতার মেডিকেল ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়তুম। সামনেই উঠোনে একটু চক্কর মেরে এসে বলতুম বাবার মতো সুর করে—"নাগো মেয়েটাকে বোধহয় বাঁচাতে পারব না। বাচ্চা হয়ে একলেমশিয়া ধরেছে"—। আর এক আমার জ্ঞাতি বোন ছিল সরমাদি। আমাদের থেকে অনেক বড়। ১৫-১৬ বছরের। ভারী স্বাস্থ্যবতী আর সুন্দরী ছিল সে। আমার মনে পড়ে ওইটুকু বয়সেই আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে চুমু খেলে গা শিরশির করত। আমি বুঝতে পারতুম পাড়ার বড়ছেলেরা সরমাদির পিছনে লাগত। সরমাদির ছিল বে-পরোয়া ভাব। গাছকোমর বেঁধে ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে জোরে জোরে স্কিপিং করত। একবার গণেশ বলে একটা বড়ছেলে আমাকে শিখিয়ে দিল—'যা তো সরমাকে জিজ্ঞেস কর—"আমার ফিতের" ইংরেজি কি?' আমি কিছু না বুঝে সরমাদিকে জিজ্ঞেস করতে সরমাদি আমার একটা কান ধরে বললে My Ribbon—কে শিখিয়েছে রে তোকে? আমি বললুম—ওই গণশাদা। সরমাদি একটা বিছুটি গাছ তুলে নিয়ে গণশার দলকে তাড়িয়ে পাড়াছাড়া করে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল। সরমাদি ছিল আমার Calf love, বাছুরে-ভালোবাসার প্রথম প্রেমিকা। তার চলা, বলা, হাসি, সবকিছু ভীষণ ভালো লাগত, চোখ ফেরাতে পারতুম না। এক এক সময় সরমাদি বলত—ড্যাব ড্যাব্ করে কি দেখছিস রে—ছোঁড়া? বলতুম—'তোমাকে'। সরমাদি হেসে হাঁটু গেড়ে বসে জড়িয়ে ধরে চুমু খেত। আমি বর্তে যেতুম। আজ জয়াও বেঁচে নেই—সরমাদিও বেঁচে নেই। কিছুদিন আগে শুনেছি পদ্মদি নাতি-নাতনী নিয়ে এখনো বেঁচে আছেন।

বারাসতের শোক ভুলতে অবশ্য আমার বেশিদিন লাগল না। আমি কুলি ছেলেদের সঙ্গে তীর-ধনুক নিয়ে সারাদিন বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতুম। বই আর ছুঁতুম না। মা বলতেন বাবাকে—"ওর আর লেখাপড়া কিছু হবে না। ওকে ওই কুলির দলে ভরতি করে চা বাগানের খাতায় নাম লিখিয়ে দাও।" এই তীর-ধনুক প্রসঙ্গে একটা স্মৃতি এখনো আমার মনে গেঁথে আছে। আমাদের হাতিখুলির বাড়ির পিছন দিকে একটা উঁচু কাঁঠাল গাছ ছিল। কেন জানি না, বাবুই পাখিদের ওই গাছটাই ছিল পছন্দ। প্রতি বছর শয়ে শয়ে ঝুলন্ত ফলের মতন বাবুই পাখির বাসা গজিয়ে উঠত ওই গাছটায়। বারবার উড়ে উড়ে মুখে কুটো নিয়ে নিয়ে দক্ষ তাঁতির মতন অক্লান্তভাবে সারাদিন ধরে তাদের বাসা বুনত। একবার একটা বাবুইকে তাক করে মারলুম তীর। তীরটা লাগল তার বুকে আর টুপ করে পাকা ফলের মতো সেটা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। আমার যেন নিজের তীরন্দাজিতে বিশ্বাস হল না! এ কী হল! ছুটে গিয়ে পাখিটাকে দু-হাতের চেটোয় তুলে নিলুম। মুখে তার তখনো কুটোটা ধরা আছে। ছোট ছোট তার ভীত চোখ দুটো দেখে কি যেন আমার হল। সারা শরীর কাঁপিয়ে কান্না বেরিয়ে এল। পাখিটা হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে মা-র কাছে এসে বললুম—"মাগো! পাখিটাকে আমি মেরেছি—ওকে তুমি বাঁচিয়ে দাও।" মা খুব বকলেন—"এখন ওরা বাসা বাঁধছে—বাচ্চা দেবে। এখন কি ওদের মারতে আছে?" আমি কাঁদতে লাগলুম। মা-র হাতে পাখিটা মরার মতো পড়ে

রইল। মা হাত ভিজিয়ে ওর মাথায় বুকে প্রলেপ দিতে লাগলেন। মনে হল এবার যেন একটু একটু নড়ছে। একমুঠো খড়ের ওপর ওকে শুইয়ে ঝুড়ি চাপা দেয়া হল। আমি বিছানায় শুয়ে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে পাখির অসহায় চোখটা মনে করে করে কাঁদতে থাকলুম। মা-র শত ডাকাডাকিতেও কিছু খেলুম না। বাবা এসে সব শুনে বললেন, 'নিয়ে আয় দেখি পাখিটার কি হয়েছে।' বাবা ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন—'ওর ডান পাটা জখম হয়েছে আর পড়ে গিয়ে একটু শক পেয়েছে। বেঁচে যাবে!'—প্রেসক্রিপশন হল তুলো গরম করে সেঁক আর ড্রপারে করে একফোঁটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ—আরনিকা। মাকে বললেন—"বাচ্চুকে খাবার দিয়ে দাও।" তিনদিন ধরে সেবা করে করে একটু একটু করে পাখিটা সেরে উঠল। বাবা তাকে হাতে করে নিয়ে বাইরে দাঁড়াতেই ব্যাস! পাখিটা উড়ে গিয়ে কাঁঠাল গাছে বসল। সেই থেকে আমার ধনুর্বিদ্যার শেষ।

একড়াজানের অনেক কথা আমার ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। ছানিপড়া স্মৃতির চোখ দিয়ে তাকালে একটা মুখই বারবার জ্বলন্ত ভেসে ওঠে— বাগানের অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার কিত্ সাহেবের মুখ। তার নামের বানান Keith ছিল কি Keats ছিল আজ আর জানার উপায় নেই। এক মাথা লাল চুলের নীচে রুডলফ ভ্যালেনটিনো ধাঁচের অসাধারণ সুন্দর সরু গোঁফওয়ালা এক মুখ মনে পড়লেই মনে পড়ে যায় তীরবেগে দৌড়ে আসা এক ঘোড়ার হঠাৎ লাগামটানা থামায় সামনের দুটো উঁচু পায়ের পিছনে ছিপছিপে এক ঘোড়সওয়ার— স্টিরাপের ওপর দু-পা দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে। আর তার চিৎকার— 'হেই ডক্টর বাবু।' দুর্ধর্ষ আর দুর্দান্ত বলতে যা কিছু বোঝায় শেষ অক্ষর অবধি তাই ছিল এই কিত্ সাহেব। বাবা নিজে ঘোড়া চড়তেন— বলতেন, 'কিত্ সাহেব হচ্ছে ঘোড়ার পোকা।' সেই শিশু বয়সে আমার মনে এক রূপকথার জাল বুনত ওই কিত্ সাহেব। গভীর রাতে ঠাঁই! ঠাঁই! রাইফেলের আওয়াজ মিকির পাহাড়কে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলিয়ে জাগিয়ে দিত— সবাই জানত কিত্ সাহেব শিকারে বেরিয়েছে। কোনো সঙ্গী ছাড়া একা ঘোড়ার পিঠে চড়ে ওই শ্বাপদসঙ্কুল কাজিরঙ্গার জঙ্গলে একটা লম্বা টর্চ আর দুটো রাইফেল নিয়ে কিত্ সাহেবের নৈশ অভিযান চলত সপ্তাহে দুদিন কখনো তিন দিন। আর অবশ্যম্ভাবিভাবে আমাদের বাড়িতে আসত কখনো হরিণের ঠ্যাং ক্বচিৎ কখনো আস্ত হরিণ। কুলিরা যমের মতো ভয় করত তাকে। পাতা তুলতে তুলতে হয়তো এক অবসরে তারা জটলা করছে। নিঃশব্দে ঘোড়ায় চেপে আসা কিত্ সাহেবের চামড়ায় বোনা চাবুকের হিস হিস শব্দ ওদের পিঠে কালসিটে ধরিয়ে দিত। ওরা ছুটত যে যার কাজে। বলত 'শালা সাক্ষাৎ শয়তান।' এ হেন কিত্ সাহেব কেন যে দিন নেই রাত নেই হঠাৎ হঠাৎ উপস্থিত হয়ে বাবাকে ডেকে নিয়ে হাসপাতালে যেত এবং গল্প করত তা ছিল আমার কাছে একটা রহস্য। কিত্ সাহেবের ছিল খাদ বিলিতি মেম। এই দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত কিত্ সাহেব ছিল ওই মেমের কাছে জুজু। সাহেব-মেম একসঙ্গে কখনো কখনো ফোর্ড গাড়ি চেপে এসে রাত দুপুরে বাবাকে তাদের বাংলোয় নিয়ে যেত। দু-তিন ঘণ্টা পরে বাবা ফিরে এসে ফিসফিস করে মাকে কি সব বলতেন— আর মা রাগ করে বলতেন— 'মরণ!' সমস্তটা ছিল আমার কাছে একটা ধাঁধা।

একবারের কথা মনে পড়ছে। বাবা গেলেন রাত্রি নটায় আর ফিরলেন পরদিন ভোরে। মেমসাহেব নাকি ভীষণ অসুস্থ। এদিকে মা সারা রাত জানলায় দাঁড়িয়ে। পরদিন মা-বাবার কথাবার্তায় যেটুকু বুঝেছিলাম তা হচ্ছে এই যে সাহেব তো বোতল খানেক

হুইস্কি পান করে ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু মেমসাহেবের কখনো মাথায় ব্যথা কখনো বুকে ব্যথা কখনো পায়ে কিংবা কোমরে ব্যথা। বাবার হাত ধরে সব দেখালেন এবং তাঁর শুধু একটিই কথা 'কিওর মি ডক্টর।' শেষ পর্যন্ত কড়া ঘুমের ওষুধ ইনজেকশন দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে বাবার রেহাই! মা-র সেই এক কথা—'মরণ!' সময় নেই অসময় নেই। বাবা হয়তো কোনো সিরিয়াস রোগী নিয়ে বিব্রত, সাহেবের আর্দালি এসে খবর দিল, 'মেমসাব মে সেলাম দিয়া।'— মানে ডেকে পাঠিয়েছেন। বাবাকে সব ফেলে ছুটতে হত। একবারের কথা মনে আছে, বাবা গিয়েছেন মেমসাহেবকে দেখতে। ড্রয়িংরুমে বসে আছেন তো বসেই আছেন, মেমসাহেবের পাত্তা নেই। এদিকে কিত্ সাহেবও বেরিয়েছেন। হঠাৎ দোতলা থেকে এল মেমসাহেবের প্রচণ্ড আর্তনাদ। বেয়ারা আর্দালি সবাই ছুটল, বাবাও ছুটলেন। দরজা বন্ধ করে মেমসাহেব তখন আছেন বাথরুমে আর মাঝেমধ্যে ভিতর থেকে তাঁর চিৎকার আসছে। তারপর সব চুপচাপ! বাবা বললেন— 'দরজা ভাঙো!' ইতিমধ্যে কিত্ সাহেবও এসে পড়েছেন। দরজা ভেঙে যা দেখা গেল তাতে সবাই চক্ষু চড়কগাছ। মেমসাহেব অজ্ঞান হয়ে বাথরুমের মেঝেয় পড়ে আছেন আর একটা বিশাল ময়াল সাপ জানলা থেকে ঝুলে প্রায় মেমসাহেবের মুখের কাছাকাছি তার বিরাট হাঁ নিয়ে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। কিত্ সাহেবের রিভলবার গর্জন করে উঠল পর পর তিনবার। আটজন কুলির কাঁধে চেপে সেই মৃতপ্রায় পঁচিশ ফুট লম্বা ময়াল সাপ সারা বাগান প্রদক্ষিণ করল। সেই থেকে মেমসাহেব হলেন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত এবং বাবার প্রাণান্ত। এই নিয়ে বাড়িতে হত অশান্তি। অনেক পরে যা আন্দাজে বুঝেছিলাম তা হল যে ওই দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত কিত্ সাহেবের ছিল যৌন অক্ষমতা। বেশ কয়েক বার ওই মেমসাহেবের রাত-বিরেতের ডাককে মা-র কথায় অবহেলা করায় বাবাকে প্রচুর অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। এখনো চোখের সামনে দেখতে পাই এক সোনালি চুলওয়ালী উদ্ধত শ্বেতাঙ্গিনী বাবার নিচু মাথার ওপরে অকথ্য গালিবর্ষণ করে যাচ্ছে, শাসাচ্ছে এবং একবার ঘা-খাওয়া বাবা বলছেন— 'আই অ্যাম সরি ম্যাডাম।'

১৯৫৩ সালে প্রথম বার রাশিয়াতে ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে মস্কো যাবার পথে আমরা সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় তিন-চার দিন ছিলাম। কার্পেটমোড়া সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে হঠাৎ পিছলে আমার পা মচকে যায়। একজন শ্বেতাঙ্গিনী লাল চুলওয়ালী ওয়েট্রেস মহিলা আমার পা প্রতিদিন ম্যাসাজ করত কয়েক ঘণ্টা ধরে। আমার কেমন যেন মনে হত আমি বাবার অপমানের শোধ নিচ্ছি। পরে অবশ্য মহিলাকে অন্তরঙ্গভাবে জানার সুযোগ হয়েছিল—কিন্তু সে অন্য কথা। প্রধানত ওই মেমসাহেবের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই বাবা ডঃ মলোনিকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে হাতিখুলিতে বদলি হতে পেরেছিলেন। মা-র ছিল ওই সুন্দরী খামখেয়ালী মেমসাহেবকে ভয়,— কি জানি বাবাকে কি করে বসে। বাবা যখন বলতেন সাত জন্মে স্নান না করা ওই মহিলার গায়ের গন্ধে তাঁর বমি উঠে আসে, মা বোধহয় মনে মনে প্রার্থনা করতেন, 'হে ভগবান—ও যেন জীবনে চান না করে।'

এরপরে আমরা 'কাজীরঙ্গা' পোস্ট অফিসের আওতায় পড়া হাতিখুলিতে এলাম। প্রায় এক বছর ধরে দাদার এবং আমার 'মুখ্যু' হয়ে বাড়িতে বসে থাকার থেকে নিষ্কৃতির উপায় বাবা-মা প্রাণপণে খুঁজছিলেন। শেষ অবধি ঠিক হল আমরা দু-ভাই কলকাতায় পড়তে যাব। সুকিয়া স্ট্রিটে মেজ জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা পাকাপাকি হল। বাবা চললেন সঙ্গে, আমাদের স্কুলে ভরতি করে কলকাতায় রেখে চলে আসবেন বলে।

চার

তার আগে মাকে ছেড়ে কোনোদিন থাকিনি। মাকে জড়িয়ে না শুলে আমার ঘুম হত না। তখন আমার দুটি ছোট বোন কিন্তু তাদের দিকে জেগে থাকতে আমি মাকে পাশ ফিরতে দিতুম না। একথা মা-র কাছে আমি কতবার শুনেছি—'তুই সেই বাচ্চু। আমাকে একদণ্ডের জন্য অন্যদিকে পাশ ফিরতে অবধি দিতিস না, আজ কি করে তুই আমাকে ছেড়ে বছরের পর বছর থাকিস বাবা?' আমি মা-র কোলে মাথা রেখে শুয়ে দু-হাতে জড়িয়ে বলতুম—'আমি সব সময় তোমার কাছে আছি মাগো!' সেই আমি মাকে ছেড়ে কলকাতায় চলুম পড়তে। তখন আমার বয়স ছ-বছর পূর্ণ হয়নি।

আমার একটা মস্তবড় দুর্বলতা যা জীবনী লিখতে বসে বিশেষ করে উপলব্ধি করেছি যে দিনক্ষণ, সন তারিখ আমার কিছুই মনে থাকে না। কেমন করে যেন সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, আর মনে হয় এই তো সব সেদিনের ঘটনা। ইতিহাসের সময় আর স্মৃতির সময় বোধহয় দুটো একেবারে আলাদা। স্মৃতির ক্যালেন্ডার ব্যক্তিবিশেষে আলাদা আলাদা রূপ নেয়। সময়কে সেখানে ফিতে দিয়ে মাপা যায় না। যা ছিল এক বিশেষ মুহূর্তের ঘটনা তা হয়ে-ওঠে বাকহীন কালজয়ী এক চেতনা। তার কোনো বয়স থাকে না, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তা থাকে চিরনবীন।

তাই মনের 'সময়' অনুভূতির 'সময়' আর দিনক্ষণ সন-তারিখের 'সময়ের' মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। ইতিহাসেও তো তাই। হাজার হাজার বছর ধরে ধুঁকতে ধুঁকতে চলতে চলতে একটা বিপ্লব বা একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে এক লাফে সময় একটা Quantum jump মেরে পাঁচশো হাজার বছর এগিয়ে যায়।

সেদিন আমার দাদা এসে বললেন কোথায় যেন তুই লিখেছিস সুকিয়া স্ট্রিটে আমরা দুবছর ছিলাম—ওটা ভুল! আমরা ছিলাম মাত্র একবছর।—সত্যি তাই? অথচ আমার মনে হয়েছিল দুবছরটা আমি আন্দাজে কম করে লিখেছি। এত ঘটনা এত কিছু নতুন করে জানা নিঃসঙ্গ জঙ্গলের জীবন থেকে বেরিয়ে এসে এত বিচিত্র মানুষকে চেনা, সেটা কি ক্যালেন্ডারের একবছরে সম্ভব? আমার মনের ক্যালেন্ডারে তার সময়কাল অনেক অনেক বেশি। জীবন এবং চেতনার বিকাশের পরিমাণকে পরিমাপ করার যদি কোনো যন্ত্র থাকত তো দেখা যেত অনেক সময় পাঁচবছরটা পাঁচমাসও নয় আবার একবছরটা হয়তো দশবছর। আমাদের একটা প্রাচীন দেওয়াল ঘড়ি ছিল। আমার মা-র দাদু মাকে দিয়েছিলেন। সেটা দম দেয়া থাকলে চলত ঠিকই কিন্তু চলত নিজের মর্জি মতোই। কখন যে তার কাঁটা কত দেখাবে এবং কখন কবার তার ঘণ্টা বাজবে তার ভবিষ্যদ্বাণী করা মুনি ঋষিরও অসাধ্য ছিল। মনে করুন, আপনার ঘড়িতে সঠিক সময় হচ্ছে দুটো—মা-র দাদুর ঘড়িতে দেখলেন সাড়ে তিনটে আর ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল

বারোটা। কি বলবেন? দেড় ঘণ্টা ফাস্ট বা দু-ঘণ্টা স্লো? মা রেগেমেগে ঘড়িটা বন্ধ করে দিলেও আমি আবার চাবি দিয়ে চালিয়ে দিতুম। আমার খুব মজা লাগত। সেই খামখেয়ালি ঘড়িটাকে নিয়ে একবার একটা কবিতা লিখেছিলুম:

"তুমি যে চলছ এটাই আমার ভালো লাগছে
তুমি হয়তো ছটার সময় দুটো কিংবা
নটার সময় একটা বাজতে পারো
কিন্তু তুমি যে বাজছ
এইটাই আমার ভালো লাগছে
কেননা কেউ জানে না
কটার সময় কটা বাজে
সংখ্যা দিয়ে সময়টাকে
ধরে ফেলার ব্যাপারটাই বাজে
তাই তুমি তোমার ইচ্ছেমতো চলে
মনে হচ্ছে এই কথাটাই যাচ্ছ বলে বলে
চলার চেয়ে বড় খবর
অন্য কিছু নেই
চলার মধ্যে আগে পিছে
বলে কিছু নেই।"

যাকগে এসব তত্ত্বকথা। Rewind! Rewind!! তখন আমার বছর ছয়েক বয়স—দাদার আট। বাবা আমাদের দু-ভাইকে নিয়ে স্টিমারে করে কলকাতা ছাড়তে এলেন। তখন শীলঘাট টাউন জেটি থেকে গোয়ালন্দ হয়ে স্টিমারে করে কলকাতা পৌঁছুতে লাগত আট-দশ দিন। সে ছিল এক অসাধারণ পরিক্রমা। আমার শিশু বয়সের এবং কৈশোরের সেই সব স্টিমার যাত্রা আমার মনের এক বিশেষ গ্যালারিতে অদ্ভুত সব ছবি ধরে রেখেছে। সারাক্ষণ আমার কাটত জাহাজের ডেকে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নদী দেখতে দেখতে। কালো কালো শুশুক ভুসভুস করে ভেসে উঠত কাঠের গুঁড়ি, মরা গরু, কচুরিপানার চর সব কিছু ভেসে ভেসে দূরে পিছনে চলে যেত। কমলালেবু খেতে খেতে নদীতে খোসা ছুঁড়ে ফেলতেই সেটা হুহু করে চলে যেত। বাবা বলতেন ওরা সব আবার আসামে ফিরে যাচ্ছে।

যখন কোনো গ্রামের পাশ দিয়ে স্টিমার যেত নদীর ঘাটে মেয়েরা কেউ স্নান করছে কেউ কাপড় কাচছে কেউ জল তুলছে কলসি ভরে কাঁখে নিয়ে চলে যাচ্ছে ন্যাংটো বাচ্চারা নাচতে নাচতে আঙুল তুলে স্টিমার দেখাচ্ছে কিছু জেলে নৌকা স্টিমারের পাশ বরাবর এসে চেঁচিয়ে কিছু বলছে আর জাহাজ তার ইঞ্জিনের ভকভক শব্দে শেয়ালডাকার মতো ভোঁ বাজিয়ে ঢেউয়ের পর ঢেউ পাড়ে ছড়িয়ে দিয়ে চলে যেত। যখন নোঙ্গর করে থাকত মাঝনদীতে—শাকসবজি মাছ মুরগি ছাগল পর্যন্ত কত কিছু নিয়ে ব্যাপারী নৌকাগুলো ভিড় করত। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ওঠা-নামা কেনাবেচা চলত। আর এখনো মুখে লেগে আছে সেই স্টিমারের মুরগির মাংস আর ইলিশ মাছ রান্নার অপূর্ব স্বাদ। চাটগেঁয়ে বাবুর্চিরা সে সব রান্না করত। এখনো ভাবলে আমার মুখে জল আসে।

এখন গতির যুগ! ট্রেন লাইন বসে গেছে—স্টিমার উঠে গেছে। ইলেকট্রিক ট্রেন

হয়েছে—জেট প্লেন চলছে, নিমেষে শয়ে শয়ে মাইল অতিক্রম করে যাচ্ছে। কিন্তু আমার বড় কষ্ট হয় যখন ভাবি আমাদের এ-যুগের সন্তানেরা কী অসাধারণ সব অভিজ্ঞতার স্বাদ থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হল। আবার ভাবি যা হল এইটেই ভালো। স্মৃতি বড় মায়াবী। হয়তো আমার চোখে যে অতীত স্বপ্নময় সোনাজল হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে, এ-যুগে তাকে নেহাতই মামুলি মনে হত। কে জানে! আমার এখনো মনে পড়ে আমরা কলকাতা রওনা হবার সাত-আট দিন আগে থেকেই বাড়িতে তোড়জোড় চলছে—জিনিশপত্র গোছানো হচ্ছে। পেটব্যথা হলে জ্বর হলে সর্দি হলে আমাশা হলে কি কি ওষুধ খেতে হবে একটা বাক্সে বাবা সাজিয়ে বলে বলে দিচ্ছেন। মা সেলাইয়ের কলে বসে আমাদের জন্য একবছরের মতো শার্টপ্যান্ট ইজের সেলাই করে দিচ্ছেন আর তাঁর নিঃশব্দ কান্না চলছে দু-চোখ বেয়ে কখনো-বা হালকা ফোঁপানোর শব্দে। বাবা নিজেকে কঠোর করার চেষ্টা করছেন—"কাঁদবার কি আছে? ছেলেদের মানুষ তো করতে হবে নাকি এই জঙ্গলে থেকে বাঁদর হবে? তাছাড়া প্রত্যেক বছর পুজোর ছুটিতে গ্রীষ্মের ছুটিতে দুবার করে তো আসতে পারবে। ছেড়ে থাকেনি ছেড়ে থাকতে হবে। আমার ভবিতব্য দেশে থাকা নেই—কি করবে বলো!" বলতে বলতে বাবার নিজের গলাই ভারী হয়ে উঠল। চোখ থেকে চশমা খুলে মুছে আবার পড়তে বসলেন। খটাখট খটাখট মা-র সেলাইয়ের কল চলতে থাকল।

আজ মনে পড়লে ভীষণ লজ্জা লাগে যে আমার কিন্তু মোটেই কষ্ট হচ্ছিল না। বারাসাত থেকে আসাম ফেরার পথে আমরা দুতিনদিন কলকাতায় ছিলাম। কলকাতার রাস্তার আলোঝলমল গাড়ি ঘোড়া থরে থরে সাজানো দোকান পথচারী কতরকম মানুষের অবিরাম চলা আর বিচিত্র সব আগে-না-শোনা শব্দ আমার মনে এক জাদুরাজ্য বিস্তার করেছিল। মা যখন কাঁদছেন ছেড়ে থাকতে হবে ভেবে আমি তখন মনে মনে ছটফট করছি কবে কলকাতায় যাব এই ভেবে। তখন মনে হত আমি যদি শুধু ওই রকে বসে সারাদিন গাড়ি ঘোড়া লোকজন দেখতে পারি তাহলে আমার আর কিছু চাই না। খিদেতেষ্টা সব মিটে যাবে। হায়রে শিশুমন! কিন্তু শিশুমনই-বা শুধু বলি কেন? পরিণত মনেও তো কতবার ভেবেছি অমুকটা পেলে কিংবা তমুকটা হতে পারলে আর আমার কিছু চাই না। কিন্তু পাওয়া যখন মিটেছে তখন বারবার মনে হয়েছে কোথায় যেন হেরে গিয়েছি। এটাই আমি সত্যিই চেয়েছিলাম?....

"মনে করো সব পাওয়া গেল
ক্যাডিলাকে চেপে যাওয়া গেল
ফার্পোয় বসে খাওয়া গেল
আতরের জলে নাওয়া গেল
মুলতাসি টোড়ি গাওয়া গেল
যে মেয়ের পিছে ধাওয়া গেল
চোখে চোখ রেখে চাওয়া গেল
মনে করো সব পাওয়া গেল
যত কিছু ছিল চাওয়া গেল
মনে হবে— হেরে যাওয়া গেল॥"

এটা বানানো ছড়া নয়। আমার জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা।

এমনি এক অভিজ্ঞতার শুরু আমার সেই শিশু বয়সেই হয়েছিল। আমার জীবন

নাট্যের প্রথম অঙ্কের যে দৃশ্যে আমার কলকাতায় আসার স্বপ্ন দানা বেঁধেছিল সেই অঙ্কেরই শেষ দৃশ্যে আমি আর দাদা কলকাতার জানালাবিহীন পলেস্তারাটা কয়লার ধোঁয়ায় কালো দোতালার একটি ঘরে বেশ কিছু আরশোলা আর ইঁদুরের বরাহুত অতিথি হিশেবে বন্দী হলাম। দিগন্ত বিস্তৃত অরণ্য আর পাহাড়ের মাথা ছোঁওয়া মেঘের রাজ্য থেকে নিষ্প্রাণ খটখটে চারটে বোবা দেওয়ালের চতুষ্কোণ 'হাঁ'-এর মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম। রকে বসে রাস্তা দেখার সাধ আমার অচিরেই মিটে গেল। তিনদিন সঙ্গে থেকে বাবা আমাদের দু-ভাইয়ের হাতে পঞ্চম জর্জ মার্কা নতুন দুটো করে চকচকে টাকা দিয়ে দাদাকে বলে গেলেন—'কষ্ট না করলে মানুষ হওয়া যায় না বাবা। মনে রেখো তোমাদের বয়সে তোমাদের বাবা মাথার নীচে বালিশ কাকে বলে, পিঠের নীচে তোষক কাকে বলে জানত না। একটা মাদুর পেতে ওই নীচের রান্নাঘরের দাবায় আমার বছরের পর বছর কেটেছে। তোমাদের বিছানা আছে, বালিশ আছে, মশারি আছে, দুবেলা খাবার জলখাবারের ব্যবস্থা আছে, পড়াবার আলাদা মাস্টার আছে—কটা ছেলে এসব পায়? তুমি বড়, বুদ্ধি হয়েছে, ছোটভাইকে দেখ। ওটা কিচ্ছু বোঝে না, এখনো এক্কেবারে ছেলেমানুষ।' এইবার আমার কান্না পেল। সত্যিসত্যিই যে বাবা এই অবস্থায় আমাদের ফেলে রেখে চলে যাচ্ছেন হঠাৎ যেন উপলব্ধি হল। আমি বাবার হাত ধরে বললুম : 'আমি এখানে থাকব না বাবা, —আমি মা-র কাছে যাব।' জোরে জোরে কাঁদতে লাগলুম। 'আস্তে! আস্তে! লোকে নিন্দে করবে।' বলে খানিক বুঝিয়ে, চোখের জল মুছিয়ে, মুছে বাবা চলে গেলেন।

আমার জীবনে দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হল। স্থান: ২১নং সুকিয়া স্ট্রিটে আমার মেজ জ্যাঠামশায়ের বাড়ি। কাল সম্ভবত ১৯২৯-৩০। পরদা ওঠার আগে আমার বাবার কথা আর একটু বলি। নিজের জীবনের ছোটবেলার কথা পারতপক্ষে তিনি বলতে চাইতেন না। মাঝেমধ্যে হঠাৎ আবেগের ঝলকে তা বেরিয়ে পড়ত। তাঁর প্রাকবিবাহ জীবনের অনেক কিছুই আমরা জানি না—আজ আর জানারও উপায় নেই। যেটুকু বোঝা যায় তা হল প্রচণ্ড-দুঃখকষ্টের মধ্যে তাঁর শৈশব কৈশোর এবং প্রথম যৌবন কেটেছে। তিনি যখন দেড় বছরের দুগ্ধপোষ্য শিশু তখন তাঁর মা মারা যান। বাবা বলতেন—'শুনেছি আমার মা যখন মারা গেছেন তখনো আমি তাঁর বুকের দুধ খাচ্ছি।' মৃতা মায়ের বুক থেকে সেই দুগ্ধপানরত শিশুকে ছাড়িয়ে তুলে নিয়েছিলেন তাঁর চার দিদিদের কেউ। এর পরে দেড় বছর না যেতে যেতেই মারা গেলেন আমার ঠাকুরদাদা তিন বছরের শিশু আমার বাবাকে অনাথ করে দিয়ে। আট ভাইবোনের কনিষ্ঠতম আমার বাবার ভাগ্যে তাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সবচেয়ে নামকরা উকিল জমিদার রামতারণ চৌধুরীর রমরমার প্রায় কিছুই ভাগে পড়েনি। সাত ভাইবোনের মুখের সোনার চামচ পরম্পরায় চুষতে চুষতে বাবার মুখে যখন পৌঁছুল, তখন তার গিলটি উঠে সিসে বেরিয়ে পড়েছে। এ দাদা সে দিদি করতে করতে শেষ পর্যন্ত এই ২১নং সুকিয়া স্ট্রিটে তাঁর মেজদার বাড়িতে এসে স্কুলে ভরতি হয়েছিলেন। আমার মেজজ্যাঠা ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী ছিলেন সদাগরি জাহাজ কোম্পানির ডাক্তার অর্থাৎ জাহাজে জাহাজেই তাঁর দেশ বিদেশ ঘুরে ঘুরে কাটত—ন-মাসে ছ-মাসে বাড়ি আসতেন। জেঠিমা ছিলেন প্রায় শয্যাশায়ী রুগ্ণা। কাজেই তাঁর এক তীক্ষ্ণনাসা সোনার রং ছিপছিপে সুন্দরী বিধবা বোন এসে এবাড়ির সংসারের হাল ধরলেন। তাঁর চোখে আমার বাবা একটা অপ্রয়োজনীয় আবর্জনা ছাড়া কিছু ছিলেন না। অনতিবিলম্বেই বাবা এ বাড়ির চাকর হয়ে উঠলেন। বাজার করা বাসন মাজা

ছোটভাইপোদের স্কুলে পৌঁছানো নিয়ে আসা এসবই তাঁকে করতে হত ধার করে বই টুকে নিজের পড়াশুনো করার সঙ্গে সঙ্গে। জ্যাঠামশায়ের পক্ষে হয়তো জানা সম্ভব ছিল না কিভাবে তাঁর সবচেয়ে ছোট অনাথ ভাইটি মানুষ হচ্ছে। কারণ অভিযোগ অনুযোগ করা বাবার কুষ্ঠিতে ছিল না। এ বাড়ি থেকেই বাবা এন্ট্রান্স পাশ করলেন। এই সময় বাবা এক ডাক্তারের বাড়িতে ছেলেমেয়ে পড়াতেন। সেই ডাক্তার আড্ডির দৌলতেই তাঁর বাড়িতে থেকে বাবা ডাক্তারি পড়তে ঢুকলেন ক্যাম্পবেল মেডিকেল কলেজে। এসবই আমার বাবার মুখে বিভিন্ন সময়ে শোনা টুকরো টুকরো ঘটনাকে দুয়ে দুয়ে চার করে গ্রন্থনা করা। এমন সাজিয়ে বাবা কখনো বলেননি।

বাবার সেই মেজবউদির সুন্দরী বিধবা বোনকে আমরা যখন সুকিয়া স্ট্রিটে পেলাম তখন তিনি এক পোড়া সোনার রং, কোমর বাঁকা, হাঁটু অবধি থান কাপড় পরা, সামনের দুটো অবশিষ্ট-উঁচুদাঁত-বিশিষ্টা, চামড়ায় শত-ভাঁজ প্রচণ্ড খ্যানখেনে এক ছুঁৎমার্গী বুড়ী। 'ওটা ছুঁবি না'—'ওদিকে যাবি না' 'এবার গিলবে এসো।' 'এতক্ষণ কোথায় মরেছিলে?' ইত্যাদি তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত বাণী আজও আমার স্মৃতির কানে মধুবর্ষণ করে। তাঁকে আমরা পিসি বলতুম কি সুবাদে তা আর মনে নেই।

বাবা চলে যাবার পর প্রথম রাত্রি আমার কাটল একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে। গোয়ালন্দ ছেড়ে স্টিমার একটা প্রচণ্ড ঝড়ে পড়েছে····কেবিনের মেঝেয় আমরা বেওয়ারিশ কুমড়োর মতো গড়াগড়ি খাচ্ছি—জলের আর হাওয়ার প্রচণ্ড গর্জন। গড়াতে গড়াতে আমি কেবিন থেকে কি করে যেন বেরিয়ে রেলিঙের ধারে চলে গেছি—দুটো পা কোমর পর্যন্ত বাইরে ঝুলছে—আমি নদীতে পড়ে যাচ্ছি, চিৎকার করছি—'বাবা!' 'বাবা'! অথচ গলায় কোনো আওয়াজ নেই। তারপর শুনি ধাক্কা দিয়ে দাদা ডাকছে—'বাচু বাচু!! কি হয়েছে রে? গোঁ গোঁ করছিস কেন? ভয় পেয়েছিস?' ঘুম ভেঙে দেখি আমি তক্তপোশ থেকে অর্ধেক নীচে ঝুলছি—প্রচণ্ড আওয়াজ করে কলের জল বালতিতে ভরছে আর খ্যানখ্যানে গলায় পিসি জমাদারের বাপান্ত করছেন। বাইরে তখন ভোর হচ্ছে। আমি চোখেমুখে জল দিয়ে সোজা নীচে নেমে বাইরের রকে গিয়ে বসলুম কলকাতা দেখতে। ফট্‌ফট্ ফটাস্ শব্দ করে বিরাট পিচকারীর মতো হোসপাইপে করে জল দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে। গ্যাসের বাতিগুলো তখনো জ্বলছে। একজন লোক সেগুলো একটা লম্বা আঁকশি দিয়ে নিভিয়ে দিতে দিতে যাচ্ছে। ওরাই আবার সন্ধ্যায় একটা মই নিয়ে এসে বাতি জ্বেলে যেত। ঠুং ঠুং রিকশা আর দু-একটা ঘোড়ার গাড়ি বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। পথচারীরা চলতে শুরু করেছে। তার মধ্যে পিঠে চামড়ার থলিতে জল নিয়ে চলেছে ভিস্তিরা। এদিক-ওদিক থেকে কয়লার উনুনের ধোঁয়া রাস্তায় ভেসে বেড়াচ্ছে। ভিজে রাস্তার গন্ধের সঙ্গে ঘোড়ার মলমূত্রের অদ্ভুত এক ঝাঁঝালো গন্ধ কয়লার ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে মিশে এক বিচিত্র পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। সেই গন্ধ পুরোনো দিনের ভোরের কলকাতার কনডিসন্‌ড রিফ্লেক্স হয়ে আজও আমার অবচেতনে বেঁচে আছে। ওই জাতীয় গন্ধ নাকে এলেই সেই ছোটবেলার কলকাতার দৃশ্য আর শব্দ মানসপটে ভেসে ওঠে।

দাদা এসে বলল—'চল জলখাবার দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিবি। বড়দা স্কুলে নিয়ে যাবে।' দাদার পিছু পিছু রান্নাঘরে এসে এদিক-ওদিক খুঁজছি কোথায় জলখাবার। খ্যানখেনে আওয়াজ এল—'হাত পাত্।' তাকিয়ে দেখি শূন্যে পিসির হাতে দুখানা হাতে গড়া রুটি ঝুলছে। ছোঁয়া বাঁচিয়ে দুটি ছোট ছোট ক্ষুধার্ত হাতের ওপর আখের

গুড়-মোড়া সেই রুটি তিনি নিক্ষেপ করলেন। তার আগে কখনো রুটি খাইনি। আমি জানতুম ওটা বাবার হাসপাতালের রুগিদের পথ্য। ক্ষীণকণ্ঠে সবে মুখ থেকে বেরিয়েছে 'রুটি আমি খাই না' অমনি বাপমা তুলে প্রচণ্ড বাক্যবাণের এমন ঝাঁক ছুটল বুড়ীর মুখ থেকে আমি পালাতে পথ পেলুম না। এ বাড়িতে সর্বময়ী কর্ত্রী বলতে ছিলেন এই পিসি।

এই মিশরীয় মমির মতো দেখতে পিসিকে ছোটদি বা বউদি তো বটেই এমনকী বড়দা পর্যন্ত সমীহ করে চলতেন—একমাত্র ছোড়দাকে ভয় পেত পিসি। তাঁর কথা পরে বলব। তাঁদের এই সমীহ করার নিশ্চয় কার্যকারণ ছিল যেটা আমার জানার কথা নয়। আমার চোখে এই বুড়ী ছিল ভীষণ সংকীর্ণমনা নীচ এক ডাইনী বিশেষ, এক সঙ্গে দাদা আমি ভাইপো ভাইঝি হয়তো খেতে বসেছি বুড়ী ঝোলের ডোবায় ডুবুরির মতো হাতা ডুবিয়ে পরম নৈপুণ্যে বেছে বেছে সব চেয়ে ছোট মাছের টুকরোটা দিত আমাদের পাতে। লজ্জা ওইটুকু বয়সে আমার হত। আমি মাথা নিচু করে এদিক-ওদিক না তাকিয়ে খেয়ে উঠে যেতাম। একবার দাদা বোধহয় বলে ফেলেছিল—'মাছের মুড়ো খেতে বাচু ভালোবাসে—মুড়োটা ওকে দাও না পিসিমা।' বাস্! বুড়ীর যে মুখভঙ্গি এবং অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে—'এঁঃ...ভারী আমার মুড়োখানেওয়ালা এলোরে। যা পচ্ছিস তাই বাপের ভাগ্যি! খেয়ে নিয়ে চুপচাপ উঠে যাবি'—এই বাক্য কটি নিঃসৃত হল শুনে ঘেন্নায় আমার গা গুলিয়ে উঠল। আমি না খেয়ে উঠে গেলাম। রাত্রে বড়দা অফিস থেকে ফিরলে বুড়ীর অভিযোগ শুনলুম—'তোমার ওই লাটসাহেবের বেটা গুণধর ভায়েদের জন্য দুবেলা মাছের মুড়োর ব্যবস্থা করোগে, মুড়ো না হলে ওঁদের মুখে ভাত রোচে না।' বড়দা খেটেখুটে আসার পর বাড়ি না ঢুকতেই তাঁর জন্য এই জাতীয় নীচ মিথ্যা নালিশ তৈরি থাকত। স্বভাবতই বড়দা এক-এক সময় রেগে গিয়ে জানতে চাইতেন—'ব্যাপারটা কী?'

বউদি সামাল দিতেন। খাওয়ার খোঁটা রোজ শুনতে হত আমাদের অথচ বাবা আমাদের খাওয়া খরচ বাবদ তখনকার দিনে ৩০ টাকা করে পাঠাতেন যা আজকের দিনে অন্তত চার-পাঁচশো টাকার কাছাকাছি। এ সব কথা বলতেও আমার নিজেকে ছোট মনে হয়। কিন্তু আগে-না-জানা এই জাতীয় হীনতা এবং নীচমন্যতা আমার শিশুমনকে অসম্ভব পীড়া দিয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক যে উত্তর জীবনে জগৎ সংসারের সঙ্গে লেনদেনের কাজে লিপ্ত হতে গিয়ে অনেক বেশি নীচতার স্বার্থপরতায় মুখোমুখি হয়েও খুব বেশি অবাক যে হইনি তার কারণ বোধহয় ছোটবেলায় ওই টীকা আমার নেয়া ছিল। তবুও স্বীকার করব নীচতা হীনতা স্বার্থপরতা যত দেখেছি তার তুলনায় অনেক অনেক বেশি দেখেছি মানুষের মহত্ত্ব, উদারতা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর নির্দ্বিধায় আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ। তা না হলে পৃথিবী বোধহয় স্থাণু হয়ে থেকে যেত, অগ্রসর হতে পারত না। বেঁচে থাকার আশা করার স্বপ্ন দেখার কোনো কারণ অবশ্যি থাকত না। সে দিন না খেয়ে উঠে-যাবার পর থেকে পিসির আমি দুচক্ষের বিষ হয়ে উঠলুম। রোজ সকালে হাত পেতে রুটি নিতুম বটে কিন্তু সামনে খেতুম না। নিয়ে বাইরে বেরিয়ে খেতুম। তার ফলে বাড়ির সামনে ডাস্টবিনের পাশে বসে থাকা নেড়ি-কুকুরটা দিনদিন গায়ে-গতরে ফুলতে লাগল আর আমার প্যান্টের বেল্টে নতুন নতুন ছেঁদার প্রয়োজন বাড়তে লাগল। সে আমার এত ভক্ত হয়ে উঠল যে রোজ স্কুলের দরজা পর্যন্ত সে আমায় এগিয়ে দিয়ে আসত। আমি আদর করে তার নাম রেখেছিলুম 'নেড়ি পিসি।' রামমোহন রায়ের বাড়ির উলটো দিকে আমহার্স্ট স্ট্রিটের ওপর ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি স্কুলে আমি আর দাদা ভরতি হলুম—বোধহয় আমি ক্লাস থ্রিতে। ওই স্কুলেই আমি প্রথম মিথ্যে কথা বলতে

শিখি। ঘটনাটা বলি। স্কুলে একদিন ছোট-বাথরুম করার জন্য ছুটি নিয়ে এসে বুঝলুম যে আমার বড়টাও পেয়েছে। কিন্তু আমার নির্বোধ শিশুমনে মনে হল পেচ্ছাপ করব বলে এসে পায়খানা করাটা মিথ্যাচার হবে। মিথ্যাকথা বলার জন্য শাস্তি পেতে হবে হয়তো অতএব ক্লাসে ফিরে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেগ সামলাতে না পেরে বললুম —'স্যার! বাইরে যাব'—স্যার বললেন—'এই না তুই বাইরে গিয়েছিল?' —বললুম 'হ্যাঁ স্যার! তখন পেচ্ছাপ করতে গিয়েছিলুম এখন পায়খানায় যাব।' তিনি কিছুতেই ছুটি দিলেন না। ফলে ক্লাসের মধ্যে বসে বসেই প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হয়ে সেই লজ্জার মধ্য দিয়ে জীবনে আমার প্রথম সাংসারিক জ্ঞান লাভ হল—"সদা সত্য কথা কহিবে" —এই নীতিবাক্যটি যারা জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলতে চায় তাদের প্যান্টে হাগতে হয়।

লেখাপড়া যাই হোক স্কুলে আমি অচিরেই লাট্টু এবং গুলি খেলায় পারদর্শী হয়ে উঠলাম। স্কুলের পর সামনের উঠোনে সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত গুলি আর লাট্টু খেলা। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছ করত না, তাই যতক্ষণ না ফিরলে নয় বাইরে কাটাতুম। ওই স্কুলে ছিল একটা দারুণ জিমনাসিয়াম। এক একদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আমি ছেলেদের শরীরচর্চা দেখতাম। মনে আছে আয়রনম্যান নীলমণি দাস ছিলেন ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটর। কী অসাধারণ স্বাস্থ্য ছিল ইবোনি কাঠের মতো কালো সেই দেহে। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখতাম। আর একটি ছাত্র ছিল, বছর ষোলো তখন তার বয়স। গ্রিক স্ট্যাচুর মতো ফিগার ছিল তার। তার গালের একটা দিক ছিল পোড়া। ব্যায়াম করার পদ্ধতির চার্টে নীলমণি দাসের এবং সেই ছেলেটির ছবি যখন আজও মাঝে মধ্যে দেখতে পাই ক্যালকাটা অ্যাকাডেমির কথা মনে পড়ে। দুঃখের বিষয় মাস্টারমশাইদের কাউকেই আমার মনে নেই—শিক্ষণ পদ্ধতিটা মনে আছে। তখন প্রত্যেক মাস্টারমশাই ক্লাসে ঢুকতের বেতের চাবুক আর খড়ি ডাস্টার নিয়ে। ছুতোয়-ছাতায়—'এই কে শব্দ করল রে?—ইদিকে আয়—হাত পাত হাত পাত'—তাঁদের হুমকি আসত। ছেলেটি হয়তো কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল—'আর করব না স্যার!' —খটাং করে মাথার মাঝখানে পড়ল একটা গাঁট্টা—'হাত পাত'। এবার ছেলেটি হাত পাতল। গুনে গুনে অবস্থা বুঝে পাঁচ কিংবা দশঘা চাবুক মেরে মাস্টারমশাই তার শিক্ষণপদ্ধতির প্রাথমিক প্রক্রিয়াটির প্রদর্শন করতেন। এছাড়া ছুতোয় ছাতায় 'নীল ডাইন' 'বেঞ্চের ওপর দাঁড়া' কিংবা 'কান ধরে এক পায়ে দাঁড়া' এই সব মহৌষধির প্রয়োগ তো হতই।

আমাদের ক্লাসে বয়সে বেশ বড় গাঁটাগোট্টা একটা ছেলে ছিল—আজকালকার ভাষায় যাকে বলে Bully। প্রায় প্রত্যেকদিনই সে পায়ের ওপর পা দিয়ে কোনো না কোনো ছেলের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে বলত—ইস্কুল শেষ হলে লড়তে হবে। অধিকাংশ ছেলেই লড়তে চাইত না। কিন্তু ওই Bullyর ছিল বেশ কিছু চামচা। তারা চেঁচাত—'লড়তে হবে—লড়তে হবে।' লড়তে বাধ্য হয়ে তারা বেধড়ক মার খেত। একবার গুলি খেলায় হেরে সেই ছেলেটা—নাম মনে নেই—আমার জেতা গুলিগুলো কেড়ে নিয়ে বলল—'লড়ে যা—যে জিতবে গুলি তার'। তার চামচারা চেঁচাতে লাগল—'সলিল লড়ে যা লড়ে যা। আমি ভয় পেয়ে বললুম—'চাই না আমার গুলি—তুই গুলিচোর।' —'কি বললি? গুলি চোর?' —সবাই বলল ওই কথাটি বলার জন্য লড়ে যেতেই হবে। স্কুলের মধ্যে লড়াই বারণ ছিল। সারকুলার রোডে রামমোহন লাইব্রেরির সামনে তখন সিমেন্ট বাঁধানো ফুটপাত ছিল না। ঠিক হল, ওইখানে লড়াই

হবে। ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করতে করতে বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে ছেলেদের পাল্লায় পড়ে রণক্ষেত্রের দিকে চললুম। অনেক ছেলে যারা মার খেয়েছে তারা আমায় সাহস দিতে লাগল—'মারবি ওই মোটকার নাকে একটা ঘুষি—ঠিক হেরে যাবে। আমি জানতুম কানের পাশে রগে মারলে ঘায়েল করা সহজ। এরিয়ায় পৌঁছেই ওকে প্রস্তুত হবার সময় না দিয়েই সজোরে ডান হাতের গাঁট্টাটা হাত ঘুরিয়ে রগ তাক করে মারতেই ছেলেটা কাটা গাছের মতো পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। হই হই করে আশপাশের বড়রা ছুটে এল। ভয়ে তখন আমার হাঁটু দুটো থরথর করে কাঁপছে। জল নিয়ে এসে মুখে চোখে দিতে দিতে কিছুক্ষণ পরে সে উঠে বসল। তারপর কাউকে কিছু না বলে মাটি থেকে নিজের ধুলোমাখা বইগুলো কুড়িয়ে নিয়ে মাথা নিচু করে চলে গেল। হঠাৎ আমি ছেলেদের কাছে হীরো হয়ে গেলাম। পরের দিন সারা ক্লাসে ছড়িয়ে গেল—'সলিল এক ঘুষিতে ওই মোটকাকে অজ্ঞান করে দিয়েছে।' —ছোটবেলায় আমি ছিলাম রোগা টিংটিঙে। সেই বক্সিঙের কথা মনে পড়লেই আমার চার্লি চ্যাপলিনের সেই বিশাল দৈত্যের মতো বক্সারের সঙ্গে লড়াই এবং তাকে নকআউট করার ছবিটা চোখের সামনে ভাসে। একা একাই বসে বসে হাসি।

পাঁচ

তখনো জানতুম না যে এই ২১নং সুকিয়া স্ট্রিটের অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে বাড়িটার মধ্যেই আমার জন্য প্রচণ্ড এক বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে। মনে আছে সেদিন ছিল শনিবার—বোধহয় ১৯৩০ সাল। সন্ধ্যাবেলা ওপরের দালানে বসে আমাদের গৃহশিক্ষক টুলুদার কাছে পড়ছি হঠাৎ নীচে থেকে পিয়ানো বেহালা ক্ল্যারিওনেটে তবলায় বাজানো এক অপরূপ অর্কেস্ট্রার সুর বাজতে লাগল। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলুম—এ সুর যেন এ বাড়িতে মানায় না। হঠাৎ যেন ধোঁয়ায় ভরা স্যাঁতসেঁতে বাড়িটার ইট-বের-করা দেয়ালগুলো ভেঙে গিয়ে এক বিস্তীর্ণ মাঠের সামনে এনে খোলা হাওয়ায় আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। সে মুক্তির আস্বাদের তীব্র আনন্দ আমি কোনোদিন ভুলব না। সব কিছু ভুলে আমি পাগলের মতো ছুটে সিঁড়ির দিকে যেতেই খ্যানখেনে কণ্ঠ বেজে উঠল—'খবরদার! নীচে যাবি না। কেলাব ঘরে যাওয়া বারণ।' সুরটাকে কে যেন করাত দিয়ে দু-টুকরো করে কাটল। কিন্তু সেদিন থেকেই আমার মুক্তির দরজা খুলে গেল। সেদিন যে সুরে পাগল হয়েছিলাম তা ছিল এক অত্যন্ত সাধারণ বাংলা গানের সুরের গৎ। কিন্তু সেদিন আমার কাছে তা মনে হয়েছিল স্বর্গীয়। গানটার কথা ও সুর আজও আমার মনে আছে। গানটি ছিল—

'অতিথি এসেছে দ্বারে
ছিল সে নদীর ওপার
তারে চিনি চিনি যেন চিনি গো
চেনা চেনা যেন মুখটি তার'

আর একটি গানের গৎ বাজত—

'আজি এ শারদ রাতে
হবে কি মিলন সখী'

কার লেখা কার সুর আজও জানি না।

ওই বাড়িতেই নীচের বৈঠকখানায় ছিল 'মিলন পরিষদ' অর্কেস্ট্রা ক্লাব। আমার ছোড়দা ননী (নিখিল চৌধুরী) ছিলেন তার পরিচালক। ছোড়দাকে তার আগে দেখিনি। বোধহয় ওঁরা বায়না নিয়ে কোথাও বাজাতে গিয়েছিলেন। পরের দিন রবিবার পিসির চোখ এড়িয়ে আমি ক্লাব ঘরের রাস্তার দিকে জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম। বেহালা, ক্ল্যারিওনেট পিয়ানো সেতার তবলা পাখোয়াজ ইত্যাদি নানা যন্ত্রপাতি ইতস্তত ছড়ানো আর দীর্ঘদেহ গৌরাঙ্গ এক পুরুষ খালি গায়ে মাটিতে বসে একটি বেহালায় তার পরাচ্ছেন। ছোড়দাকে সেই প্রথম দর্শনে আমার মনে হল যেন মানুষ নয় কোনো দেবতা সংগীতের স্বর্গরাজ্যে বসে আছেন। আমার এই ছোড়দার ছিল অসাধারণ সংগীত

প্রতিভা। যদিও মূলত তিনি ছিলেন ক্ল্যারিওনেট এবং বেহালাবাদক কিন্তু এমন কোনো যন্ত্র ছিল না যা ছোড়দা বাজাতে জানতেন না। সেতার এসরাজ তবলা থেকে নিয়ে পিয়ানো ইংলিশফ্লুট পিকোলো ট্রামপেট পর্যন্ত ছিল তাঁর আয়ত্তে। তাঁর বিভিন্ন যন্ত্রে দখলের নেশা আমাকেও পেয়ে বসেছিল ছোটবেলা থেকেই। "এক একটা যন্ত্র চরিত্রে আলাদা মেজাজে আলাদা, ভাবভঙ্গিতে দেখতে আলাদা, যেন বিভিন্ন জাতের সব সুন্দরী মেয়েরা। এদের সঙ্গে আলাপ করে ভাব করে তাকে জয় করা সুন্দরী মেয়ে জয় করার মতনই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু শুধু ওই প্রেম করা অবধিই—বিয়ে করতে নেই। বিয়ে করলেই একটি যন্ত্রের সঙ্গে ঘর করতেই সারা জীবন কেটে যাবে। অর্কেস্ট্রা করা আর হবে না।" এ ছিল ছোড়দার থিওরি—যখন তাঁর বেহালায় অসাধারণ হাত দেখে বন্ধুরা বলতেন, "তুই যদি শুধু ওই যন্ত্রটা নিয়েই পড়ে থাকতিস ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বাদক হতে পারতিস"—তার জবাবে। তখন কথাটার মানে বুঝতাম না এখন বুঝতে পারি। একক বাদক বা Soloist হওয়া এক কথা আর অর্কেস্ট্রার Composer হওয়া অন্য আর এক কথা। প্রতিটি যন্ত্রের স্বরের রং (tone colour) তার ব্যাপ্তি তার সীমাবদ্ধতা তার নিজেকে প্রকাশ করার বিশেষ ঢঙ এটা না বুঝলে বহুস্বর (Polyphonic) অর্কেস্ট্রা করা অসাধ্য ব্যাপার। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ছোড়দা মাত্র ৩২ বছর বয়সেই মারা গেলেন পাগল হয়ে। তাঁর নিজের সব Composition কিছুই আর নেই। শুনেছি পাগল হয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। বউদির কাছে পরে শুনেছিলাম ছোড়দা এত দুর্দান্ত হয়ে যেতেন যে হাতের কাছে যা পেতেন তাই আছাড় মেরে ভেঙে ফেলতেন। এই সময় তাঁকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখতে হত। এই অবস্থায় একটু রাত গভীর হলে ডাকতেন 'বউদি! আমার বেহালাটা দাও।' প্রথম প্রথম বউদি দিতেন না আছড়ে ভেঙে ফেলবে এই ভয়ে। কিন্তু শেষের দিকে এমন কাকুতি মিনতি করতেন যে বউদি বেহালাটা দিয়ে দেন। সারা রাত ধরে সেই বেহালা ছোড়দার হাতে কাঁদত আর তাঁর দুচোখ বেয়ে জল পড়ত। সেই বেহালায় একটি আঁচড়ও লাগেনি যখন মারা গেলেন তার কয়েকদিন পর। এই ছোড়দাই ছিলেন আমার সংগীত জীবনের প্রথম এবং শেষ গুরু। আমার জীবনে সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে আমার ছোড়দা আমার সংগীত পরিচালক হওয়া দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু আমার সেই ছোটবেলার দেখা ছোড়দাকে তাঁর অগাধ ভালোবাসা আর অসাধারণ প্রতিভাকে আমি কখনো ভুলতে পারব না।

আগেই বলেছি ওই 'কেলাব' ঘর ছিল আমাদের নিষিদ্ধ এলাকা। আমি ওর আশেপাশে ঘুরঘুর করতুম। ভীষণ ইচ্ছে করত যন্ত্রগুলো একটু ছুঁয়ে দেখি। তার আগে রেকর্ডে আমি অনেক বাজনা শুনেছি কিন্তু সেই বাজনা যে জলজ্যান্ত মানুষ বাজাতে পারে এটা ছিল আমার কাছে এক অবাক কাণ্ড। রেকর্ডের বাজনাগুলোও যে মানুষেরই বাজানো তা বোঝবার বুদ্ধি বা বয়স আমার তখনো হয়নি। স্কুলের ছুটির পর খেলাধুলো আমার সব উঠে গেল। সোজা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে রাস্তার দিকের রকে বসে অর্কেস্ট্রার রিহার্শাল শুনতুম। এমনি করে কিছুদিনের মধ্যেই ছোড়দাদের বাজনার সব গৎগুলোই আমার মুখস্থ হয়ে গেল।

আমি বিভিন্ন যন্ত্রের বাজনা নকল করে গলা বদল করে করে সেগুলো হুবহু গাইতে পারতুম। দুপুরে স্নান এবং খাবার সময়ই শুধু ছোড়দা বাড়ির ভিতরে আসতেন, বাকি সব সময় ক্লাব ঘরে। শুতেনও ওই ঘরে। এক ছুটির দিনে দুপুরে আমি ছাদে গিয়ে মনের আনন্দে চিৎকার করে বাজনাগুলোর সুর গাইছি—জানি না কখন ছোড়দা এসে

দাঁড়িয়েছেন। প্রায় সব গৎগুলোই গাওয়া সেরে নীচে নামব বলে পিছন ফিরতেই দেখি ছোড়দা দাঁড়িয়ে। যেন বিরাট একটা অন্যায় অনধিকারচর্চা করেছি এই ভয়ে আর কুণ্ঠায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে গেলুম।

—তুই কে? খোকা না বাচু?

—বাচু…

সেদিন সন্ধ্যায় 'মিলন পরিষদ' অর্কেস্ট্রার ঘরভর্তি যন্ত্রীদের সামনে ছোড়দা আমাকে হাজির করলেন। প্রচণ্ড হাততালি আর প্রশংসার মধ্যে একটা একটা করে সব গৎগুলো আমাকে গাইতে হল। সেদিন থেকে আমার সংগীত জীবনের নতুন এক দিগন্ত খুলে দিলেন আমার ছোড়দা। আগেই বলেছি ওই পিসি কি কারণে জানি না ছোড়দাকে দেখলে কুঁকড়ে যেতেন। তার কুক্ষী থেকে ছাড়িয়ে এনে ছোড়দা আমাকে ওঁর পক্ষপুটে আশ্রয় দিলেন। তাই নিয়ে বড়দার সঙ্গে কথা কাটাকাটিও হল যে আমাকে গানবাজনার আড্ডায় নিয়ে উচ্ছন্নে দেয়া হবে। কিন্তু ছোড়দার ছিল ও বাড়িতে শেষ কথা। ওইটুকু বয়সে আমার মধ্যে ছোড়দা যে কি প্রতিভা দেখলেন জানি না—অচিরাৎ আমাকে যন্ত্রসংগীতের নানা বিষয়ে দিগ্‌গজ করে তোলার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। শেলীদার (পুরো নাম মনে নেই) কাছে পিয়ানো, বিশ্বনাথ কুণ্ডুর (উনি ভীষ্মদেবের তবলচি ছিলেন—এখনো বেঁচে আছেন) কাছে নাড়া বেঁধে তবলা, গোপাল লাহিড়ীর (বিখ্যাত ক্ল্যারিওনেট বাদক) কাছে বাঁশী—প্রায় মাস তিনেকের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল।

আমি আমার চা বাগানের কুলিছেলেদের কাছে তীরন্দাজির সাথে সাথে বাঁশের বাঁশি বাজানোও শিখেছিলাম। সেই বাঁশিতে এখন গোপালদা গৎ দিতে লাগলেন। ওঁর কাছে একটি অসাধারণ বেহাগ রাগের গৎ শিখেছিলাম আজও আমার মনে আছে এবং আজও মনে হয় অসাধারণ। সংগীতের নেশা আমায় এমন পেয়ে বসল যে ছোড়দারা বেরিয়ে গেলে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিয়ানো এবং হারমোনিয়ম অভ্যাস করতাম। কিন্তু ছবছর বয়সে হাতের মাপ এত ছোট ছিল যে সপ্তকে হাত পৌঁছত না—তাই বাঁ হাতে লাফিয়ে লাফিয়ে কর্ড বাজাবার একটা পদ্ধতি আমি আবিষ্কার করেছিলুম। ছমাসের মধ্যে ছোড়দার অর্কেস্ট্রার সব গৎ আমি পিয়ানো বা বাঁশিতে বাজাতে পারতুম। ছোড়দা নিজে আমাকে বেহালা শেখানোর ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু আমার হাতের মাপের ছোট বেহালা পাওয়া গেল না। তাতে অবশ্য আমার দুঃখ ছিল না। সেই সময় আমাদের ক্লাবে অনেক বড় বড় ওস্তাদ এবং নামকরা যন্ত্রীরা প্রায়ই আসতেন। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মাঝে মধ্যে আসতেন আর তাঁর গানের আসর বসত। তখন দুটো দলে খুব রেশারেশি ছিল। একদল ছিল জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর ভক্ত আর অন্যদল ভীষ্মদেবের। ছোড়দারা ছিলেন ভীষ্মদেবের দলে। তাঁদের মতে জ্ঞান গোঁসাই হচ্ছে old School—ভীষ্মদেব হলেন Modern School 'কি তাঁর টেকনিক, কি তাঁর অবাধ গতি, তিন সপ্তা ধরে অবলীলাক্রমে তার ওঠানামা।' সত্যি কথা বলতে কি আমি কিছু বুঝতুম না। স্বভাবতই মার্গসংগীতের রসোপলব্ধির বয়স সেটা নয় কিন্তু তাঁর গাওয়া 'অব হো লালন ম্যায়' আমার শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। যন্ত্রীদের মধ্যে আমার মনে পড়ে প্রখ্যাত বেহালাবাদক এবং পরবর্তীকালে শিক্ষক জি নস্কর প্রায়ই আসতেন। খুব কালো ছিল তাঁর গায়ের রং কিন্তু কি মিষ্টি হাত! ছোড়দা বলতেন কালো লোকদের হাত মিষ্টি হয়। আমাকে বলতেন—"তুই তো কালো। বেহালা শেখ, ওইরকম বাজাতে পারবি। আমার দ্বারা হবে না।" পরবর্তীকালে আমার অর্কেস্ট্রায় নস্করদা বেহালা বাজিয়েছেন। তখন

নির্বাক সিনেমার যুগ চলছে কলকাতায়। মানিকতলায় ছায়া সিনেমায় মিলন পরিষদ কন্ট্রাক্ট পেল আবহ সংগীত বাজাবার। রবিবার রবিবার সেখানেও ছোড়দা আমাকে নিয়ে যেতে লাগলেন। তখন প্রত্যেক সিনেমা হলে অর্কেস্ট্রা পার্টি থাকত মাইনে করা। ছবি শুরু হবার আগে এবং ইনটারভ্যালে গৎ বাজানো হত। ছবি শুরু হলে যন্ত্রীরা পর্দার পিছন দিকে বসে ছবি দেখে দেখে আবহ সংগীত বাজাত। সবচেয়ে মজা লাগত আমার ভূতের ছবি এলে। মনে আছে একবার এল old Dark House নামে একটা ভূতের ছবি। ভীষণ ভয়ের ছবি ছিল সেটা। আবহ সংগীতের ভূতের ছবির জন্য যদিও ছোড়দার কিছু কিছু রচনা থাকত কিন্তু বেশিরভাগই হত 'ফ্রি ফর অল'। যা ইচ্ছে বাজানো। বেহালাগুলো ট্রিমোলো ধরত আর পিয়ানোয় খাদের পর্দাগুলো একসঙ্গে বা এলোমেলো ছবির সঙ্গে মানিয়ে বাজানো হত। আমি যতবেশি ভয় পেতুম সেই ভয়টা ধরবার চেষ্টা করতুম পিয়ানোয়। স্টান্ট ছবি হলে পিয়ানো বেশিরভাগ সময় বাজানো হত পেনসিল দিয়ে। হ্যাঁ বিশ্বাস করুন। পেনসিল দিয়ে। মনে করুন একলাফে হিরো তিনতলায় উঠে গেল—অমনি পেনসিল দিয়ে রিডের ওপর খাদ থেকে নিয়ে তারা পর্যন্ত একটানে বাজাতে হবে। যখন লাফিয়ে নীচে নামবে তখন চড়া থেকে নিয়ে খাদ পর্যন্ত উলটোদিকে বাজাতে হবে। প্রথম যখন বম্বে যাই মোহন স্টুডিওয় একটা পিয়ানো দেখেছিলুম তার Key boardটা আড়াআড়ি ভাবে বেশ গভীর ভাবে কাটা। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলুম—ওটা স্টান্ট ছবির মিউজিক করার পিয়ানো, পেনসিল দিয়ে বাজানো হয়। তখন ছোড়দার কথা মনে হয়েছিল। প্রথম প্রথম ছোড়দা আমাকে এই পেনসিল মিউজিক বাজাবার ভার দিতেন। কেবল একবারই আমাকে ছবি শুরু হবার আগের অর্কেস্ট্রায় ছোড়দা পিয়ানোয় বসিয়ে দিয়েছিলেন। সে দৃশ্য মনে মনে কল্পনা করলে আজও হাসি পায়। আমার বয়স তখন ছবছর হলেও আমার ছোটখাটো চেহারায় লাগত তিন-চার বছরের। পিয়ানোয় স্টুলে বসলে পা দুটো অসহায় ভাবে শূন্যে ঝুলত। সেই আমি যখন অর্কেস্ট্রায় পিয়ানো বাজাতে লাগলুম—সারা হল আমাকে নিয়েই হই-হট্টগোলে ভরে গেল। চেয়ার ছেড়ে সব স্টেজের সামনে এসে জড়ো হতে লাগল। আরো কি সব গণ্ডগোল হল কী মনে নেই। বাস, সেই শেষ। আমার ভবিষ্যত জীবনে সিনেমার সংগীত পরিচালক হবার হাতেখড়ি যে সেদিন ছায়া সিনেমায় হচ্ছিল সেদিন তা জানার কোনো উপায় ছিল না।

আমাদের বাড়ির একটা বাড়ির পরেই মহেন্দ্র শ্রীমানীর বাড়ি। সেখানে প্রতি বছর দুর্গাপূজার বিসর্জনের সময় Highlander Scottish Band রীতিমতো গোরাসাহেবদের রংচঙে পোশাক পরা ব্যাগপাইপ ব্যান্ড বাজিয়ে ঠাকুর নিয়ে যাওয়া হত। সেই ব্যান্ডের গোরা লিডারকে একবার ছোড়দা নিমন্ত্রণ করে ক্লাবে নিয়ে এলেন। যতদূর মনে পড়ে ছোড়দা কিছু ইংরাজি গৎ-এর স্বরলিপি তাঁর কাছ থেকে নিয়েছিলেন। যথারীতি তাঁকে পিয়ানো শোনাবার জন্য আমার ডাক পড়ল। তিনি শুনেটুনে আমাকে একমুঠো টফি দিয়েছিলেন এবং ভদ্রতার খাতিরে নিশ্চয় ভালোও বলেছিলেন। কিন্তু আমার অজান্তে এদিকে বাড়ির ভিতর অশান্তির কালো মেঘ জমা হচ্ছিল। একদিন বড়দার সঙ্গে ছোড়দার তুমুল কথাকাটাকাটি হল আমাকে উচ্ছন্নে দেয়া হচ্ছে বলে। এরই মধ্যে তুচ্ছ একটি কারণে বুড়ীর নালিশে বড়দার কাছে প্রচণ্ড মার খেলুম। খেতে বসেছিলুম। দাঁড়িয়ে জুতোসুদ্ধ লাথি মারলেন মুখে। দুদিন বাড়ি ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ালুম কলের জল খেয়ে। উলটোডাঙা খালের ধারে একটা গাছের তলায় ঘুমিয়ে

ছিলুম। জেগে দেখি আমি পুলিশ চৌকিতে। ছোড়দা আর তাঁর বন্ধুরা আমাকে নিতে এসেছেন। ছোড়দার মুখ থমথমে গম্ভীর। বললেন—চল বাড়ি চল।

এর পরে বোধহয় মাসখানেকের মধ্যেই আমাদের কলকাতা-বাস উঠল। পরে শুনেছিলাম বাবার কাছে চিঠি যাচ্ছিল। একদিন দেখি একটা হুড খোলা ফোর্ড গাড়ি বাড়ির সামনে এসে থামল। আমার মেজমামা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন। ভবানীপুরে অ্যাসটন রোডে আমার মেজদাদুর বাড়ি কয়েকদিন থেকে আমরা গেলাম গাঁয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোনারপুর থানার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে আমাদের মামার বাড়িতে। জীবন নাট্যের নতুন অঙ্ক শুরু হল।

এই যে কোদালিয়া গ্রামে আমার মামার বাড়িতে ঢুকলাম একটানা আট বছর শুধু বছরে একবার করে আসামে যাওয়া ছাড়া আর কোথাও যাইনি বললেই হয়। আসামের চা বাগানের বিস্তীর্ণ খোলা আকাশ ঝরনা পাহাড় জঙ্গলের অন্তঃস্থলের যে বাস তার সঙ্গে মেটেরাস্তা পুকুর বাঁশবন আম-কাঁঠাল-নারকেল- সুপুরি-জাম-জামরুলের বাগান ঘেরা ভাঁটফুল বনতুলসী আসশ্যাওড়া আর দুর্বার সবুজে শ্যামল যে গাঁ তার দৃশ্য শব্দ গন্ধ সব কিছুই আলাদা। আর কলকাতার তো কথাই নেই। আমাদের এই গাঁ ছাড়িয়ে তিন-চারটে গাঁয়ের পরই বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র গাঁ 'বোড়াল'। প্রায় কুড়ি বিঘে ভদ্রাসনের ওপর আমার দাদুদের বিশাল দোতলা বাড়িতে এক আমার দিদিমা, তিন মামা, আর ছোট মাসি ছাড়া কেউ থাকতেন না।

মা-র বাবা তখন মারা গেছেন, কাকা জ্যাঠারা সবাই কলকাতায় বাড়ি করে উঠে গেছেন। সামনের বাগান খিড়কির বাগানে অজস্র আম-কাঁঠাল- জাম-জামরুল-লিচু-নারকেল-সুপুরির গাছ আর সামনের-পুকুর খিড়কির-পুকুর হাঁসপুকুর এই তিনটি পুকুরের অজস্র মাছ আর সাঁতার কাটার সুশীতল জল কয়েক মাসের মধ্যেই আমার অত্যন্ত আপনজন হয়ে উঠল। আমার শৈশব কৈশোর থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত এই মাটির স্নেহে এইখানেই গড়ে উঠেছে। বাগানের প্রত্যেকটা গাছকে আমি আলাদা করে চিনতাম। তাদের বুকে চড়েছি, তাদের ফল খেয়েছি, কত দৌরাত্ম্যের স্মৃতি ওইসব গাছ। সেদিন গিয়ে দেখি সামনের মাঠের সেই বিশাল নিমগাছটা নেই। পুকুরপাড়ে মালদহ আমের গাছটা নেই। খিড়কির দিকের লিচু গাছটা, হাঁসপুকুরের পাড়ে দু-দুটো বাতাবি লেবুর গাছ, সব পড়ে গেছে, মরে গেছে। যেন আত্মীয় বিয়োগের ব্যথায় মনটা মুচড়ে উঠল। প্রথম প্রথম গাঁয়ে এসে সবচেয়ে যার অভাব বোধ করতাম তা গান-বাজনার। আমার মামার বাড়ির সঙ্গে ওই জিনিশটির ছিল ভাসুর-ভাদ্দর বউ সম্পর্ক। আমার দাদুরা কলকাতায় চলে গেলেও প্রায় প্রতি সপ্তায় একবার করে আসতেন এবং তাঁদের শাসনেই সংসার চলত। এ বাড়িতে গান গাওয়া তো দূরের কথা, শিস দেওয়া কিংবা গুনগুন করা ছিল বখাটের অকাট্য লক্ষণ। চুল ছোটবড় কাটা চলবে না, টেরি কাটা ঘাড় চাঁচা এসব বিষবৎ পরিত্যাজ্য। আমার মামারাও বিশেষ করে বড়মামা সেজমামা এসব নীতি নিষ্ঠাভরে মেনে চলতেন। তারপর তো দেখলুম কয়েক বছর যেতে না যেতেই কেমন করে হাওয়া বদলে গেল। আমার ওই সেজমামাই অত্যন্ত বেসুরা গলায় মাঝেমধ্যেই চেঁচিয়ে উঠতেন, 'আমায় চাকর রাখো গো' কিংবা তখনকার পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীত—'কী পাইনি!' আমার মেজমামার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল!

একই পর্দায় কিছু মাত্র উচ্চনীচ গ্রামে না গিয়ে সম্পূর্ণ একটা গান গাইতে পারতেন। আমি ও আমার চেয়ে বয়সে ছোট আমার ছোটমামা বুড়ো অনেক চেষ্টা করেও ওই এক পর্দায় কিছুতে গাইতে পারতাম না। তাই নিয়ে প্রচুর হাসাহাসি হত। আমার সংগীতজ্ঞানের একটি গল্প মনে পড়ে গেল। আমি তখন কলেজে পড়ি, মেসে থাকি। রোজ ভোরে তানপুরা নিয়ে এক ছাত্রীর বাড়িতে রেওয়াজ করতে যেতাম। একদিন রাস্তায় আমার আর এক মামা ভেলোমামার সঙ্গে দেখা। ভেলোমামা আমাকে দেখে বললেন: "কি ভাগনে, এই সাত-সকালে জলতরঙ্গ নিয়ে কোথায় চললে?"—যত বলি এটা তানপুরা, জলতরঙ্গ নয়, মামা তত বলেন, "আরে ওই হল! দুটোই বাজে তো? মানে যন্তর তো?" যেন আমারই ভুল এমনি ভাব করে হাসতে হাসতে ভেলোমামা চলে গেলেন।

প্রথম প্রথম এই আসুরিক পরিবেশে আমার দমবন্ধ হয়ে আসত। ভয় হত যা যা শিখেছি ছোড়দার কাছে সব ভুলে যাব। সারা গাঁয়ে কারও বাড়িতে একটা হারমোনিয়ম পর্যন্ত নেই তখন। কলকাতা থেকে আসার সময় সঙ্গে করে একটা বাঁশের বাঁশি এনেছিলুম। রোজ বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে রেললাইনের ধারে একটা পুলের ওপর বসে আমার সংগীতচর্চা চলত। আমার সংগীত জগৎ আর তার মাঝখানে এই অসুরের নদীর ওপর সেদিন ওই বাঁশের বাঁশিই ছিল আমার বাঁশের সেতু। আর একটা তুলনা মামার বাড়িতে এসেই প্রকট হয়ে উঠল! সে হল ওই সুকিয়া স্ট্রিটের বুড়ী আর আমার দিদিমা। এমন দুটি বিপরীত মেরুর দুটি মানুষ আমি আর দেখিনি। দিদিমা আমার ছিলেন ছোটখাটো সৌম্য দর্শনা মানুষ। আমাদের দু-ভাইয়ের জন্য সবচেয়ে ভালো খাবার, মাছ হলে সবচেয়ে বড় মুড়ো বরাদ্দ থাকত। একদিক থেকে আমার দিদিমা ছিলেন আমার মায়ের চেয়েও বেশি। আমার ডানপিটে ছোটবেলার যে দৌরাত্ম্য দিদিমা সহ্য করেছেন মাকে তার সিকিভাগও সহ্য করতে হয়নি। অনেক পরে যখন বেআইনি কম্যুনিস্ট পার্টির মিটিং ওই বাড়িতে সারা রাতব্যাপী চলত—দিদিমা ঠায় দোতলায় জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তায় নজর রাখতেন পুলিশ আসছে কিনা। দিদিমার অবশ্য অভ্যাস ছিল। আমার এই মামার বাড়ি ছিল এককালে টেররিস্টদের আড্ডাস্থল। আমার ছোটদাদু (মা-র ছোটকাকা) যিনি ছিলেন পরে সুভাষচন্দ্র বোসের সেক্রেটারি, শ্রীকালীচরণ ঘোষ ওই বাড়ি থেকেই বহু বছর জেল খেটেছেন। ওই বাড়িরই ছাদ থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে হাঁস-পুকুরে রিভলবার পিস্তল ফেলা হয়েছিল পুলিশ রেডের সময়। আমার মামার বাড়ির ওই অঞ্চল ছিল সংস্কৃতিগতভাবে এবং রাজনৈতিক চেতনায় অত্যন্ত অগ্রসর অঞ্চল। ওই একই গ্রাম কোদালিয়া (এখন সুভাষগ্রাম) দুজন ভারতীয় রাজনীতির মহারথী সুভাষচন্দ্র বোস এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পৈতৃকভূমি। প্রখ্যাত বিপ্লবী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী, জগদানন্দ সব আশপাশের গাঁয়ের মানুষ। ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে বহু খণ্ডযুদ্ধ এসব অঞ্চলে হয়ে গেছে। তাছাড়া দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন পাশের গাঁ চাংড়িপোতার বাসিন্দা। এটিই ছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর মামার বাড়ি। বহুদিন তিনি ওখানে কাটিয়েছেন। তারাকুমার কবিরত্ন অন্যপাশের গাঁ হরিনাভির লোক ছিলেন। এখানে একটি ব্রাহ্মসমাজও গড়ে উঠেছিল, আজও সেই বাড়িটি আছে। আরো বহু দিকপালের জন্ম হয়েছে এই অঞ্চলে। এইসব সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক চেতনার উত্তরাধিকার আজও এইসব অঞ্চলের মানুষ বহন করে চলেছেন। স্বভাবতই আমার দেশপ্রেমিক এবং সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশের জন্য এর চেয়ে উর্বর কোনো ভূমি হতে পারত না। সচেতনভাবে নিশ্চয় তা গড়ে ওঠেনি কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষদের মতো তা অগোচরে

রক্তে রক্তে জারিত হয়ে গেছে।

আমি আর দাদা হরিনাভি এ এস (anglo-Sanskrit) স্কুলে ভরতি হলাম। এ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। এই স্কুল থেকেই আমি ১৯৩৯ সনে ম্যাট্রিক পাশ করি। আমরা ভরতি হবার কিছু বছর আগে পর্যন্ত প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্কুলে পড়াতেন। দুর্ভাগ্যবশত আমরা তাঁকে পাইনি। মাস্টার মশাইদের মধ্যে আমি সবচেয়ে শ্রদ্ধা করতাম হেডমাস্টার কিশোরীলাল ভাদুড়ী মশাইকে। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই স্বল্পভাষী মানুষটি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত। ক্লাস নাইন এবং টেন-এ উনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। আর আমি ভালোবাসতাম আমাদের বাংলার মাস্টার কার্তিকবাবুকে। বাংলা সাহিত্য এত সরস সুন্দর করে তিনি পড়াতেন যে মনে হত ক্লাস খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। সমীহ করতাম সংস্কৃতের পণ্ডিত মশাইকে। টাক মাথা হাতে চাবুক মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত সুরসিক। আমার মনে আছে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত আমি খুব ভালো রেজাল্ট করতে পারতাম না। কিন্তু এইট, নাইট, টেন-এ আমি ফার্স্ট কিংবা সেকেন্ড ছাড়া হতাম না। আমার বন্ধু মোহিনী চক্রবর্তীর এবং আমার মধ্যে ও দুটি আসন বাঁধা থাকত। আর আগে যে ছেলেটি নিচুর ক্লাসে ফার্স্ট হত সে তলিয়ে অনেক নীচে নেমে গিয়েছিল। পণ্ডিত মশাই বলতেন, "দু রকম ছানা হয়। এক হল 'কুকুরে ছাঁ', আর এক হল 'ময়ূরে ছাঁ'। কুকুরে ছাঁ জন্মায় গা ভরতি লোম নিয়ে, যত বড় হয় তত তা ঝরে গিয়ে শেষে নেড়ীকুত্তা হয়। আর ময়ূরে ছাঁ জন্মায় কুৎসিত দেখতে গায়ে একটাও পালক থাকে না। তারপর যত বড় হয় দেখতে দেখতে সুন্দর পালকে তার গা ভরে যেতে থাকে।" বলে বলতেন "কুকুরে ছাঁ কে বুঝে নাও। তবে আমাদের সলিল হচ্ছে ময়ূরে ছাঁ।" ক্লাসের পরেও তিনি আমাকে আলাদা করে পড়াতেন। ম্যাট্রিকে আমি সংস্কৃতে দুটো লেটার পেয়েছিলাম তাঁরই প্রসাদে।

শৈশব থেকে কৈশোর এবং কৈশোর থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত যে পরিক্রমা একটি গ্রাম এবং তার পরিপার্শ্বকে কেন্দ্র করে আমার জীবনে সম্পন্ন হয়েছে তাকে কোনোদিন বিশ্লেষণ করে তার কি কি প্রভাব একটা মনকে বা মূল্যবোধকে গড়ে তুলেছে তা নিরূপণ করার চেষ্টা করিনি। তা এক দুরূহ কাজ। সে যোগ্যতা আমার নেই। তবে যে পরিবেশ আমার মনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে আজ পিছনে তাকিয়ে বুঝতে পারি তার মধ্যে যা যা প্রধান তা হচ্ছে এক পারিবারিক স্নেহমমতা, পারিবারিক চরিত্র এবং মূল্যবোধ, দুই আঞ্চলিক পরিবেশ ও সেখানকার মানুষ, তিন প্রতিভা অনুযায়ী ব্যক্তিগত বিকাশের স্বাধীনতা এবং চতুর্থত উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ। কলকাতায় কিছুটা তিক্ত অভিজ্ঞতা ছাড়া ছোটবেলায় মামার বাড়িতে স্নেহমমতার প্রাচুর্য আমরা পেয়েছি। আমার মামারা অবস্থাপন্ন না হলেও রক্ষণশীল অর্থে সৎ সত্যবাদী এবং দৃঢ় চরিত্রের মানুষ ছিলেন। ছোটবেলা থেকে দেখেছি কি অসাধারণ পরিশ্রম করতেন তাঁরা সংসার নির্বাহ করতে। বেশি লেখাপড়া না শিখলেও তাঁদের ছিল রুচিশীল মন এবং ভাইদের মধ্যে সৌহার্দ। যে বাড়িতে জন্মে এবং বড় হয়ে আমার মায়ের মনের মতো সোনালি মন গড়ে ওঠা সম্ভব সে বাড়িতে সেদিন আমার মায়ের ছোটবেলা যৌথপরিবার না থাকলেও তার রেশ তখনো ছিল। আমার মা ছিলেন জাঠতুতো-খুড়তুতো প্রায় তিরিশ জন বোনেদের মধ্যে সবেচেয় বড়, সকলের আদরের 'দিদে'। আমার ছোটবেলায় যখন কোনো উপলক্ষে তাঁদের একসঙ্গে দেখেছি কখনো মনে হয়নি এঁরা এক মায়ের পেটের বোন নন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ভাইবোনের খবর মা নিতেন অত্যন্ত আগ্রহে। ছোটবেলায় যে

কোনো উৎসব বা পুজো উপলক্ষে আমার এইসব মাসিদের বিরাট বাহিনী আসতেন কোদালের বাড়িতে। আমার চেয়ে ছোট আমার সমবয়সী থেকে বিভিন্ন বয়সী মাসিদের আর মাসতুতো বোনেদের প্রমীলার রাজ্যে আমার হত নাজেহাল অবস্থা। দাদার কাছে বোধহয় আমি গান গাইতে পারি বাঁশি বাজাতে পারি শুনে এঁরাই প্রথম দাদুদের নিষেধের শক্ত তালা ভেঙে দিলেন। এই প্রমীলার রাজ্যে মামাদের এমনকী দাদুদেরও প্রবেশ নিষেধ ছিল। গান আর বাঁশি চলত অনেক রাত পর্যন্ত। ক্রমে ক্রমে এমনি ভাবেই আমার গান করার এবং বাঁশি বাজানোর লাইসেন্স এ বাড়িতে গ্রাহ্য হল। সুর অসুরকে পরাজিত করল। পড়াশোনার পর ছাদে উঠে আমি বাঁশি বাজাতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। নিজে নিজে সুর বানাতাম গান ভেঙে ভেঙে। তখনকার রাত্রের নিশুতি গ্রামে আশপাশের তিন-চারটে গাঁয়ে সেই বাঁশি শোনা যেত। পাড়ার মায়েরা বউদিরা আমাকে আদর করে বলতেন 'কেষ্টঠাকুর'। একরাত্রে বাঁশি না বাজালে পরদিন পথে বা ঘাটে দেখা হলে বউদিরা বলতেন, 'কই গো কেষ্টঠাকুর, কাল রাতে তো তোমার বাঁশি শুনলুম না।' আমি বলতুম হেসে, 'বাজিয়ে কি হবে? গোপিনীরা তো সব ঘরে বসে থাকে।' ওঁরা বলতেন, 'আসবে গো আসবে। এখন তো তুমি বালকৃষ্ণ—বড় হও তখন দেখবে গোপিনীরা ছেঁকে ধরবে।'

আমার মামার বাড়িতে আর একটি জিনিশ ছিল—স্বাস্থ্যচর্চার হিড়িক। আমাদের বাড়িতেই ছিল মেটে কুস্তির আখড়া। রীতিমতো খোল সরষের তেল ঢেলে মাটি তৈরি করত মামাদের বেহারি দারোয়ান, বোধহয় নাম ছিল খাড়ুয়া বা ওই জাতীয় কিছু। বিশাল লম্বা চওড়া অসম্ভব শক্তিশালী আর শিশুর মতো মন ছিল তার। আমি আর আমার ছোটমামা বুড়ো কত যে তার ঘাড়ে চড়েছি! অবলীলাক্রমে দুজনকে দুকাঁধে নিয়ে সে দৌড়ত তীর বেগে। আমি ভয়ে একবার তার টিকি টেনে ধরতেই সে রেগে থেমে গেল। তারপর থেকে বুঝতে পারতুম ওই টিকিটাই হচ্ছে ওর ব্রেক—দরকার হলেই স্পিডের মাথায় টেনে থামিয়ে দিতুম আর প্রতিজ্ঞা করতুম আর কখনো টানব না। সেই কুস্তির আখড়ায় প্রচণ্ড শীতে ভোর পাঁচটায় উঠে খুব কষে সরষের তেল মেখে আমাদের কুস্তি লড়া শুরু হত খাড়ুয়ার গাইডেন্সে। পাড়ার অনেক ছেলেরা আসত। আমার ন-মামা শচীনও লড়তেন। তাছাড়া লড়তে আসতেন আমার গৃহশিক্ষক কাঁদনদা (ভালো নাম সন্তোষ ঘোষ)। তাঁর কথা পরে বলব। খাড়ুয়ার কাছে আমি অনেক রকম কুস্তির প্যাঁচ আয়ত্ত করেছিলাম। আমার সবচেয়ে ফেভারিট ছিল ধুবড়ি প্যাঁচ। প্রতিপক্ষের হাত দুটো শক্ত করে ধরে হঠাৎ পিঠের ওপর শুয়ে পড়তে পড়তে একটা পা তার পেটের ওপর চাপ দিয়ে পিছন দিকে উলটে ছুঁড়ে ফেলা। আমার চেয়ে লম্বা এবং বয়সে বড় অনেক ছেলেকে আমি এই ধুবড়ি প্যাঁচে ঘায়েল করেছি। ঘণ্টা খানেক কুস্তি লড়ার পর ওই শীতে দরদর করে ঘাম দিত। তখন ভিজে ছোলা আর আদাগুড় খেতে খেতে বিশ্রাম করে ঘাম শুকোলেই পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়া। তারপর মামাদের প্রায় দেড় বিঘাব্যাপী সামনের পুকুর সাঁতরে এপার-ওপার করা। সাঁতার ছিল আমার নেশা। ছুটির দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জল থেকে উঠতুম না। দিদিমা বকাবকি করতেন। 'ওরে জ্বর হবে ম্যালেরিয়া ধরবে—উঠে আয়।' আর সত্যিই একবার ধরল ম্যালেরিয়া। সে কী কাঁপুনি দিয়ে জ্বর—১০৫° পর্যন্ত। প্রায় একমাস ভুগে গোটা দশেক কুইনিন ইনজেকশন পাছায় নিয়ে কুস্তি করা শরীর ভেঙে একপেট পিলেসুদ্ধ হাড়জিরজিরে চেহারা যখন আয়নায় দেখলুম আমার কান্না পেয়ে গেল।

মনে আছে একবার ওই জ্বরের জন্য আমি স্কুলে প্রাইজ নিতে যেতে পারিনি। এক ভূগোল ছাড়া সব বিষয়ে সেবার আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম। তাছাড়া আবৃত্তিতেও। আমার ছোটদাদু একটা ঝুড়ি ভরতি করে আমার সব প্রাইজের বই আর মেডেল এনে দিয়েছিলেন—"এই নাও দাদু, দেখো; কত প্রাইজ পেয়েছ তুমি।" আমি তখন জ্বরে প্রায় বেহুঁশ। জ্বর ছাড়লে দিদিমাকে বললুম—"স্বপ্নে দেখেছি অনেক প্রাইজ পেয়েছি।"— "স্বপ্ন কেন হবে সত্যিই তো পেয়েছিস" বলে দিদিমা সেই ঝুড়িসুদ্ধ বই এনে দিলেন বিছানায়। মুখে তাঁর গর্বের হাসি। বললেন: 'মা-র কাছে যখন যাবি নিয়ে যাস্, দেখিয়ে আনিস।' আমার দিদিমা যেমনি অসাধারণ রান্না করতে পারতেন, তেমনি বানাতেন নানা জাতীয় আচার। আমার লঙ্কার তেঁতুলের করমচার লেবুর কুলের কত রকমের যে আচার—বিচিত্র তার স্বাদ আর গন্ধ। এখনো ভাবলে জিভে জল আসে। খুব যত্ন করে সেই সব জার দিদিমা রোদে দিতেন। খেতে চাইলে অল্প অল্প দিতেন—তাতে মন উঠত না। দিদিমা চোখের আড়াল হলেই আমি আর বুড়ো চক্ষের নিমেষে একতাল আচার তুলে নিয়ে একছুট দিতাম। জার না খোলা পর্যন্ত দিদিমা টের পেতেন না। এক একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করতেন জার ভরতি আচার অর্ধেক হয়ে গেছে।— এই কাল দেখলুম জার ভরতি, আজ কুলের আচার অর্ধেক হল কি করে রে—বলে আমাদের দিকে দিদিমা তাকালেন। আমি বললুম—'এই বুড়ো, দিদিমা তোকে কি জিজ্ঞেস করছে?'— না না বুড়োকে নয়, বুড়ো হাবড়া দুজনকেই জিজ্ঞেস করছি—এ নিশ্চয় তোদের কাজ, বাসি এড়া কাপড়ে ছুঁয়ে সমস্ত আচারটাই আমার নষ্ট করে দিলে।' বুড়ো তাড়াতাড়ি বলল—'হ্যাঁ, ওটা বরং ফেলেই দাও।'

—'ফেলেই তো দোব তবে তোমাদের হাতে নয়। ওই অতখানি কুলের আচার খেয়ে শেষে হেগে মরবে'—দিদিমা বললেন— 'আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেব।'— 'আমরা না হয় একটু একটু করেই খাব—কি বলিস বুড়ো?'— আমি আস্তে আস্তে বললাম। হাসি চাপতে না পেরে দিদিমা—'কি সব হাড়হাভাতে ছেলেপুলেরে বাবা' বলে ঠক করে আচারের শিশিটা নামিয়ে দিয়ে গেলেন। হুমড়ি খেয়ে পড়ে চক্ষের নিমেষে সেই উপাদেয় আচার আমরা শেষ করলাম। এমনি কতবার যে ঘটেছে!

একবার আমের সময় ওপরের মাঝের ঘরের তক্তাপোশের তলায় দিদিমা প্রায় শত খানেক সুন্দর সার আম রেখেছিলেন পাকলে সবাইকে বিলোবেন বলে। দুদিনেই যে গাছপাকা আম পেকে উঠেছে দিদিমার খেয়াল নেই। আমি দুপুরে খাটে শুয়ে শুয়ে একবার করে ঝুঁকে একটা করে আম বের করে তাতে ছোট্ট একটা ছাঁদা করে সযত্নে টিপে টিপে তার সব রসটুকু চুষে আবার ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে তলায় রেখে দিই। এমনি করে প্রায় গোটা দশেক আম খেয়ে ফুলিয়ে রেখে দিয়েছি, বুড়োও গোটা দশেক খেয়ে রেখে দিয়েছে।

পরের দিন আম নিতে এসে দিদিমা একটা করে আম নিতে যান আর ফস্ করে হাওয়া বেরিয়ে যায়। আমি আর বুড়ো তখন ঘরে। দিদিমার অবাক মুখটা দেখবার মতো—'কি করে এরকম হল বল তো।' আবার একটা আম তোলেন—আবার ফস্।— 'দেখি দেখি!'— আমি একটা আম তুলে বললাম— 'ও এই তো ছাঁদা! সব আমে ছাঁদা! এ নিশ্চয় ইঁদুরের কাজ। এত সূক্ষ্ম ছাঁদা করে আর কে খাবে?'— দিদিমা প্রায় কনভিনসড্। এমন সময় বুড়ো এতক্ষণ চেষ্টা করে হাসি চেপে চেপে শেষ পর্যন্ত হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়ল। বাস্—দিদিমা বুঝে গেলেন। "ইঁদুরের কাজ! হতচ্ছাড়া! এখন এই

এত আম সব তো এঁটো হয়ে গেল রে হতভাগা। পুজোয় দোব তার তো আর জো রইল না।"

বুড়ো আবার বলল—'ফেলে দাও!'

'—ফেলে দেব! ঝেঁটিয়ে তোদের আমি বিষ ঝেড়ে দোব হতচ্ছাড়া ছেলেপুলে—' দিদিমা তেড়ে আসতেই আমরা ছুট।

ছোটবেলায় ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভরতি হওয়া পর্যন্ত বুড়ো ছিল আমার ছায়ার মতো সঙ্গী। আমার জন্য ও বোধহয় জীবনও দিতে পারত। আমার প্রতি ওর ভালোবাসা ছিল অন্ধ নিঃস্বার্থ। আমি যা করতুম তাই ছিল ওর করার সাধ।

ছেলেবেলা থেকেই আমি চ্যালেঞ্জ করে যে-কোনো বিষয়ে অন্তত চার লাইন পদ্য লিখতে পারতাম। বুড়োরও দেখেশুনে ইচ্ছে হল ও পদ্য লিখবে। আমাকে বলল—'আচ্ছা বল কি নিয়ে লিখব।' আমাদের চাতালের পাশে একটা এঁড়া পেঁপের গাছ ছিল। এঁড়া পেঁপে সরু সরু সুতোর মতো ডালে ঝুলে থাকে। তখন একটা গেঁড়ি বা শামুক গাছ বেয়ে উঠছিল। বুড়োকে বললুম—'বেশ! এই পেঁপে গাছটা নিয়ে লেখ।' বুড়ো লিখতে বসল কাগজ পেনসিল নিয়ে। অনেকক্ষণ পরে যা মাল বেরোল তা এখনো মনে আছে। বুড়ো লিখল—'ঝুলিছে পেঁপের রাশি/ গেঁড়িতে করে আসি।'

এখন এই 'গেঁড়িতে করে আসি'র মানে কি জিজ্ঞেস করতে বলল—'কেন?— গেঁড়ি যাওয়া-আসা করছে।' সবাই হেসে উঠতে আমাকে বলল— 'আচ্ছা তুই লেখ! প্রথম লাইনটা কিন্তু বদলালে চলবে না।' আমি লিখলাম

'ঝুলিছে পেঁপের রাশি
শামুকও অভিলাষী
চরণহীন পায়ে
চলিছে হাসি হাসি।'

সেই বোধহয় বুড়োর প্রথম ও শেষ কবিতা লেখা। এমনি কত কিছু বিষয় নিয়ে অন দ্য স্পট পদ্য যে লিখতাম তার ইয়ত্তা নেই। আমার অনেক মাসি আর মাসতুতো বোনেদের খাতার পাতা ছিল আমার এই সব পদ্যের আঁতুড়ঘর। আমার সেজমামার একটা বদ অভ্যাস ছিল। সোমবার রোববার উনি বেরোতেন না—মাছ ধরার ভীষণ শখ ছিল। সকাল থেকে সেই শখ সেরে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে ডাক দিতেন—বাবু! বুড়ো! বাস আমাদের হৃদকম্প হত। এখুনি মাথা টিপতে এবং পায়ের হাজা চুলকোতে হবে। সেজমামা ভীষণ ভালোমানুষ হলেও ছিলেন ভীষণ কড়ামেজাজি, ভয় পেতুম দুজনেই। চোরের মতো গিয়ে উপস্থিত হতুম। মাথার দিকের ভার পড়ত আমার ওপর—পায়ের ভার বুড়োর। সেজমামার সেই ফরমায়েস—'উঃ! মাথাটা বড্ড ধরেছে, একটু রগটা টেপত বাবা!' আর বুড়োকে বলতেন—'ওই কড়ে আঙুলের পাশের হাজটা জ্বালিয়ে খেল—একটু চুলকে দে তো!'—বুড়ো মুখ বিকৃত করে সেই হাজা চুলকোতে বসত। আমি মাথার পিছন দিকে থাকায় আমার অ্যাডভানটেজ ছিল—সেজমামা আমাকে দেখতে পেতেন না। কাজেই মাথা টিপতে টিপতে আমি নানারকম মুখভঙ্গি করতাম। কখনো মাথায় গাঁট্টা মারার ভঙ্গি করতাম। বুড়োর পেত প্রচণ্ড হাসি! হাত জোড় করে আমাকে অনুরোধ করত অমন যেন না করি। আমাদের মন উড়ু উড়ু করত দুপুরে বাগানে গাছে চড়ে ফল পাড়ায় কিংবা পুকুরে সাঁতরাবার জন্য। কিন্তু সেজমামা না ঘুমোনো পর্যন্ত ছাড় নেই। কতদিন হয়েছে উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন ভেবে আমরা পা টিপে

টিপে বেরিয়ে যাচ্ছি অমনি সেজমামার গলা—'কইরে থামলি কেন?' 'এক্ষুনি আসছি, ভীষণ হাগা পেয়েছে!' বলে আমি কেটে পড়তাম। বুড়ো পড়ত ফাঁপরে। আবার হাজা চুলকোতে বসত।

আমার মামাদের মধ্যে সবচেয়ে পরার্থপর উদার আর বিশাল হৃদয় ছিল এই সেজমামার। আমার মায়ের ভায়েদের মধ্যে বাবার সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন এই সেজমামা। বাবা তাঁকে ডাকতেন 'কুচোভাই' বলে (তাঁর ডাক নাম ছিল কুচো—ভালো নাম রবীন্দ্রনাথ ঘোষ)। সেজমামার ছিল ভীষণ মাছ ধরার শখ কিন্তু নিজের খাবার জন্য নয়। সবচেয়ে বড় মাছ নিজের ছেলেমেয়েদের না দিয়ে অমুক কাকা বা অমুক জ্যাঠা কিংবা অমুক দিদির বাড়িতে দিতে ছুটতেন। ফুলগাছের ভীষণ শখ ছিল। সব চেয়ে সুগন্ধ ফুল তোড়া বেঁধে দিতে ছুটতেন অমুক বউমা বা তমুক বোনকে। গাড়ি চালাবার ভীষণ শখ ছিল। আত্মীয়বন্ধুদের ফাই-ফরমাশ খাটার জন্য বিনা পয়সার ড্রাইভারি করে বেড়াতেন। একবার একটা লরির পারমিট বের করলেন—ট্রান্সপোর্ট বিজনেস করবেন বলে। পার্টনারশিপে লরি কিনলেন—তারপর প্রচণ্ড অ্যাকসিডেন্টে পায়ে মাল্‌টিপ্‌ল ফ্যাকচার নিয়ে ছমাস শুয়ে থেকে উঠে শুনলেন পার্টনার লরি বেচে দিয়ে হাওয়া। লাভের মধ্যে অসুস্থ অবস্থায় যে নার্স তাঁর পরিচর্যা করেছিলেন তাঁকে দিদি ডেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বছরের পর বছর উত্তরপাড়ায় তাঁর বাড়িতে কখনো মাছ কখনো ফুল কখনো বাগানের আম লিচু পৌঁছে দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেছেন। এমনি মানুষ! এমন মানুষকে সবাই ঠকিয়ে খায়। জীবনে এঁরা কখনো সুখী হন না। স্ত্রী ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে শেষ জীবনে তাঁকে দিনযাপন করতে দেখেছি কিন্তু স্বভাব বদলায়নি। সামান্য ড্রাইভারি করেছেন কিন্তু হাত পাতেননি কারো কাছে। আমার মায়ের সবচেয়ে প্রিয় ভাই ছিলেন এই কুচো। মা-র কাছেও যখন আসতেন কখনো খালি হাতে নয়। হয় বাগানের কিছু ফল বা মাছ আর কলাপাতায় মুড়ে সবিতার জন্য চাঁপাফুল। দুপুরবেলা হয়তো এসেছেন—মা পীড়াপীড়ি করছেন খেয়ে যেতে। বেশিরভাগ সময় খেতেন না।

এক এক সময় বলে ফেলতেন—'না গো দিদে বাড়িতে বাচ্চাগুলো না খেয়ে আছে। এখন বাড়ি গেলে তবে কিছু একটা হবে।' মা জোর করে কিছু টাকা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। আজ সেজমামা বেঁচে নেই। আত্মীয়পরিজন প্রতিবেশী সবার জন্য নিঃস্বার্থভাবে মানুষটা সারাজীবন ব্যয় করে গেলেন কিন্তু কেই-বা তার মূল্য দিল? তার জন্য তাঁর অবশ্য কোনো অভিযোগ ছিল না কারও বিরুদ্ধে। বাবা মারা যেতে সেজমামা ছোট ছেলের মতো হাউমাউ করে কেঁদেছিলেন। আমাকে বলতেন, 'কত বড়ো মানুষটা যে চলে গেল! পৃথিবীর কেউ জানল না।' তখনই ভাবতাম কখনো সুযোগ পেলে বাবার কথা লিখব। কিন্তু কতটুকুই-বা ধরতে পারলাম! সারা জীবনের প্রতিদিনের ব্যবহারের খুঁটিনাটির বহুবর্ণ মোজেইকে গড়া যে মানুষ—স্কেচ পেনসিলে তার কতটুকুই-বা ধরা যায়! তেমন লেখকের হাতে পড়লে আমার এই সেজমামাই হয়তো একটা উপন্যাসের অসাধারণ চরিত্র হতে পারতেন! সে কথা যাক।

একবার সেজমামা তাঁর কয়েকজন বন্ধুদের খাসির মাংস খাওয়াবেন বলে একটা জ্যান্ত খাসি কিনে নিয়ে এলেন। যেদিন তাকে কাটা হবে খাসিটা দড়ি ছিঁড়ে এসে সেজমামার দুটি পায়ে মাথা গুঁজে পড়ল। সেজমামা তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন 'ঠিক আছে।'— তারপর বললেন 'ওরে! এ বেটাকে কাটা যাবে না। টাকা দিচ্ছি মাংস

কিনে নিয়ে আয়।' সেই থেকে সেই খাসি মামার বাড়িতে বড় হতে লাগল। যেহেতু সে খাসি এবং কমপালসিভ ব্রহ্মচারী, একমাত্র খাওয়া এবং শুঁতোনো ছাড়া তার আর অন্য কোনো প্যাশন ছিল না। বিশেষ করে সেজমামার যে সব বন্ধুরা তাকে খাবে বলে ঠিক করেছিল আশ্চর্য উপায়ে তাদের সে চিনে রেখেছিল। দেখলেই শুঁতোতে যেত। ক্রমশ সেই খাসি দিব্বি চকচকে নধর দেহ নিয়ে প্রচণ্ড প্রতাপে সারা গাঁ ঘুরে বেড়াত আর পাড়ার প্রতিবেশীদের নোলা দিয়ে প্রচুর লালা নিঃসরণ হত। বেশ কিছু বছর পরে সেই খাসি যখন বৃদ্ধ হয়ে মারা গেল সেজামামা তাকে যত্ন করে সামনের বাগানে চার হাত গর্ত করে কবর দিলেন। আমরা বললাম 'চিতা জ্বালিয়ে শেষকৃত্য করলেই ভালো হত। হাজার হোক হিঁদুর বাড়িতে মানুষ, ব্রহ্মচারী খাসি ছিল তো!' সেজমামা বললেন—'তাহলে কি রক্ষে থাকত? মাটন রোস্টের গন্ধে চতুর্দিক থেকে সব ছুটে আসত। তাছাড়া খাসিটা দিয়েছিল কুরবান মিঞা! সে হিশেবে কবর দেওয়াই উচিত।'

এই খাসির সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। এই গল্পটি এক সময় মামার বাড়িতে প্রসিদ্ধ ছিল। ছোটবেলায় কাঁচা আম, আমড়া, কাঁচা তেঁতুল এসব ছিল আমার আর আমার ছোটমাসি ঘেঁটুর ভীষণ প্রিয় খাদ্য। দিদিমা দেখলেই বকাবকি করতেন আর বলতেন—'কি করে খাস বাবা ওই টকগুলো? বাঘের পোঁদে দিলে বাঘ পালায়।' প্রায়ই শুনতাম এই অসাধারণ গ্রাম্য প্রবাদটি। একদিন একটা প্রচণ্ড টক আম খেতে খেতে হঠাৎ দেখি খাসিটা আসছে আমার দিকে। দিদিমার কথা মনে পড়ল। আমি সেই আধ খাওয়া টক আমটা খাসিটার পেছনে বেশ করে ঘসে দিলাম। কিন্তু পালানো দূরের কথা হঠাৎ ঘুরে গিয়ে খাসিটা আমটা কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। আমি দিদিমাকে গিয়ে বললাম—'কই? তুমি বললে টক আম বাঘের পোঁদে দিলে বাঘ পালায়—কিন্তু খাসি তো পালাল না? উলটে খেয়ে ফেলল।' দিদিমা আর মা-র বড় জ্যাঠাইমা মানে আমার বড় দিদিমা হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতে লাগলেন। মামারা ফিরতেই বললেন—'শুনেছিস আজ বাচ্চু কি করেছে?' বাস্। আগুনের মতো সেই গল্প ছড়িয়ে গেল কলকাতাসুদ্ধ সারা মামার বাড়ি।

সেজমামার কাছেই আমি গাড়ি চালানো শিখি। তখন আমার ছিল একটা নাক চ্যাপ্টা Bellila Fiat। সেজমামাই পছন্দ করে কিনিয়ে দিয়েছিলেন। সেজমামা বলতেন—'গাড়ি চালাবার সময় মনে রাখবে সামনে থেকে আসা সব গাড়িই তোমাকে ধাক্কা মারতে আসছে আর যত লোক রাস্তা দিয়ে চলছে সবাই তোমার গাড়ির তলায় পড়ে আত্মহত্যা করতে চাইছে, বাস্ তাহলেই আর অ্যাকসিডেন্ট হবে না।' সত্যিই এই থিওরি আমার ভীষণ কাজে লেগেছে। বহু অ্যাকসিডেন্টের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। এই fiat-টা ছিল দারুণ গাড়ি। একটানা দুশো গজ বড় জোর গিয়েই হাঁপিয়ে পড়ত, থেমে যেত। ধাক্কা মেরে স্টার্ট না করলে আর তিনি চলতেন না। আমাদের কসবার বাড়িতে যে সব বন্ধুরা যেমন দ্বিজেন শ্যামল নির্মল সতীনাথ প্রমুখরা আসতেন, তাদের আমি লিফ্‌ট দেব বলে গাড়ি চড়াতাম। আর অনিবার্যভাবে তাদের গাড়ি ঠেলতে হত। শেষ অবধি এমন হল যে দূর থেকে আমার গাড়ি আসছে দেখলেই ওরা ছুটে পালাত—লিফ্‌ট নেবার ভয়ে। গাড়িটার হর্নও ছিল বিচিত্র এক ঘড়ঘড়ে আওয়াজ। একবার কসবার রাস্তায় মাঝখান দিয়ে একদল যুবক চলেছে। আমি সমানে হর্ন দিচ্ছি, কেউ নড়ছে না পর্যন্ত। আমি অত্যন্ত রেগে গাড়ি থামিয়ে নেমে গিয়ে বললুম—'কি হচ্ছে কি? শুনতে পাচ্ছেন না। কখন থেকে হর্ন দিচ্ছি?' একজন অবাক হয়ে বললেন—'ও,

আপনি হর্ন দিচ্ছিলেন? আমরা ভাবলুম পেছনে কে নাক ঝাড়ছে!' তারপর তিনি চিৎকার করে বললেন—'এই সব্বাই সরে যা! কেউ নাক ঝাড়ছে না—সলিলদা হর্ন দিচ্ছে।' ততক্ষণে আমার গাড়ি আর স্টার্ট নিচ্ছে না। তাদেরই ধাক্কা মারতে হল। একবার আমার এক বন্ধু বিয়ে করতে যাবে বলে গাড়িটা ধার চাইল। হাজার বারণ করা সত্ত্বেও শুনল না। বলল—'আমার একটা দারুণ এক্সপার্ট ড্রাইভার আছে। নো প্রবলেম।' পরে শুনলাম বিয়ের লগ্ন পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে কন্যাপক্ষ অন্য একটি ছেলেকে ধরে রাজি করিয়ে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় গাড়ি ছেড়ে মুক্তকচ্ছ হয়ে দৌড়তে দৌড়তে বরের প্রবেশ। বিয়ে তো ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল কিন্তু আমাকে শুনতে হল—'শালা, তোমার গাড়ির জন্যে আমার বউটাই বেমক্কা পরের হয়ে যাচ্ছিল!' সেজমামাকে বললুম—'যত টাকা লাগে গাড়িটা সারিয়ে দিন! আমার ইজ্জত পাঞ্চার হয়ে যাচ্ছে।' সেজমামা বললেন—'বাবা! তুমি গাড়িটা কিনেছ দু-হাজারে। কিন্তু সারাতে লাগবে তিন হাজার। তার চেয়ে তিন হাজারে ওই বিউটি জুয়েলার্স কিনতে চাইছে ওদের বেচে দাও।' তাই করা হল। রোজই ভাবি ওই বিউটি জুয়েলার্স-এর মালিক আমায় রাস্তায় একলা পেলেই ঠ্যাঙাবে। ওকে ঠকিয়েছি বলে। কিন্তু আশ্চর্য! ভদ্রলোক একদিন আমাকে ডেকে গাড়িটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আমাকে চা টোস্ট খাইয়ে দিলেন। পরে সেজমামা বললেন— 'কি ভুলই করেছি। জানিস তো গাড়িটার কোনো ডিফেক্টই ছিল না। শুধু 'কাট-আউটটা' বদলি করেই গাড়িটা এখন দারুণ চলছে।' শুনলুম সেই গাড়িই একটু রংচং করে পাঁচ হাজার টাকায় বিউটি জুয়েলার্স বেচে দিচ্ছে এবং প্রথম প্রেফারেন্স নাকি আমার। বুঝুন বেনে কাকে বলে!

'দো বিঘা জমিনের' পরে বোম্বে থেকে কলকাতায় ফিরে আবার আমি তখন বেকার। গাড়ি বেচার তিন হাজার টাকা কবে ফুটকড়াই হয়ে গেছে। কোথায় পাব পাঁচ হাজার টাকা? কিন্তু বিউটি জুয়েলার্সকে বললুম—'পুরোনো গাড়ি আর নয়—ডিসগাসটেড! কিনি তো এবার নতুন গাড়িই কিনব।' তারপরেই বিমলদার টেলিগ্রাম এল 'বিরাজ-বহু' ছবির মিউজিক করার জন্য।

সেই আমার পাকাপাকি কলকাতা ছাড়া ১৯৫৫ সালে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকিয়ে নিজেকে দিয়ে ভাববার চেষ্টা করি যে শৈশব থেকে কৈশোর পেরিয়ে প্রথম যৌবনপ্রাপ্তি যে ছেলেদের গাঁয়ে ঘটে তাদের মনের ওপর পারিপার্শ্বিকের কি কি প্রভাব পড়ে তার মানসিকতাকে গড়ে তোলে। এর তো কোনো নির্দিষ্ট উত্তর হতে পারে না কারণ সব গাঁ তার জনসমষ্টির শ্রেণীচরিত্র নিয়ে তো আর এক নয়। বিশেষ করে কোদালের মতো একটা গাঁ যাকে কোনো কারণেই অজপাড়াগাঁ বলা যায় না বরং বলা যায় মধ্য এবং নিম্নবিত্ত ছাড়া কামার কুমোর তাঁতি ছুতোর গোয়ালা কলুদের গাঁ। চাষি সেখানে অনুপস্থিত।

শুধু কোদালে কেন যাদবপুর থেকে নিয়ে এই নিম্ন দক্ষিণবঙ্গে জয়নগর মজিলপুর বা ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দেখা যাবে রেললাইনের পুবদিকে ধুধু করছে মাইলের পর মাইল জুড়ে নিচু ধানজমি আর দূরে দূরে সবুজ গাছ-গাছড়ার নীচে চাষিদের কুঁড়েঘর আর রেললাইনের পশ্চিমদিকের অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে পুরো অঞ্চল জুড়ে দালান-কোঠা অধ্যুষিত প্রধানত মধ্যবিত্তদের গ্রাম। এঁদের মধ্যে শতকরা আশিটি সংসার চলে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা বাবুদের কলকাতা লব্ধ উপার্জনে। যাঁরা একটু ভালো চাকরি করেন, আলাদা হয়ে কলকাতায় বাসা নিয়ে থাকেন। আর যাঁরা আরো ভালো টাকার মুখ

দেখেছেন তাঁরা কলকাতায় বাড়ি বানিয়ে পাকাপাকি কলকাতাবাসী হয়ে যান। যেমন আগেই বলেছি আমার মায়ের এক জ্যাঠা এবং তিন কাকাই পাকাপাকি কলকাতাবাসী। শুধু আমার দাদুর ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি বলেই তাঁর মৃত্যুর পর আমার মামারা অগত্যা গাঁ কামড়েই পড়েছিলেন যদিও ব্যবসার খাতিরে তাঁরা রোজই যেতেন কলকাতায়। বাড়ির পরিবেশ ছাড়া শুধু কোদালে গ্রামের মানুষকেই ধরা যাক্, যদিও প্রায় প্রতিটি ছেলেকেই পড়াশোনার বা খেলাধুলার খাতিরে কিংবা ক্লাব লাইব্রেরি পূজাপার্বণের খাতিরে আশপাশের অন্তত পাঁচ-ছটি গ্রামের সঙ্গেই জড়িত থাকতে হয়। ঘোষ বোস দত্ত মিত্তির ভট্টাচার্যি চক্রবর্তী ইত্যাদি পাড়ার ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই প্রধানত চাকুরিজীবী। এদের ঘর থেকেই আবার ডাক্তার উকিল অধ্যাপক মাস্টার ইঞ্জিনিয়ার এবং রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কর্মী বা নেতারা বেরিয়ে আসেন। অন্যান্য পাড়া যেমন কুমোরপাড়া, যুগীপাড়া (এঁরা গামছা মশারি বোনেন) গোয়ালাপাড়া, কৈবর্তপাড়া, বাগ্‌দিপাড়া, পোদপাড়া, কাওরাপাড়া, মেথরপাড়া এ সবই ওই একটি গাঁয়েরই মধ্যে। এছাড়া চার-পাঁচটা গাঁয়ে মিলিয়ে আছে হয়তো একটা করে নাপিতপাড়া, কামারপাড়া বা কলুপাড়া। এ সব পাড়ার যাঁরা মানুষ নামেতেই বোঝা যায় এঁরা প্রধানত পেশাদারি করনিক বা শ্রমজীবী। এঁদের মধ্যে সব চেয়ে নিচু হলেন কৈবর্ত বাগ্‌দি বা পোদ্ ও কাওরা সম্প্রদায়। মেথরদের তো কথাই নেই। একেবারে গ্রামের বাইরে পাকা রাস্তার ধারে এঁদের পাড়া। এঁরা অধিকাংশই অন্ধ্রের তেলুগু সম্প্রদায়ভুক্ত। কৈবর্তরা প্রধানত মাছ ধরেন কিন্তু সারা বছর তাতে চলে না। তাই বাগ্‌দি বা কাওরা পোদেদের মতো দিনমজুরি করেন। পুকুরকাটা, বাগানের বেড়া দেওয়া, শাকসবজির চাষ করা, গাছর ডাব পাড়া, দোকানে বাজারে মাল বওয়া ইত্যাদি করে চলে। এঁদের মধ্যে কাওরাদের আবার ঢুলি সম্প্রদায়ও আছে। পুজোয় ঢোল ঢাক বাজান। কিন্তু জাতে অচ্ছুৎ। কেউ কেউ বেতের ঝুড়ি চাটাইও বোনেন। মেথররা তো বটেই কৈবর্ত কাওরা বাগ্‌দি বা পোদেরাও অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁরা বামুন কায়েতদের পুকুরে স্নান করতে বা খাবার জল তুলতে পারেন না। এঁদের ছেলেরা বামুন কায়েতদের স্কুলে পড়তে পারে না, সে সংগতি ক্বচিৎ থাকলেও। কুমোর যুগী বা গোয়ালারা জল-চল—তাঁদের সে বাধা নেই। যেমন আমার যিনি মাস্টারমশাই ছিলেন তিনি জাতে গোয়ালা বা চল। এঁদের বাড়িকে বলে 'চলেদের' বাড়ি। জানি না হয়তো এঁদের কোনো সময় জলচল ছিল কিনা। যখন সে অনুমতি মিলল তখন এঁরা 'চল' হয়ে গেলেন।

ছয়

আমার ছেলেবেলা স্বভাবতই প্রধানত কেটেছে এই বামুন কায়েত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের সঙ্গে মিশে। যেহেতু এঁদের কর্তাব্যক্তিদের এক-পা সবসময় কলকাতায় এঁদের সামাজিক রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সবসময়ই কলকাতানির্ভর। কলকাতার কেউ হাঁচলে এঁরা এখানে বসে তুড়ি দেন। সবাই যেন একপা তুলে আছেন একটু অবস্থা ফিরলে কলকাতাবাসী হবেন। কাজেই গ্রামের দিকে কারো নজর নেই। যাঁদের না থাকলে নয় তাঁরাই যা কিছু ভাবনাচিন্তা করেন। এই শহরমুখিনতা তিন-চার পুরুষ ধরে চলে আসছে। কিন্তু এঁদের পূর্বপুরুষরা গাঁয়ে দালানকোঠা বানিয়েছেন, পুকুর দিঘি কাটিয়েছেন, স্কুল বানিয়েছেন, স্বাস্থ্যচর্চার আখড়া বানিয়েছেন, গাছ-গাছড়া লাগিয়েছেন। আমার ছোটবেলায় দেখেছি তার অধিকাংশই ধ্বংসোন্মুখ। পানায় ভরতি পুকুর ডোবা আর বাঁশ-ঝাড়গুলো মশার ডিপো। ম্যালেরিয়ায় গ্রাম মুমূর্ষু। নামকাওয়াস্তে মিউনিসিপ্যালিটি একটা আছে বটে, কিন্তু ওই থাকা পর্যন্তই। বড় বড় বাড়ি পোড়ো হয়ে আছে ইটকাঠ বেরিয়ে। যাঁদের না থাকলে নয় তাঁরা সেখানে বাস করছেন। হয়তো অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম এ সবের পিছনে কাজ করেছে। অথচ তা সত্ত্বেও এই সব অঞ্চলে এককালে জাতীয় চেতনার জোয়ার বয়ে গেছে। বিশেষ করে বিপ্লবী আন্দোলন এসব অঞ্চলের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে কিন্তু আজ আর কারো পাশের মানুষের দিকে তাকাবার সময় নেই। সকাল আটটা না বাজতে বাজতে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাজারে হাজারে মানুষ ছুটে চলেছেন স্টেশনের দিকে কলকাতার ট্রেন ধরতে—ফিরবেন কেউ রাত্রি নটা দশটা এগারোটা। সপ্তাহের মধ্যে ছদিনই এই রুটিন। বাকি থাকে রবিবার। সেদিন একটু বাজারে যাওয়া মাছ-মাংস কিনে দুপুরে একটি দিবানিদ্রা দিয়ে বিকেলে বেরোন। বিভিন্ন বয়স গোষ্ঠীর এক এক রকম আড্ডা। কোথাও তাস, কোথাও রাজনীতির সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা, কোথাও হয়তো নাটকের রিহার্শাল। এঁদের যাঁরা সন্তান বা ভাইপো বা ছোটভাই স্কুলে পড়াকালীন তাদেরও একই চিন্তা—ম্যাট্রিকটা কোনোরকমে পাশ করে একটা চাকরি বাকরি জুটিয়ে নিয়ে বিয়ে-থা করে সংসারী হওয়া। বলছি না এর ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু অধিকাংশই এই। ঠিক হয়তো এই ভাবে তখন বুঝতাম না। কিন্তু বন্ধু বা খেলার সাথী হিশেবে আমার আসামের কুলি ছেলেদের অনেক বেশি ডাইন্যামিক মনে হত আর ভালো লাগত। কৈশোরে স্কুলে আমার কোনো বন্ধু ছিল না বললেই হয়। একা একা থাকতে ভালো লাগত। সবই করতাম—লাট্টু গুলি খেলতাম, ফুটবল খেলতাম, স্পোর্টসে অধিকাংশ ব্যাপারে ফার্স্ট হতাম। কিন্তু আমার মনের শূন্যতা যেন ঘুচতে চাইত না।

এই সময় আমার মন ভরিয়ে দিতেন একজন মানুষ তাঁর নাম ছিল অমর্ত্যদা। মামার

বাড়ির বাগান পুকুর সবজির খেত গোয়ালঘর বাঁশবাগান এই সব দেখাশোনা করার ভার ছিল তাঁর ওপর। তখন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। মা-র দাদুর সঙ্গে তাঁর রেঙ্গুনের কাঠের ব্যবসায়ে বালকভৃত্য হিশেবে বহু বছর কাটিয়ে এসেছেন, এখন এ বাড়িরই একজন হয়ে গেছেন অমর্ত্যদা! ভোর থেকে সন্ধ্যা পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত জনমজুর খাটানো, ডাব পাড়ানো, মাছ ধরানো, দুধ দোয়ানো সব কিছুর তদারকি করতেন তিনি। মামারা এমনকী দিদিমা পর্যন্ত তাঁকে সমীহ করতেন। এই অমর্ত্যদা ছিলেন অসাধারণ গল্প বলিয়ে। এত সরস করে জমিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গল্প বলতে আমি আমার জীবনে আর কাউকে শুনিনি। অনেক রূপকথার বই ঠাকুরমার ঝুলি ইত্যাদি পড়েছি কিন্তু সেগুলো অমর্ত্যদার ধারেকাছে আসতে পারবে না। তাঁর কাছে শোনা সেই এগারো-বারো বছর বয়সের কত গল্প যে আজও আমার মনে আছে ভাবলে অবাক হতে হয়। তাঁর কাছে শোনা মজন্তালী সরদারের গল্প, চোর চক্রবর্তীর গল্প, পড়িধর রাজার গল্প আমার ছোট ভাইবোন, ছেলেমেয়েদের কতবার যে শুনিয়ে তাদের মুগ্ধ করেছি তার ইয়ত্তা নেই। যদিও তাঁর সিকিভাগেরও একভাগ বলার ক্ষমতা আমার নেই। ভাবলে দুঃখ হয় যে এই গল্প বলিয়েরা দেশ থেকে উধাও হয়ে গেল। মাঝে মাঝে মনে হয় হয়তো এখনো গাঁয়েগঞ্জে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সেই উত্তরাধিকার বহন করছেন। কেউ যদি বিজ্ঞাপন দিয়ে একটা আসর করতে পারতেন 'গ্রামবাংলার প্রচলিত মুখে মুখে বলার গল্প' মনে হয় বহু দাদু-দিদিমাদের এখনো পাওয়া যেতে পারত। কত সন্ধ্যা যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অমর্ত্যদার গল্প শুনে কেটেছে। বলার গুণে অতি সাধারণ গল্পও অনবদ্য হয়ে উঠত। গল্পের এমন জায়গায় এসে তিনি থামাতে জানতেন—থামিয়ে বিড়ি ধরাতেন বা শেয়াল তাড়াতেন উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকতাম আবার কখন শুরু করবেন। এখনো যখন গল্প লিখি বা বলি মনে হয় আমার ওপর তাঁর প্রভাব এসে পড়ে।

আমার মানসিক নিঃসঙ্গতার আর এক সঙ্গী ছিল আমার ছোটদাদুর দু-আলমারি ঠাসা ইংরেজি সাহিত্যের বই। ছোটদাদু ইংরেজিতে এম এ ছিলেন। তাঁর সংগ্রহের একটি অসাধারণ ভাগ আমি ভাগ্যক্রমে পেয়েছিলাম। আমার মাস্টারমশাই খাঁদনদা (ভালো নাম সন্তোষকুমার ঘোষ) ছিলেন ইংরেজি গ্রামারের এবং সাহিত্যের একজাতীয় addict খুব ছোটবেলা থেকেই আমাদের ইংরেজিতে পারদর্শী করে তোলার জন্য তাঁর পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। Nesfields-এর গ্রামার তাঁর ছিল কণ্ঠস্থ। দাদা ও আমি দুজনেই ২৪ পরগনা জেলার শ্রেষ্ঠ ইংরেজির সোনার মেডেল পেয়েছিলাম ম্যাট্রিকে। মনে আছে স্কুলে আমি ক্লাস নাইন থেকে টেনে ওঠার সময় ইংরেজির দুটো পেপারে যথাক্রমে ৮১ এবং ৮৩ নম্বর পেয়েছিলাম। বহু বছর ধরে সেটাই ছিল স্কুলের রেকর্ড। কাজেই আমার এই ইংরেজি শেখার নেশার আগুনে ঘৃতাহুতি ছিল ওই দুটো আলমারি ঠাসা বই। Chaucer থেকে Tennyson পর্যন্ত সব কবিদের Complete works ছিল তাঁর সংগ্রহে। কবিতা সংগ্রহ Golden Treasury ছিল আমার প্রিয়তম বই। Hazlitt এবং Emerson-এর Complete Essays ছিল, Fielding, Thomas Hardy, Walter Scott, Galsworthy, Dickens, Jonathon Swift-এর অনেক উপন্যাসে, আর ছিল Imaginery Conversation নামক দারুণ বইটি। John Bunyan-এর Pilgrims Progress ছিল, Shakespeare তো ছিলই, আর ছিল History of English Language, History of English Literature। বছর তিনেকের মধ্যে এর প্রায় সব বই আমি না বুঝলেও বারবার পড়ে শেষ করেছিলাম।

Robert Blake-এর একটা বই ছিল অদ্ভুত রংচঙে mosaic painting করা যেটা আমাকে ভীষণ haunt করত। Johnsonian ইংরেজি এবং তাঁর sense of humour আমাকে মুগ্ধ করত। Milton-এর নাম আজকাল আর কেউ করে না কিন্তু তাঁর Paradise Lost পড়লে আমার মাইকেলের কথা মনে হত। সেই গুরুগম্ভীর ধ্রুপদী ভাষা আর তার দীর্ঘ imaginery পরবর্তী জীবনে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের কিছু কবিতায় যেন তার রেশ পেতাম। বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র আমি মা-র সংগ্রহ থেকেই পড়ে শেষ করেছিলাম। মাইকেল পড়েছিলাম লাইব্রেরি থেকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ আমার জীবনে যখন এলেন আমি তখন ক্লাস VIII-এর ছাত্র। স্কুলে প্রাইজ পেয়েছিলাম সঞ্চয়িতা আর গল্পগুচ্ছ দুখণ্ড। রবীন্দ্রনাথ পড়ার পর মনে হল এতদিন যা পড়েছি সব জোলো। তাঁর কবিতা আবৃত্তি করেই আমি Recitation-এ ফার্স্ট হয়েছি বহুবার। পাগলের মতো এর ওর তার থেকে চেয়ে কিংবা লাইব্রেরি থেকে জোগাড় করে অনেক রাত জেগে জেগে পড়তাম। বছরান্তে মা-র কাছে যখন যেতাম তাড়াতাড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই সঙ্গে নিয়ে যেতাম। এক একটা কবিতা বারবার পড়ে খুঁজতে চাইতাম যেন ওর জাদুটা কোথায় লুকিয়ে আছে। তখন আমি তেরো-চোদ্দ বছরের কিশোর তবু তাঁর অসম্ভব পরিশীলিত refined মনকে যেন বুঝতে পারতাম। কেন জানি না তাঁকে আমার পরমাত্মীয় মনে হত। এক অসাধারণ রুচিবান সুরসিক সহৃদয় মন যেন তাঁর রচনার প্রতিটি লাইনে আত্মপ্রকাশ করত। জীবনে যদিও কোনোদিন তাঁকে কাছ থেকে দূরে থাক দূর থেকে দেখারও সৌভাগ্য হয়নি, মনে হত আমার চিন্তার জগতে ওঁর চেয়ে আপনজন আমার আর কেউ নেই। যখন মারা গেলেন তখন আমি বঙ্গবাসী কলেজের সেকেন্ড ইয়ার আই এসসি-র ছাত্র—১৭ বছরের তরুণ। সারা কলকাতা ভেঙে পড়া সেই মৃতদেহের প্রোসেশন দেখলাম আর লাউড স্পিকারে বাজছিল তাঁর কণ্ঠের "বহুদিন মনে ছিল আশা/ ধরণীর এক কোণে/ রহিবে আপন মনে।" আমি একটা বাড়ির রকে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম। সেই আমার সচেতন জীবনের প্রথম আত্মীয় বিয়োগ! কাউকে না বলে এক মাসের অশৌচ নিলাম। তখনো দাড়ি গোঁফ ভালো করে ওঠেনি—কামাবার প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু খালি পায়ে কলেজে আসতাম, মাছ-মাংস খেতাম না। তাই নিয়ে কলেজে কত যে ঠাট্টা বিদ্রূপ শুনতে হয়েছে, কিন্তু আমি পরোয়া করতাম না। তখন আমি গ্রাম থেকে ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করতাম। বেলেঘাটা (শিয়ালদহ সাউথ) স্টেশন থেকে খালি পায়ে হেঁটে বঙ্গবাসী কলেজ পর্যন্ত কলকাতার পিচগলা রাস্তায় আসতে পায়ের পাতায় ফোসকা পড়ার মতো হত কিন্তু ওটুকু কষ্ট আমার সবচেয়ে প্রিয়জনের জন্য করছি ভেবে ভালো লাগত। মনে আছে দিদিমা বা মামারা কেউ আমাকে কিছু বলেননি শুধু অবাক হয়ে বোঝবার চেষ্টা করতেন কি দুঃখ আমার জীবনে ঘটল। সে কথা তাঁদের বোঝাবার আমার কোনো উপায় ছিল না। তখনো কিছু জাতীয়সংগীত ছাড়া রবীন্দ্রসংগীত আমার জীবনে আসেনি। সে কথা পরে।

আমার কৈশোরে যে ব্যাপারটা প্রচণ্ডভাবে আমাকে নাড়া দিয়েছিল সে কথা বলি। আমাদের ওই অঞ্চল জুড়ে ভদ্রলোকের পাড়ায় খাটা পায়খানা ছিল—গরিবরা মাঠে বা বাঁশবনে যেতেন (এখনো তাই আছে)। মেথর-মেথরানীরা প্রতিদিন সকালে এসে ক্যানেস্তারায় ভরে ভরে মাথায় করে ময়লা নিয়ে যেতেন। সংস্কারবশতই জানতাম এদের ছুঁতে নেই, ছুঁলে চান করতে হয়। স্কুলে যাবার সময় মেথর পাড়ার পাশ দিয়ে যেতে হয়। দেখতাম সারে সারে গুয়ের টিন সাজানো। কাদাভরা উঠোনে শুয়োর আর বাচ্চারা

একসঙ্গে খেলা করছে। মেয়েরা একজন আরেকজনের উকুন বাছছে বা মাটির কলসি ভরে দূরের কোনো ডোবা থেকে জল আনছে। পুরুষরা কেউ ঘরের বেড়া দিচ্ছে বা কুড়ুল দিয়ে রান্নার কাঠ কাটছে। এই নরকের মধ্যে থেকেও কি করে জানি স্ত্রী পুরুষ সবাইকার অটুট স্বাস্থ্য। আমি প্রায়ই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। আমাদের স্কুলপাঠ্য বইতে ছিল সত্যেন দত্তের 'মেথর' কবিতা। 'কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি/ শুচিতা সদাই তব ঘুরিছে পিছনে/ তুমি আছ গৃহবাসে তাই আছে রুচি/ নাহলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।"—আমি একদিন বাংলার মাস্টারমশাইকে বলেছিলুম 'তাই যদি হয় ওদের ছেলেদের স্কুলে পড়তে দেয়া হয় না কেন?'—মাস্টারমশাই বললেন, 'সে কথা বইয়ে লেখা নেই, যা লেখা আছে তাই পড়ো।' একজন মেথরানী ছিলেন তাঁর নাম ছিল রাধিকা। কি লাবণ্যময়ী যে তাঁর চেহারা ছিল! তাঁকে দেখলে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে ভীষণ মন কেমন করত। যে ঘটনার কথা বলছিলাম—একদিন হঠাৎ শুনলাম মেথররা স্ট্রাইক করেছে—ওরা আর পায়খানা পরিষ্কার করতে আসবে না। একটানা প্রায় দশদিন ধরে চলল এই স্ট্রাইক। পায়খানায় মলমূত্রের পাহাড় জমা হল, দুর্গন্ধে গাঁয়ের পর গাঁ ভরে গেল। শুনলাম মিউনিসিপ্যালিটি ওদের মাইনে বাড়াতে অস্বীকার করেছে। সেই জন্যে ওরা কাজ বন্ধ করেছে। তার মানে রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে অন্তত আট-দশটা গাঁয়ের পায়খানা সাফ হবে না কয়েকশো ঘরের। শহরের মানুষরা এর গুরুত্ব বুঝবেন না হয়তো! এই যে নিরীহ অচ্ছুৎ অপমানিত মানুষগুলো যাদের কোনোদিন মুখ দিয়ে একটা কথা উচ্চারণ করতে শুনিনি তারা এতবড় একটা কাণ্ড করে বসল কিসের জোরে? আর ওরা তো সংখ্যায় হবে বড় জোর পনেরো-কুড়ি জন। এতগুলো গাঁয়ের তাবড় তাবড় মাতব্বর তালেবর সব ভদ্রলোকেরা ওদের কিছু করতে পারল না কেন? একদিন দেখলাম মেথরপাড়ায় লালঝাণ্ডা উড়ছে আর একটা মাচানের ওপর দাঁড়িয়ে একজন গেরুয়া পাঞ্জাবি-পরা লোক বক্তৃতা করছেন। শুনলাম তিনি বলছেন, 'শুধু মাইনে বাড়ালেই চলবে না, মানুষের বাসযোগ্য বাসস্থান বানিয়ে দিতে হবে, খাবার জলের টিউবওয়েল বসাতে হবে, ছেলেদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ করে দিতে হবে, মেয়েদের প্রসূতি-ভাতা ইত্যাদি সাত দফা দাবি। মেথরপাড়ার আশেপাশে কৌতূহলী কিছু মানুষ জমা হয়েছিলেন—হঠাৎ তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। একটা পুলিশভ্যান এসে দাঁড়াল আর জনাদশেক বন্দুকধারী পুলিশ নেমে মিটিংটাকে ঘিরে ধরল। ভদ্রলোকের গলা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল—"পুলিশ জুলুম দিয়ে আমাদের বাঁচার লড়াইকে থামানো যাবে না।" একজন অফিসার তাঁকে টেনে নামাতেই মেথররা তাঁকে ঘিরে ধরতে চাইল, তারপর চলল ধাক্কাধাক্কি আর লাঠি। মেয়েদের চিৎকার, বাচ্চার কান্নায় ভরে গেল গোটা অঞ্চল। ভদ্রলোককে টেনে নিয়ে ওরা ভ্যানে তুলল আর তুলল কয়েকজন মেথরকে। ভ্যান চলে গেল। ততক্ষণে কৌতূহলী দর্শকরাও চলে গেছেন। মেয়েদের কান্নার রোল উঠল। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হল। কি অন্যায় করেছে ওরা যার জন্য এই সাজা। যে ভদ্রলোক বক্তৃতা করছিলেন তিনি তো অন্যায্য কিছু বলেননি। তাঁকে কেন পুলিশে ধরল? আর ধরলেও গাঁয়ের ভদ্রলোকেরা কেন প্রতিবাদ করলেন না।? এঁরা কি এদের বিপ্লবী ঐতিহ্য ভুলে গেলেন? তখন আমি ক্লাস টেনের ছাত্র, বছর পনেরো বয়স, সেটা ১৯৩৮ সাল। বোঝার বুদ্ধি হয়েছে, বুঝি যে আমাদের পরাধীন দেশ, ভারতীয়দের ব্রিটিশরা কোনো অধিকার স্বেচ্ছায় দেবে না—কিন্তু যারা পুলিশ বা অফিসার তারা তো সবাই ভারতীয়, মেথররাও তো ভারতীয়

এবং মেথরদের যারা বঞ্চিত করে অমানুষের মতো রেখেছে তারা তো সবাই ভারতীয়। তাহলে দ্বন্দ্বটা কোথায়?··· পরে শুনলাম মেথরদের মারধোর করে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু সেই ভদ্রলোককে হাজতে পুরেছে।

জিজ্ঞেস করে জানলাম তিনি ভট্‌চায্যি বামুনের ছেলে, কোদালেই তাঁর বাড়ি, নাম লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য, তিনি কমিউনিস্ট এবং মেথর ইউনিয়ন গড়েছেন। মিউনিসিপ্যালিটির যাঁরা কমিশনার সবাই কংগ্রেসের লোক অর্থাৎ গান্ধীজির শিষ্য এবং তাঁরাই পুলিশ ডেকে এনেছেন। তাহলে কি এঁরা তাঁর হরিজন মুক্তি আন্দোলন বোঝেনি? এই মেথররা যদি হরিজন না হয় তো হরিজন কারা? এই সব প্রশ্ন আমার অনেক রাতকে বিনিদ্র করে দিত—কিন্তু উত্তর খুঁজে পেতাম না। তখন কে জানত আগামী দু-তিন বছরের মধ্যেই ওই মেথরপাড়াতেই ওদের ছেলেদের নিয়ে আমরা স্কুল চালাব, আরো পরে আমাদের ভাইয়েরাও সেই স্কুল চালিয়ে যাবে। ওদের মধ্যে থেকে ভালো রেজাল্ট করে একাধিক গ্রাজুয়েট বেরোবে এবং ওই মেথরদেরই একটি মেয়েকে ভালোবেসে চক্রবর্তী বাড়ির ছেলে ঘুনো (ভালো নাম মনে নেই) তাকে বিয়ে করে ঘরে তুলতে গিয়ে একটা প্রচণ্ড হইচই বাধাবে? এ সবই, বলতে গেলে শুরু হয়েছে ১৯৪১ সাল থেকে, স্বাধীনতার ছবছর আগে থেকে এবং একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যখনই আমরা এই ধরণের তথাকথিত দুঃসাহসী কোনো পদক্ষেপ নিয়েছি আমাদের বা আশপাশে গ্রাম থেকে পুরোপুরি সমর্থন না পেলেও কোনো তীব্র প্রতিবন্ধকতা পাইনি। তার কারণ আগেই বলেছি—সেই সচেতন উত্তরাধিকার।

কিন্তু আজ স্বাধীনতার ৩৭ বছর পার হবার পরেও অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন তো কিছুই ঘটেনি! এখনো সেই মেথরপাড়া তেমনি আছে, তেমনি খাটা পায়খানা, তেমনি মাথায় করে ওদের মেয়েরা পুরুষেরা ময়লা বয়ে নিয়ে যায়, সমাজে ওরা তেমনি অচ্ছুৎ। সে স্কুল কবে উঠে গেছে। ভাবতে পারা যায় আজকের এই প্রচণ্ড বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও প্রযুক্তির যুগে কলকাতা শহর থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরেই (আরো দূরের কথা যাক) এই অমানবিক সামন্ততান্ত্রিক প্রথা এখনো রমরম করে চলছে এবং সবাই নির্বিবাদে মেনে নিচ্ছে? সবাই না বলে উপায় কি? বিকল্প কি আছে বলুন? তা অবশ্য ঠিক। যে বিকল্পের কথা ভেবে হাজারে হাজারে মানুষ এই দেশে আত্মত্যাগ করেছে, আত্মবলি দিয়েছে এবং তাঁদের প্রতারণা করে স্বাধীনতার ফল ভোগ করে যারা আজ লাখপতি থেকে কোটিপতি, কোটিপতি থেকে অর্বুদপতি হয়ে এদেশের মাথায় বসে আছে এবং আইনকানুন থেকে শুরু করে অনুশাসন যাদের স্বার্থে চলছে চরিত্র তাদের সেদিনও একই ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সেই দিনে বিকল্প একটিই ছিল—'বিপ্লব'। এবং আজও তাই আছে বলে আমার বিশ্বাস। জানি না ইতিহাসের এবং সমাজ অগ্রগতির ক্রমবিকাশের বিজ্ঞানের অমোঘ নিয়মে হয়তো সেটা ঘটেনি এবং আমি কেন আমার আপনার ছেলেপুলে নাতিপুতির জীবনেও হয়তো তা ঘটবে না। কেন? তা আমি জানি না, আমার মতো সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান নেই। কিন্তু চতুর্দিকে দেখেশুনে রাগে এবং ঘৃণায় গা জ্বলে কিনা বলুন! সেই ১৯৪৭ সালে যখন লিখেছিলুম—'নাকের বদলে নরুন পেলুম/টাক ডুমাডুম ডুম/জান দিয়ে জানোয়ার পেলুম/লাগলো দেশে ধূম'—সেটা আমার বানানো কথা ছিল না। সেই ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্ট আমি ছিলাম হাতিখুলি চা-বাগানে বাবা-মা-র কাছে। সেইদিনে নওগাঁ থেকে শীলঘাট থেকে ট্রাক ভরতি করে কংগ্রেসি ফ্ল্যাগ উড়িয়ে যখন স্বাধীনতার মিছিল যাচ্ছে তখন বাগানের কুলি

মেয়েরা ভয় পেয়ে সেই মিকির পাহাড়ের দিকে ছুটেছে চা-বাগান পেরিয়ে, ভেবেছে আবার বুঝি মিলিটারি লরি ভরতি আমেরিকান আর ব্রিটিশ সৈন্যরা আসছে, যারা যুদ্ধের সময় তাদের ট্রাকে তুলে নিয়ে গণধর্ষণ করে পথে ফেলে দিয়ে চলে যেত। কে তাদের বোঝায় যে আমরা 'আজাদ' হয়েছি, স্বাধীন হয়েছি। আজাদির মানে কি? এরা কি করে তা বুঝবে? এদের জন্যে তো তা নয়। ওই চা বাগানের ব্রিটিশ মালিক চলে গিয়ে মাড়োয়ারি মালিক হল এই তো? শোষণ কি কমল? ইজ্জত কি বাড়ল? সেটা ততক্ষণ বাড়েনি যতক্ষণ না ওরা আন্দোলন করে তিলে তিলে আদায় করেছে—তাও-বা কতটুকু? পরে যখন পার্টি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্তের লাইনের ভুল বুঝতে পেরে বলল যে ওটা ভুল, আসলে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি সেটা পার্টি বুঝতে পারেনি কাজেই ও গানটা বা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'মাউন্টব্যাটেন' এখন আর গাওয়া যাবে না—তখন আমি একটা বিকল্প লিখে বিনয়দাকে (বিনয় রায়) বলেছিলুম তাহলে কি এখন আমরা গাইব—'আকের বদলে/ গুড় পেলুম/ টাক ডুমাডুম ডুম, আর দেশ ভেঙে নেহরু-প্যাটেল পেলুম/লাগল দেশে ধূম'—বিনয়দা অবশ্য হেসেছিলেন, উত্তর দেননি। সেই যাই হোক সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে প্রচুর অস্ত্র ছিল, স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ হাজার হাজার নৌসেনা বায়ুসেনা ছিল, আজাদ হিন্দ ফৌজের মতো একটা অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতে পেরেছিল, আমাদের নৌবিদ্রোহের মতো একটা বৈপ্লবিক ঘটনায় হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান নৌসেনা কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়ে বহুদিন পর্যন্ত নেতৃত্বের একটি অঙ্গুলি হেলনের নির্দেশে জীবনপণ করেছিল এবং সেই ১৯৪৬-এর ২৯ জুলাই সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট একটা নতুন চেতনায় দেশকে জাগ্রত করা সত্ত্বেও কি করে ব্রিটিশ চক্রান্তে যোগ দিয়ে বুর্জোয়া কংগ্রেস আর মুসলিম লিগ আত্মঘাতী দাঙ্গায় সে দেশকে ভাসিয়ে, দেশকে টুকরো টুকরো করতে পারল এবং নিজেদের মধ্যে সে আপোসের স্বাধীনতাকে ভাগ করে নিয়ে ক্ষমতায় আসীন হতে পারল—আমার মতো বহু সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ভাবতে আজ অবাক লাগে। কেবলি মনে হয় সে সময় আমাদের দেশে একজন লেনিনের প্রচণ্ড প্রয়োজন ছিল। আর্থ-সামাজিক ঐতিহাসিক কারণেই বিপ্লব ঘটে ঠিকই, কিন্তু তার একটা বিশেষ মওকায় বিশেষ নেতৃত্ব যদি না থাকে তো সে বিপ্লব একশো বছর পিছিয়ে যেতে পারে—যা এদেশেও ঘটল। এই খানিকটা সেই ২৯ রানের মাথায় গাভাসকারের ক্যাচ মিস করলে সে ২৬০ রানে নট আউট থেকে যায়—তার মতো আর কি। যদিও বিপ্লব ক্রিকেট নয় ঠিকই বরং দাবার মতো একটি বিশেষ দানে একটি ভুল চালে খেলা উলটে যেতে পারে এবং সে দান আর কখনো ফেরে না। একই আর্থ-সামাজিক অবস্থায় কিউবায় যা ঘটে, পাশাপাশি বলিভিয়ায় তা ঘটে না কেন? নেতৃত্ব এবং চালের ভুল নয় কি? এদেশের পুঁজিবাদী এবং বুর্জোয়ারা যা করেছে এবং আজও যা করছে সেটা তাদের শ্রেণী চরিত্র হিশেবে ঠিকই করেছে, ভুল যদি কেউ করে থাকে সে আমাদের বামপন্থী মার্কসবাদী নেতৃত্ব। আজ সারা দেশের কোটি কোটি মানুষের এই যে চূড়ান্ত দুর্দশায় সংকীর্ণতা বিচ্ছিন্নতা এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা আবার উল্লাসে ধেই ধেই করে নাচছে, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, ব্যভিচার, উলঙ্গ অন্যায় শোষণ যে সমাজের সর্বস্তরে প্রকট হয়ে উঠেছে এবং বুদ্ধিজীবী সমাজে যে হতাশা বা নির্লিপ্ততা—এ সেই বিশেষ ঐতিহাসিক লগ্নে এবং পরবর্তীকালে আমাদের ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী বৈপ্লবিক নেতৃত্বের অভাবের ফসল ছাড়া আর কি? আজ আসামে নেলীর মতো এতবড় অমানবিক নৃশংস

হত্যাকাণ্ড কি করে ঘটতে পারল? দেখেছেন ছবি? শয়ে শয়ে মৃত শিশুকে সার বেঁধে শুইয়ে গণ-কবর দেয়া হচ্ছে? আসামের মানুষ এটা করল? কেন? কি করে সম্ভব হল। অথচ ওই আসামে আমার শৈশব কৈশোর প্রথম যৌবনের বহুদিন কেটেছে। খুন জখম তো দূরের কথা গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে দেখেছি দরজা বন্ধ করার কথা লোকে ভাবত শুধু বন্য জানোয়ারের কথা ভেবে—চুরি কাকে বলে ওদেশের মানুষ জানত না। অসম্ভব সৎ, অতিথিপরায়ণ, পরিশ্রমী। কত মা বোন ভায়েদের আজও চোখের সামনে দেখতে পাই। নিজে হাতে গামছা বুনে কত মা বোনেরা যে দিয়েছে আজও আমার ঘরে খুঁজলে হয়তো দশ-বিশটা পাওয়া যাবে। তারা সব খুনি হয়ে গেল? সাম্প্রদায়িক হয়ে গেল? কেন? কে দায়ী? ভাবলে আমার চোখ ফেটে জল আসে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে—ওগো তোমরা একটু চোখ খুলে দেখো, মন দিয়ে ভাবো—কি মহাসর্বনাশের পথে কিছু মুষ্টিমেয় লোক সংকীর্ণ ক্ষমতার লোভে শত শত বছরে অর্জিত আমাদের সব মূল্যবোধকে পায়ের নীচে পিষে ফেলে তোমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে। একটু দাঁড়াও, পিছন ফিরে তাকিয়ে একবার দেখো কারা তোমার আসল শত্রু আর কারা তোমার বন্ধু ভাইবোন। তোমাদের সুখেদুঃখে যাদের সুখদুঃখ, তোমাদের ভালোমন্দে যাদের ভালোমন্দ তারা কারা? তারা এই বিশাল ভারতবর্ষের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ! কিন্তু সে শক্তি কই? এককালে গণনাট্যের যুগে এমনি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গানের পর গান লিখেছি, মাঠেঘাটে ঘুরেছি! সেসব দিন আমার জীবনের উজ্জ্বলতম দিন। আজ জীবনের প্রায়ান্তে এসে সেদিকে তাকিয়ে ভাবি কেন আজ দেশের এই দুর্দিনে সেদিনের মতো শয়ে শয়ে শিল্পী সাহিত্যিক নাট্যকার গীতিকার কবিরা আজকের তরুণদের মধ্যে থেকে উঠে আসছে না? সে কি শুধু তরুণ কবি শিল্পীদের দোষ, না কি সেই অসাধারণ উদ্বুদ্ধকারী সচেতনতা আজকের নেতৃত্ব তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারেননি? এ কথার উত্তর আজ না পেলেও উত্তরকালে ইতিহাস নিশ্চয়ই দেবে।

সাত

এই দেখুন। মেথরদের সেই হরতালের কথা বলতে বলতে কোথায় এসে পড়লুম। এই হচ্ছে বুড়ো বয়সের দোষ! আসলে বলতে চাইছিলুম যে আমার জীবনে সাম্যবাদী রাজনীতির হাতেখড়ি মার্কসবাদী বই পড়ে হয়নি। ওই মেথরানী রাধিকা আম্মার কাছেই হয়েছিল। আজ তিনি নেই কিন্তু চোখের সামনে তাঁর চেহারা আজও ভাসে। মেথরপাড়ায় স্কুলে পড়াতে এসে কতদিন তাঁর জীবনের সব গল্প শুনেছি। ওঁর বাবা-মা-র সঙ্গে যখন এখানে আসেন তখন এগারো বছর বয়স! সেই বয়সেই মাথায় গুয়ের টিন নিয়ে জীবন শুরু। কি অমানুষিক হতশ্রদ্ধা, দারিদ্র্য আর অবহেলার অভিশাপের জীবন! ভাবি এখনো তো তাই! পড়াবার সময় বলতাম, দেখবে আম্মা তোমরাই শেষ! তারপরেই দেখবে তোমাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে কত বড় হবে। কেউ ডাক্তার হবে কেউ মাস্টার হবে। কেউ উকিল হবে, চাকরি করবে। রাশিয়ার গল্প বলতুম।

রাধিকা আম্মার খিলখিল হাসি আজও কানে শুনতে পাই। মাথা নেড়ে বলতেন—'এ দেশে হবে না।' একবার একটা ভারী মজার গল্প বলেছিলেন—"জানিস তো একবার বেশ কিছুদিন ধরে ভট্‌চায্যি পাড়ার অমুক আমার পিছনে ঘুরঘুর করত। বলত 'ও রাধিকা, তুই যদি সন্ধের পরে চান করে অমুক বাগানে আসিস তো তোকে ছুঁতে পারি। তাহলে তোকে দু-টাকা দোব।' আমি বললুম 'কেন তোমার জাত যাবে না?' বলল, 'চান করে একটু গঙ্গাজল মিশিয়ে গোবর খেয়ে নেব'।" বলে সে কি হাসি রাধিকা আম্মার। জিজ্ঞেস করলুম 'তা তুমি কি করলে?'

—"আমার মাথায় তখন টিন ছিল। বললুম—'ফের যদি কোনোদিন আসো তো তোমার মাথায় এই গুয়ের টিন উপুড় করে দোব।'—তারপরে আর আসেনি।"

সেদিন মেথরদের সব না হলেও বেশ কিছু দাবি মিউনিসিপ্যালিটিকে মেনে নিতে হয়েছিল এবং রাধিকা আম্মাই ছিলেন এদের অবিসংবাদিত নেত্রী। মেথরদের এই জয় আমার মনে অদ্ভুত এক চেতনার জন্ম দিয়েছিল। হঠাৎ যেন দেখলাম এই মেথরদের মুখেচোখে একটা আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ পড়েছে। গ্রামের লোকেরাও যেন ওদের একটু সমীহ করে চলতে শুরু করেছে। কি করে এটা সম্ভব হল? তখন আমি 'কমিউনিস্ট' কথাটা কয়েকবার শুনলেও তারা যে কি এবং কি চায় কিছুই জানতুম না। কার্ল মার্কস বা মার্কসবাদের নামও শুনিনি। এটুকু জানতুম ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি করেছে আর চোখে দেখলুম একজন কমিউনিস্ট কর্মী কি করে এই অশিক্ষিত নির্যাতিত নিগৃহীত মানুষগুলোকে সংগঠিত করে তাদের দিয়ে এতবড় একটা আন্দোলন করাতে পারল। দুটোই খুবই ভালো কথা। সবচেয়ে বড় কথা ওই কিশোর বয়সেই আমার মনে

একটা প্রত্যয় জন্মাল যে বাবার বাগানের সমস্ত কুলিরা যাদের অবস্থা এই মেথরদের থেকেও খারাপ এবং যারা সংখ্যায় হাতিখুলি ডিরিং এবং রাঙ্গাজান এই তিনটি বাগানেই পাঁচ হাজারেরও বেশি তারা সংগঠিত হয়ে ওই মেথরদের সাত দফা দাবিই যদি করে এবং স্ট্রাইক করে তাদের জয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। রাজনীতির জ্ঞান কিছুই না থাকায় এটা বোঝা সেদিন সম্ভব ছিল না যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধে ওই গাঁয়ের কয়েকজন মেথরের স্ট্রাইক আর প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ আওতায় ব্রিটিশ প্ল্যান্টার্স-দের বিরুদ্ধে চা শ্রমিকদের স্ট্রাইক—দুটোয় মৌলিক কত তফাত! তাছাড়া একটা দুটো বাগানের স্ট্রাইক আগুনের মতো লক্ষ লক্ষ চা শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে এবং সেটা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে হবে ডাইরেক্ট কনফ্রনটেশন। তার জন্য দরকার বিরাট এক সংগঠন এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব।

ছুটির সময় আসামে গিয়ে বাবাকে বলতেই বাবা চমকে উঠলেন—কে শেখাল তোকে এসব কথা?—বললুম মেথরদের স্ট্রাইক আর তাদের জয়ের কথা। বাবাকে বললাম—'আপনি তো নিজেই বলেন যে আমি ডাক্তার নই, নিধিরাম সর্দার! কেন আপনাকে ওরা চিকিৎসার সব যন্ত্রপাতি, ভালো ওষুধ এসব এনে দেবে না? আপনিই তো বলেন যে ওই কুলিরা যদি ওই শুয়োরের খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে পরিষ্কারভাবে থাকতে পারে, একটু পেটভরে খেতে পায় তাহলে ওদের অর্ধেক অসুখ সেরে যাবে? আপনি তো নিজেই ওই কুলিদের দিয়ে 'নাটক' করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে ওদের প্রতিভা কারো চেয়ে কম নয়? তাহলে? আপনি যদি আজ কুলিদের হয়ে বলেন ওদের ছেলেদের জন্য স্কুল চাই, ওদের জন্য ভালো থাকার জায়গা চাই, ওদের পেটভরে খাবার মতো মাইনে চাই, ওদের মেয়েদের প্রসূতি-ভাতা চাই, না হলে ওরা চা পাতা তোলা বন্ধ করবে—তাহলে আপনার এক কথায় হাজারে হাজারে কুলি আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে। তখন ওরা বাধ্য হয়ে—' বাবা মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—'তুই কি চাস তোদের বাবাকে বাঘে খাক?'

—তার মানে?

বাবা যা বললেন বছর তিনেক আগে নাকি পাশের 'মেথুনী' চা বাগানে দুটি বাঙালি ছেলে চুপিচুপি ইউনিয়ন গড়ে তুলছিল। তারপর একদিন দেখা গেল তাদের দুজনকে এবং যে সর্দার ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তাকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বাঘের ভুক্তাবশিষ্ট হিশেবে পড়ে থাকতে। যে কজন মিটিঙে যোগ দিয়েছিল তাদের সবাইকে সপরিবারে জাহাজে তুলে দিয়ে গোয়ালন্দ পার করে ছেড়ে দিয়ে আসা হল। বাবা বললেন—'আমাকে যা বলেছ বলেছ, এ কথা আর কোনোদিন কাউকে বোলো না এবং এই চিন্তাও মনের মধ্যে করবে না। তোমাদের রুগ্‌ণা মা, এতগুলি ছোট ছোট ভাইবোন, তাদের মানুষ করা, এখনো তুমি ম্যাট্রিকটাও পাশ করোনি, লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে হবে, তাছাড়া আমি কি চিরদিন এই দাসত্ব করব? আমাকেও তো তোরা মানুষ হয়ে মুক্তি দিবি—না কি?' আমি মাথা নেড়ে চুপ হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম—এদের যদি একজন রাধিকা আম্মা থাকত। সেবারে আর বাবার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করিনি, গানবাজনা, হইচই করেই ছুটিটা কেটে গেল। সেইবারেই যতদূর মনে পড়ে বাবা জোড়হাট থেকে আমার জন্য নতুন একটা সিঙ্গল রিডের হারমোনিয়ম কিনে এনে দিলেন। সেটা নিয়ে গাঁয়ে ফিরে এলাম। বাবা বোধহয় মনে মনে চেয়েছিলেন লেখাপড়ার সঙ্গে শৌখিন গানবাজনা নিয়েই ছেলে থাক, রাজনীতিটিতি যেন মাথায় না

ঢোকে। পরবর্তীকালে যে ওই হারমোনিয়মটাই বুকে ঝুলিয়ে মাঠে মাঠে কৃষকদের মধ্যে গণসংগীত গেয়ে বেড়াব সে কল্পনা করা বাবার কেন আমার নিজেরও অসাধ্য ছিল। অথচ আমরা জানতাম বাবা মনে মনে কি প্রচণ্ড ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন। চা বাগানের ম্যানেজারদের 'অশিক্ষিত বর্বর' কিংবা 'লালমুখো বাঁদর' সম্ভাষণ তাঁর মুখে লেগে থাকত। এখনো মনে আছে যেদিন গান্ধীজি 'কুইট ইন্ডিয়া' ডাক দিলেন, কাগজে পড়ে বাবার চোখেমুখে কি সে আনন্দ! 'এতদিনে বুড়ো একটা কাজের মতো কাজ করল!' হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে বললেন—'শালাদের মুখ শুকিয়ে এইটুকু! বড় বাড় বেড়েছিল শুয়োরের বাচ্চারা, এবার বুঝবে।' তারপর যখন কংগ্রেস নেতারা ভালো ছেলের মতো সুড়সুড় করে জেলে ঢুকলেন বাবার সে রাগ আর হতাশা আমি কোনোদিন ভুলব না। 'একে কি বলে আন্দোলন করা, লোকেদের উসকে দিয়ে নিজেরা কেটে পড়লেন! টেররিস্টদের কাছে এদের শেখা উচিত।' বাবা ছিলেন সুভাষ বসুর ভক্ত। মনে মনে আশা করতেন বার্মা হয়ে আসাম দিয়ে আমাদের বাড়ির সামনের ডিমাপুর রোড দিয়েই তাঁর লিবারেশন আর্মি ঢুকবে। আমি যখন বলতাম—'ফ্যাসিস্টরা যারা পৃথিবীকে পদানত করছে তারা আমাদের স্বাধীনতা দেবে? তপ্তকড়া থেকে আগুনে পড়তে হবে।' বাবা রেগে যেতেন। বলতেন—'সে কথা তোমার থেকে সুভাষ বোস অনেক ভালো বোঝেন।'

হারমোনিয়ম নিয়ে গ্রামে ফেরার পর নতুন উদ্যমে আবার আমার সংগীতচর্চা শুরু হল। ছোড়দার কাছে যা কিছু শিখেছিলাম কিছুই ভুলিনি কিন্তু তাতে আমার আর মন ভরতে চাইছিল না। ওই সব গৎ এবং পুরোনো থিয়েটারি গানগুলোকে নিচু স্তরের মনে হত। বাবার কাছে যখন যেতাম নতুন করে সিম্‌ফনি রেকর্ডগুলো বাজিয়ে আমার সারাদিন কেটে যেত। মনে হত এর বিস্তার অনেক বেশি, এ এক অজানা জগতের হাতছানি! হরিমতি কমলা ঝরিয়া, মৃণালকান্তি আর ভালো লাগত না। কি যে চাইতাম তা নিজেই বুঝতে পারতাম না। কল্পনা করতাম কত অদ্ভুত অদ্ভুত সব সুর যা পৃথিবীর কেউ কোনোদিন শোনেনি। কিন্তু তারা আমার কণ্ঠে বা হারমোনিয়মের পরদায় ধরা দিত না! কি যে যন্ত্রণা পেতাম! এই সময় আমার এক বন্ধু মদন এসে বলল তাদের পাশের বাড়িতে এক বিধবা মহিলা আর তাঁর ছেলে এসেছে। ছেলেটি এনেছে একটা গ্রামোফোন আর লেটেস্ট সব বাংলা সিনেমার গানের রেকর্ড। শুনলাম ছেলেটি নাকি মদ খায় আর দিনরাত রেকর্ড চালায়। মদনের বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ি থেকে কাছেই ব্রহ্মময়ীতলায়। মদনের বাড়িতে বসে সেই আমি প্রথম পঙ্কজ মল্লিকের গান শুনলাম। বোধহয় 'কী পাইনি তার হিসাব মেলাতে মন মোর নহে রাজী'। মনে হল এ রকম কণ্ঠ এর আগে আর কখনো শুনিনি আর কী অপূর্ব তার কথা আর সুর! তখনো জানতাম না যে ওটা রবীন্দ্রসংগীত। তাছাড়া—'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' কিংবা 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে'—পঙ্কজদার সুরে রবীন্দ্রকাব্য! কি অসাধারণ সুরারোপ। পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শুনেই অনেকের মতো আমিও রবীন্দ্রসংগীতকে ভালোবাসতে শিখেছিলাম। তাছাড়া সায়গলের কণ্ঠে, কাননদেবীর কণ্ঠে গাওয়া কত বিচিত্র সব সুর রাইচাঁদ বড়াল এবং পঙ্কজ মল্লিকের রচনায় ছুটির দিনে সারাদিন বসে বসে শুনতাম। ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করে আরো কাছে থেকে বসে শোনার ভীষণ ইচ্ছে করত কিন্তু উপায় ছিল না। মামাদের কড়া নিষেধ—'খবরদার! ওই ছেলের সঙ্গে মিশবে না! ও মদ খায়। তাছাড়া ওর মা-রও চরিত্র ভালো নয়। থিয়েটারে অ্যাক্টিং করত।' এখন ভাবি এই

নিরিখে যদি আজকের দিনে চরিত্র বিচার করতে বসি তাহলে তো শিল্পী মহলের শতকরা অন্তত নব্বুই জনকেই বাদ দিতে হবে। গাঁয়ের সবাই বোধহয় ওই মা ছেলেকে বয়কট করেছিল। বছর দুয়েকের মধ্যেই একদিন দেখলাম ওরা চলে গেছে। বেচারি!

ওই ছেলেটির কল্যাণে আমি গাঁয়ে বসে বসে এক বছরেই যত আধুনিক বাংলা গান এবং রবীন্দ্রসংগীত শিখতে পেরেছিলাম তা স্বাভাবিক অবস্থায় হয়তো পাঁচ-ছয় বছরেও শেখা সম্ভব হত না। এমন গান পাগল সুর এবং সুরসিক ছেলে নিশ্চয় ভালো মানুষ ছিল। তাকে কোনোদিন আমার ভালো করে জানার সুযোগ হল না। একবার শুধু অল্পক্ষণের জন্য আলাপ হয়েছিল। সেই সময় এক একদিন আমি স্কুল থেকে ফিরে দিদিমার কাছ থেকে মুড়ি আর নারকেল নাড়ু দুপকেট ভরতি করে নিয়ে রেললাইন পেরিয়ে ধুধু মাঠ ভেঙে দূরে কয়েকটা গাছ আর তার ফাঁক থেকে দেখা ছোট একটা দুটো কুঁড়েঘরকে লক্ষ্য করে একা একা হাঁটতে যেতাম। পৌঁছবার আগেই হয়তো দেখতাম কোনো ডোবা ছেঁচে কালো কালো সব ন্যাংটো ছেলেরা মাছ ধরছে। কারো হাতে আছে বাঁশের পোলো—কারো হাতে গোল বাঁশের ফ্রেমে আটকানো জাল। মাছ উঠত শোল ল্যাঠা কই শিং মাগুর কিংবা কাঁকড়া। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে ইচ্ছে করত আমিও অমনি ন্যাংটো হয়ে ওদের সঙ্গে মাছ ধরতে লেগে যাই! মনে হত ওরা কত স্বাধীন। আসামের কুলি ছেলেদের দশ বছর বয়স না হতেই বাগানে কাজ করতে যেতে হত—এদের তো সে বালাইও নেই। বর্ষার দিনে দেখতাম সার বেঁধে মেয়েরা সব ধানের চারা রুইছে। ঠিক লাইন ধরে সমান সমান ফাঁকে কি দক্ষতার সঙ্গে একটি একটি করে চারা পুঁতে পায়ের-পাতা-ডোবা-জলে যেন সবুজ জাজিম বুনছে বহুরঙা শাড়ি পরে কোনো বহুভুজা মেয়ে। কখনো ওপারের মুসলমান চাষিদের গাঁ পাঁচঘরায় চলে যেতাম কুরবান মিঞার বাড়ি। দুই ভাই কুরবান আর ইরফান ভূমিহীন চাষি, দিনমজুরি করে খায়। এরা দুজনেই মামাদের বাগানে কাজ করত। আমাকে দেখেই কুরবান মিঞা হাঁই হাঁই করে ছুটে আসত—'কি গো ছোটবাবু, এখানে যে?' বউকে বলত 'এই! তাড়াতাড়ি মাদুরটা নে-সে দাবায় পাত।' বললুম—'এই বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসেছিলুম—ভাবলুম তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই।' কুরবান ইরফানকে পাঠাল—যা ছোটবাবুর জন্যি ডাব নে আয়—তারপর কুরবানের অভিযোগ···

—দেখো দিকি কি কাণ্ড! বলা নি কওয়া নি এখন কি বা তোমারে খেত্‌দি আর কি করি বলোদিনি? —তা কিছু ঝ্যাদি মন্ না করো তো একটু খই মেখে দি তালের গুড় দিয়ে?—ও বউ! দে দিনি একটু···'

বউ কুরবান মিঞার কানে কানে কি বলল। কুরবান বলল—ও তাও তো বটে! তা আমরা তো মোচনমান গো বাবু,—খেলি তোমার জাত তো যাবেনি? মাঠান শুনলি হয়তো আমারেই বকাবকি করবে! কাজই বন্ধ করে দেবে।'

খাবার ইচ্ছে ছিল না। বললুম—'আরে ধুৎ-তেরি, তোমার জাতের নিকুচি করেছে। ও বউঠান, দাও দিকি তোমার খই গুড় মেখে বড্ড খিদে পেয়েছে।' ফ্যাকাশে রং আর ঝকঝকে শাদা দাঁতে সদাহাস্যময়ী বউঠানের বোধহয় তখন বছর ১৮-১৯ বয়স হবে। দুটো বাচ্চা। একটা বছর তিনেকের—হামাগুড়ি দেয়, আর একটা কোলে মাসছয়েকের হবে। খই মাখতে মাখতে বউঠান বলল কুরবানকে—'এ কি ওঁর ভালো লাগবে?' খেয়ে বললাম—'দারুণ খেতে বউঠান!—আমি কিন্তু রোজ আসব।' খই তো খেলুম তার পরে যত জল চাই দেয় না। বলে 'খই তো শুকনো ওতে দোষনি তবে আমাদের ছোঁয়া জল

খেলি নিঘ্যাত তোমার জাত যাবে। তোমার জন্যি ডাব আসতিছে।' একরকম কেড়ে নিয়ে জল খেতে হল। এ তো একবার নয়! কতবার যে ওদের বিব্রত করেছি, জ্বালাতন করেছি!

৪৪-এর দুর্ভিক্ষে কুরবানের এই বউ আর ওই দুটো কচি কচি মিষ্টি বাচ্চা না খেয়ে মারা গেল। কুরবান গলায় দড়ি দিল মামার বাড়ির বাগানের পাশে একটা গাছে। কি করে দেখলুম সে আর এক গল্প—পরে বলব। আর ৪৬-এর দাঙ্গায় ইরফানকে বালিগঞ্জ লেবেল ক্রসিং-এর ওপর হিন্দু ছেলেরা ওকে ধরে মাথাটা রেললাইনের ওপর চেপে পাথর মেরে মেরে তিলে তিলে খুন করল। আমি ট্রেন ধরব বলে তখন বালিগঞ্জ যাচ্ছি, ভিড় ঠেলে দেখি লাইনের ওপর একটা প্রায়-মৃত রক্তাক্ত দেহ অল্প অল্প খাবি খাচ্ছে—পানি! পানি!·· চেঁচিয়ে উঠতে গেলাম 'আরে এ তো আমাদের ইরফান!' মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। ততক্ষণে দুটি বীর ছেলে বেশ ভারী একটা বোলডার বয়ে নিয়ে এসে একঘায়ে ওর মাথাটাকে একেবারে ছেঁচে দিল। অট্টহাসি উঠল! পরে শুনেছিলাম ধারে কিছু সবজি নিয়ে ও গড়িয়াহাট বাজারে বেচতে আসছিল। এদের দুভাইকে অমর্ত্যদা ভীষণ ভালোবাসতেন আর ভালোবাসতেন আমার দিদিমা, ওরা ভীষণ পরিশ্রমী আর সৎ ছিল বলে। দুপুর অবধি ওরা বাগানে যেদিন কাজ করত সবাইকে খাইয়ে খেতে বসার আগে দিদিমা বলতেন—'আহা রে, দেখ দেখি ছেলে দুটো এই কাঠফাটা রোদে খেটে মরছে। ওদের ডেকে নিয়ে আয়।' ঢেঁকিঘরের পাশে দাবায় দুটো কলাপাতা পেতে ভাত বেড়ে দিয়ে যাই তরকারি থাক তাই দিয়ে ডাকতেন—'আয় বাবা, দুটো মুখে দে। না খেলে কি করে খাটবি?' তারপরে বলতেন—'খাওয়া হলে পাত ফেলে জায়গাটা একটু গোবর দিয়ে নিকিয়ে দিস বাবা!'—বলে দিদিমা খেতে বসতেন। সেই কুরবান আর ইরফান আর তাদের সেই ছোট্ট সংসার! মুছে গেল!

যে কথা বলছিলাম। একদিন কুরবান মিঞার বাড়ি থেকে খই গুড় খেয়ে ফিরছি। গাঁ পেরিয়ে মাঠে নামতেই দেখি দূর থেকে সেই ছেলেটি আসছে। ওর নামটা জানতাম, এখন আর কিছুতেই মনে পড়ে না। একমাথা ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল বেশ মোটাসোটা ভীষণ ফরশা এবং দীর্ঘ সেই ছেলেটির মুখটা কেমন শিশুর মতন! গালদুটো ফোলা, চোখদুটো যেন সব সময়ই অবাক হয়ে আছে। আর নীচের ঠোঁটটা ভারী ঈষৎ, ঝুলে পড়া কানের নীচে অবধি ঝুলপি, পরনে পায়জামা আর কাঁধের একপাশ কাটা পাঞ্জাবি, পায়ে পাম্পসু। কাছাকাছি আসতে আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলুম। ও ডাকল—'শোনো!' দাঁড়ালাম।—'তুমিই তো রাত্রে বাঁশি বাজাও তাই না?' ঘাড় নাড়লুম! তীব্র একটা মিষ্টি পারফিউমের গন্ধে জায়গাটা ভরে গেছে। ও একটা সিগারেট ধরাল। বলল—'আমি রোজ রাত্রে ছাদে উঠে শুনি আমার রেকর্ডের সব গানগুলো তুমি বাজাও, তাই না? দারুণ বাজাও তুমি।' আমি আর কি বলব চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ও যে কেন এ গাঁয়ে ঢুকছে কে জানে।

—'পান্নালাল ঘোষের বাঁশি শুনেছ?' জিজ্ঞেস করল।

বললাম—'না'।

—'আমার কাছে রেকর্ড আছে, শুনবে?'

বললাম—'কাল বাজিও, আমি মদনদের বাড়ি থেকে বসে শুনব।'

ছেলেটির মুখ ঈষৎ আহত হল বলে মনে হল। তারপর যেন রেগেই বলল—'এ সিনেমার গান নয় যে একবার শুনেই তুমি শিখে নেবে। কাছে বসে হাজারবার শুনেও

কেউ বাজাতে পারবে না এমন সে বাঁশি।' (এর কত বছর যে পরে ওই পান্নাদা 'বিরাজ বহু' ছবির আবহ সংগীতে আমার কয়েকটি রচনা কি অসাধারণভাবে বাজিয়েছিলেন!) হঠাৎ ছেলেটি বলল—'বড় বিপদে পড়েছি জানো! তুমি তো দেখছি এ গাঁ বেশ চেনো। কোথায় তাড়ি পাওয়া যাবে বলতে পার?'

—'তাড়ি?' আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

—'হ্যাঁ হ্যাঁ তাড়ি। মা বাড়িতে মদ খাওয়া বন্ধ করেছে। না পেলে আমায় এখনই কলকাতা ছুটতে হবে'—ও বলল। ভাগ্যের এমনই কল যে ঠিক ওই সময়ই দু-তিন জন চাষি দেখি দূরে মাথায় খেজুর রসের ভাঁড় নিয়ে চলেছে। তাদের দেখেই ছেলেটি আমাকে একেবারে ভুলে গিয়ে ছুট দিল—'এই এই শোনো! এই দাঁড়াও!' দূর থেকে দেখলাম ও হাত-পা নেড়ে ওদের যেন কি বোঝাচ্ছে—পকেট থেকে বোধহয় টাকা বের করে দিল। তারপর দেখলাম একজন ভাঁড় নামাল। দুহাত জড়ো করে ও আঁজলা পেতে বসল হাঁটু গেড়ে। আর একজন ভাঁড় উপুড় করে ঢালতে লাগল। ও মুখ নামিয়ে প্রচণ্ড তৃষ্ণার্তের মতো সেই অমৃত পান করতে লাগল। ওর সম্বন্ধে দেখা এইটিই আমার শেষ ছবি। এর কিছুদিন পরেই দেখি ওরা চলে গেছে।

মানুষ জীবনে কোনো সময়ই বোধহয় কোনো বিশেষ একটি চেতনার স্তরে নিবদ্ধ থাকে না। একই সঙ্গে অনেকগুলি ভিন্ন স্তরে এবং প্রবাহে জীবন নদী প্রবাহিত হয়। তার মধ্যে নিশ্চয়ই একটি মূল স্রোত থাকে কিন্তু চেতনার বিকাশের সেই প্রারম্ভিক অতীতের দিকে তাকিয়ে যখন বিচার করতে বসি তখন বুঝতে পারি না কোনটা ছিল মূল আর কোনগুলি তার শাখা-প্রশাখা। এক এক সময় মনে হত সংগীতই আমার জীবনের মূল স্রোত। সেই স্রোতে সম্পূর্ণভাবে ভেসে যেতে পারলে আমার ঈপ্সিত পূর্ণতার সমুদ্রে পৌঁছে যাব। আরো যখন বয়স বাড়ল মেথরদের যে স্ট্রাইক দেখে প্রথম চেতনা জাগল তখন থেকেই বোধহয় নতুন চোখে পারিপার্শ্বিক জগতকে দেখতে শুরু করলাম। মানুষের ওপর মানুষের কি চূড়ান্ত নির্যাতন, কি অপরিমেয় শোষণ, কি অন্যায় আর অবিচার! ছোটবেলা থেকে চা বাগানের শ্রমিকদের দেখেছি, কিন্তু হঠাৎ যেন তাদের নতুন চোখে দেখতে শিখলাম। বাবা বলতেন বটে ওসব কথা চিন্তাও যেন কোরো না—কিন্তু চেতনার সেই নতুন স্তরে আমার মনে হল আর সব কিছু মিথ্যে। সম্পূর্ণ জীবনকে যদি এই কাজে নিয়োগ করতে পারি এবং তার জন্য জীবন দিতে পারি সেই হবে সত্যিকার বাঁচা। প্রথম কলেজ জীবনেই আমার কমিউনিস্ট ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তখন কিছুদিন আমি ক্যানিং হোস্টেলে থাকতাম। ওদের মধ্যে একজন নেতাগোছের যতদূর মনে পড়ে তাঁর নাম ছিল অরুণ দাশগুপ্ত। তিনিই প্রথম আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন সাম্যবাদ মানে কি, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব কেমন করে রুশ দেশে সংঘটিত হয়েছে, ভারতীয় কমিনিস্টদের দায়দায়িত্ব কি ইত্যাদি। অনেক রাত ধরে আলোচনা হত। তখনো আমার বয়স সতেরো বছর হয়নি কিন্তু এটুকু উপলব্ধি ছিল ব্যক্তিগত অ্যাডভেঞ্চার করে লাভ নেই। তাহলে ওই মেথুনী বাগানের ছেলেদের মতো 'বাঘে' খাবে। তাছাড়া চা বাগানে ছোটবেলা থেকে থাকার ফলে শোষণ কাকে বলে খুব ভালো করেই আমার জানা ছিল। তথাকথিত এই 'কুলি'দের সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই মেলামেশার ফলে এবং বাবার সেই বৈপ্লবিক ওদের নিয়ে নাটক করার মধ্য দিয়ে মানুষ হিশেবে এদের চেনার আমার সুযোগ হয়েছিল। সংকীর্ণ স্বার্থপরতা যা মধ্যবিত্ত সমাজে সুলভ তা এদের মধ্যে নেই বললেই চলে। এই সব মানুষদের নিয়ে বিপ্লব ঘটিয়ে

শোষণহীন সমাজব্যবস্থা তৈরি করার যে আদর্শ তার প্রচণ্ড মানবিক দিকটাই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল এবং সেই সময়ে ছিল তার চেয়েও বড় ব্রিটিশকে তাড়িয়ে আগে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে এবং সে আন্দোলনে শ্রমিক কৃষককে বৃহত্তর অংশ নেওয়াতে হবে।

বলতে গেলে আমি এক কথায়ই কমিউনিস্ট হতে রাজি হয়ে গেলাম এবং সেই রাতেই ছেলেদের সঙ্গে লুকিয়ে পোস্টার লাগাতে বেরিয়ে গেলাম। সেটা ছিল ১৯৪০ সাল—চল্লিশ থেকে বাহান্ন ঠিক এই বারো বছরের একটা যুগ কত ঘাত-প্রতিঘাত সংগ্রাম বিচ্যুতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন গণনাট্য দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা স্বাধীনতা দেশ-বিভাগ ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যে দিয়ে আমার রাজনৈতিক মানসিক চেতনার কত উত্তরণ উত্থানপতন মোহভঙ্গ যে ঘটে গেছে! জানি না তা আমার মননশীলতাকে হয়তো আরো ধনী করেছে—যে আদর্শের রাস্তাকে মনে হত সুন্দর সরল একটি জ্বলন্ত তির্যক রেখা তা যে কত জটিল কত বিচিত্র জ্যামিতিক বহুভুজ বহুকোণ সমন্বিত এক গোলকধাঁধা বারবার পথ হারাতে হারাতে আবার আলো দেখে আবার অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে কত আপনকে পর পরকে আপন করতে করতে আগে যাচ্ছি না পেছনে যাচ্ছি এই দ্বিধায় দুলতে দুলতে পরিক্রমা—এক সময় সেই স্রোত থেকে নিজেকে তুলে নিয়ে পাড়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পিছন ফিরে তাকাতে চেয়েছি—কি হল? সব ঠিক আছে তো? রাধিকা আম্মা? অরুণদা? তোমরা সাড়া দিচ্ছ না কেন? সেটা ১৯৫২ সাল। বাবা মারা গেলেন।

চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে অন্য একটি স্তরে চলছিল আমার সাহিত্যচর্চা। বস্তুতই এগারো-বারো বছর বয়স থেকেই আমি লিখতে শুরু করি। খাতার পর খাতা আমি কবিতা লিখে ভরিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু সেটা ছিল আমার একান্ত গোপন। একমাত্র আমার মা ছিলেন এগুলির পাঠিকা। আমাকে না বলে মা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার কিছু কিছু পাঠিয়ে দিতেন এবং নির্ঘাতভাবেই তা ফেরত আসত। আমাকে মা বলতেন না, পাছে আমি মনে দুঃখ পাই। একবার আমার হাতে এমনি এক ফেরত-আসা চিঠি পড়তে দেখে মা যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে! আমিই পাঠিয়েছিলুম। দেখো, কত আজেবাজে সব পদ্য ছাপে ওরা আর তোর এত সুন্দর লেখা মুখপোড়ারা একবার খুলে পড়ে না পর্যন্ত।' সেদিন না বুঝলেও আজ বুঝি যে সেগুলি রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ ছাড়া আর কিছু ছিল না। সেগুলি যে কোথায় কবে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে তার কোনো হদিশই আর কোনোদিন পাওয়া যাবে না। তার জন্য আমার কোনো দুঃখও নেই। কিন্তু পরবর্তীকালে ৪৭-৪৮ সালে গণনাট্যের জন্য লেখা আমার নাটক 'এই মাটিতে', 'জনান্তিকে' এবং 'সংকেত' ইত্যাদি নাটকগুলির পাণ্ডুলিপি যে কোথায় হারিয়ে গেল! ছাপা হয়নি কোনোটাই, কারণ প্রথম অভিনয়ের পরেই নাটকগুলি সদ্য-স্বাধীন কংগ্রেস সরকার নিষিদ্ধ করেছিলেন। এর মধ্যে 'সংকেত' নাটকটি সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। 'সংকেত' ব্যান হলে 'ইঙ্গিত' নামে এবং 'ইঙ্গিত' ব্যান হলে 'ইশারা' নামে নাটকটি অভিনীত হত। এতে করুণাদি (বন্দোপাধ্যায়), সাধনাদি (রায়চৌধুরী) এবং কালী বন্দোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত প্রমুখ অভিনয় করতেন। পার্টি তখন বেআইনি এবং আমিও তিন তিনটে ওয়ারেন্ট মাথায় আত্মগোপনে। কাজেই হদিশ রাখা সম্ভব হয়নি। এগুলির জন্য দুঃখ হয়।

চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকেই যদিও আমি বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ফেডারেশনের

সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, কিন্তু সক্রিয়ভাবে ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিতে পারিনি। তার কারণ আমাদের সোনারপুর অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনের ঢেউ তখন উত্তাল হয়ে উঠছে। ক্ষেপুদা এবং হরিধনের (যাঁদের কথা আগে বলেছি) নেতৃত্বে এবং আমিও তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ি। কৃষক আন্দোলনের যে জমিদার-জোতদার বিরোধী প্রত্যক্ষ শ্রেণীসংগ্রামের উত্তেজনা তার কাছে ছাত্র আন্দোলন কেমন যেন জোলো মনে হত আমার কাছে। আমাদের ওই অঞ্চলের হাজার হাজার একর আবাদি জমি বিদ্যাধরী নদী মজে যাওয়ায় বঙ্গোপসাগরের লোনা জলে ভেসে যেত। ফলে সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে লক্ষ লক্ষ কৃষকের জীবনে নেমে আসত নিশ্চিত অনাহার। ড্রেজার দিয়ে বিদ্যাধরী নদী কাটাবার দাবিতে এবং কৃষকের রিলিফের দাবিতে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আমরা নৌকোয় করে খাবার, ওষুধ এবং দুধ ইত্যাদি সংগ্রহ করে রিলিফের কাজে যেতাম। এই সময়েই আমি ক্ষেপুদার কথায় কৃষকদের আন্দোলন নিয়ে গান লিখতে শুরু করি। তারও অধিকাংশ আজ আর মনে নেই। ওই অঞ্চলের তখনকার ছেলেদের দু-একজনের কাছে কিছু আছে শুনেছি। একটি ভাটিয়ালি সুরে গান লিখেছিলুম, তার মুখটা মনে আছে:

দেশ ভেসেছে বানের জলে
ধান গিয়েছে মরে
কেমনে বলিব বন্ধু
প্রাণের কথা তোরে।

তখন এমন হত যে অনেক সময় কৃষকদের মিটিঙে বসে-বসেই গান লিখে সেই মিটিঙেই গাইতে হত। মিটিং শেষ হলে সে গান যদি কেউ রেখে দিত তো থাকত, নইলে গেল। অসঞ্চয়ী বাউণ্ডুলে স্বভাব আমার ছোটবেলা থেকেই, তার জন্য কম দুঃখ ভোগ করিনি! ১৯৪৬-এর ২৯ জুলাই ভারতব্যাপী ধর্মঘটের প্রস্তুতির সময় শ্রমিক নেতা কমরেড বীরেশ মিশ্রর সঙ্গে একটি রেল ইঞ্জিন আর তার লাগোয়া বগিতে চেপে সারা আসাম ঘুরেছিলাম। সঙ্গে ছিল বাবার দেয়া সেই ছোট হারমোনিয়মটি। প্রত্যেকটি বড় স্টেশনে রেল শ্রমিকদের মিটিঙে বীরেশদা বক্তৃতা করার আগে আমি নতুন নতুন গান বেঁধে গাইতাম। বীরেশদা বক্তৃতায় যা যা বলতেন সেগুলিকেই সাজিয়ে আমি সুর করে গান বাজাতাম। সেগুলির প্রয়োজন সেখানেই মিটে গেছে বলেই বোধহয় হারিয়ে গেছে। রয়ে গেছে শুধু ২৯ জুলাই, ১৯৪৬ মনুমেন্টের নীচে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের মিটিঙে যে গানটি গেয়েছিলাম:

ঢেউ উঠছে কারা টুটছে
আলো ফুটছে প্রাণ জাগছে

আজ হরতাল আজ চাকাবন্ধ।

বোধহয় আসামের লামডিং রেল স্টেশনে মিটিঙে হ্যাজাকের আলোয় জমেছিল প্রচণ্ড শ্যামাপোকা। বীরেশদা যতবার মুখ খোলেন পোকা ঢুকে যায়, প্রত্যেক কথার শেষে 'থুঃ' করতে হয়। এই গল্পটি পরে আমি বিখ্যাত কমেডিয়ান সন্দীপ সান্যালকে বলেছিলাম আর ও বানিয়েছিল সেই অসাধারণ কংগ্রেসি নেতার বক্তৃতাটি: 'বন্ধুগণ আপনারা থুঃ জানেন যে কংগ্রেস থুঃ দেশের যে স্বাধীনতা থুঃ এনেছে থুঃ তার ফলে জনগণের জীবনে থুঃ যে আশার আলো থুঃ' ইত্যাদি।

যে কথা বলছিলাম। গণনাট্য আন্দোলন শুরু হবার অনেক আগে থেকেই আমি

গণসংগীত (তখন এ নাম ছিল না) রচনা শুরু করি। বঙ্গবাসী কলেজে ফোর্থ ইয়ার বি এ-র ছাত্র থাকাকালীনই রংপরে ছাত্র সম্মেলনে (১৯১৪):

বিচারপতি তোমার বিচার
করবে যারা আজ জেগেছে
সেই জনতা

গানটি রচিত এবং গীত হয়। এখনো মনে আছে রংপুরে কি প্রচণ্ড আলোড়ন হয়েছিল এই গানটি নিয়ে। বাঁশি বাজিয়ে হিশেবে আমার বঙ্গবাসী কলেজে নাম ছিল। পরপর তিন বছর আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় আমি বাঁশি আর এসরাজে প্রথম হয়েছিলাম। রংপুর ছাত্র সম্মেলনে আমাকে গান লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তখনকার ছাত্রনেতা (এখন প্রখ্যাত অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ) গৌতম চট্টোপাধ্যায়। 'বিচারপতি' গানটি সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার গাওয়া নিষিদ্ধ করে। স্বাধীনতার আগে তো বটেই স্বাধীনতার পরেও বহুদিন পর্যন্ত আমার অধিকাংশ গণসংগীত পুলিশ নিষিদ্ধ করেছিল। তখন মিটিঙের সময় মনুমেন্টের গায়ে পুলিশ একটা গানের লিস্ট ঝুলিয়ে দিত কোন কোন গান গাওয়া যাবে না তার ফিরিস্তি হিশেবে। তাতে থাকত অনিবার্যভাবে 'ঢেউ উঠছে', 'বিচারপতি', 'মানবো না বন্ধনে', 'নাকের বদলে', 'হেই সামালো', 'আমার প্রতিবাদের ভাষা'—এই গানগুলি। তাছাড়া থাকত হেমাঙ্গদার 'মাউন্টব্যাটেন' এবং অন্যান্য বহু গান। তখনকার দিনে মনুমেন্টের নীচে এক লক্ষ মানুষ কমপক্ষে জমায়েত হতেন। ছেলেরা আমাদের কর্ডন করে থাকত আর আমরা ওই গানগুলোই গাইতাম, তারপরে ভিড়ে মিশে যেতাম। একবার মহম্মদ আলি পার্কে একটি মিটিঙে আমরা গান গাইছি, হঠাৎ পুলিশ কর্ডন করে বেপরোয়া লাঠি চালাতে আরম্ভ করল। আমি প্রথমটা বুঝতে পারিনি। হঠাৎ দেখি ছেলেরা গান থামিয়ে ছুটতে আরম্ভ করে দিয়েছে। তারপরে মন্টু ঘোষের গলা শুনলাম, 'সলিলদা পালাও! পুলিশ!' পার্কের রেলিং থেকে নীচের ফুটপাত প্রায় আট ফুট দশ ফুট নীচে হবে। ঝপাঝপ তাই সবাই পড়তে লাগল। আমিও রেলিং পেরিয়ে নীচে লাফ মারব, হঠাৎ ডান কাঁধের ওপর পড়ল প্রচণ্ড এক বেটনের ঘা। নীচে পড়েই দেখি পুলিশ রেলিং টপকে যারা পড়ছে তাদের যেন লুফে নিয়ে ভ্যানে ভরছে। আমি চোখকান বুজিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে এক ছুট দিলাম—এ-গলি সে-গলি করে মিনিট পাঁচেক দৌড়বার পরে একটা খোলা দরজা দেখে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে হাঁপাতে লাগলাম। একটি মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে?' বললুম, 'পুলিশ!' মহিলা দরজা বন্ধ করে দিলেন। কাঁধে তখন ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে—শার্টটা সরিয়ে দেখি একটা লম্বা বেগুনের মতন কালসিটে পড়ে ফুলে উঠেছে কাঁধটা। ঘরে আরো দুজন মহিলা ঢুকলেন। তাঁদের কৌতূহল আমি চোর-টোর কিনা। বললাম, 'মিটিঙে গান করছিলাম, সেই সময় পুলিশ এসে মিটিং ভাঙতে লাঠি চালায়।' মুখে সহানুভূতির 'চুকচুক' করে একজন ঠাণ্ডা জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে কাঁধে দিতে লাগলেন। আরেকজন আমার পায়জামার ছেঁড়া ডান পাটা সেলাই করতে বসলেন পুলিশের বাপান্ত করতে করতে। গলা শুকিয়ে কাঠ। একজন জল এনে দিলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেলাম। পরে জেনেছিলাম ওটা ছিল হাড়কাটা গলি এবং মহিলারা বেশ্যা। এখন ভাবতে অবাক লাগে যে অন্তত ১৮-১৯ বছর পর্যন্ত বেশ্যা বলতে ঠিক কি বোঝায় তা আমার জানা ছিল না। এটুকু জানতাম যে অসম্ভব খারাপ একজাতীয় ডাইনী জাদুকরী গোছের হয় এইসব মেয়েমানুষরা, পুরুষ মানুষকে নাকি এরা ভেড়া করে রেখে দেয়। আসামে কামরূপের মন্দিরের পাহাড়ে নাকি এইজাতীয়

মেয়েছেলেরা থাকত। দেবদাসের চন্দ্রমুখী নাম্নী বেশ্যা যে কিসে খারাপ তা পড়ে আমি বুঝতে পারতাম না, বুঝতে পারতাম না তার কাছে যেতে গেলে দেবদাসকে মদ খেতে হয় কেন?

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ছে। তখন বোধহয় আমি থার্ড ইয়ারে পড়ি। ডেলি প্যাসেঞ্জারি ছেড়ে তখন আমি হ্যারিসন রোডে শান্তিনিকেতন বোর্ডিং হাউসে একটা ঘরে থাকতাম। আমার পাশের ঘরেই একটি ছেলে থাকত। হ্যাংলা মেয়েলি Pansy গোছের চেহারা, তার নাম ছিল কমল। শুনেছিলাম সে নাকি নাচে, মানে ড্যান্সার। একদিন রাত্রে সে আমার ঘরে এসে হাজির। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় সে নাকি আমার বাঁশি বাজানো শুনেছে। জানতে চায় একটা ডান্স পার্টিতে আমি বাঁশি বাজাব কিনা! ওদের দলে যে বাঁশি বাজাত সে নাকি দল ছেড়ে বেশি টাকার লোভে অন্য দলে চলে গেছে।

বললাম—'কি করে বাজাব? আমার তো কলেজ আছে, পড়াশোনা আছে!'

কমল বলল—'না না, তাতে কোনো অসুবিধে হবে না। রিহার্শাল হবে রোজ সন্ধ্যায় দু-এক ঘণ্টা, খালি শোয়ের সময় দু-চারদিন হয়তো বাইরে যেতে হতে পারে।' তাছাড়া কমল বলল—'রিহার্শাল প্রতি পাঁচ টাকা একটা এবং 'শো'-এ বাজালে ৫০ টাকা ওরা দেবে। কলকাতায় শো হলে ৩০ টাকা পার শো। কি, রাজি?'

জিজ্ঞাসা করে জানলাম দলটা হচ্ছে প্রখ্যাত নর্তকী রাজকুমারীর এবং আমি রাজি থাকলে কাল থেকেই রিহার্শালে যেতে হবে। শুধু বাঁশি বাজিয়ে যে এত টাকা পাওয়া যেতে পারে তা আমার ঘূণাক্ষরেও জানা ছিল না। তাছাড়া এমন একটা জগৎ যার সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই নেই এবং আমি যে এই জাতীয় একটা পেশাদারি দলের উপযুক্ত বাঁশি বাজাতে সক্ষম হতে পারি তাও ছিল কল্পনার অতীত। কিছুটা কৌতূহল কিছুটা লোভ এবং আমার সেই প্রথম যৌবনের অজানার হাতছানির পিছনে দৌড়ানোর একটা সুপ্ত ইচ্ছা মিলিয়েমিশিয়ে 'দেখা যাক কি হয়' গোছের একটা ভাব নিয়ে আমি রাজি হয়ে গেলাম। কমল বলল 'ভেরি গুড।' একটা দশ টাকার নোট হাতে দিয়ে বলল, 'এই তোমার আগাম, কাল সন্ধে ছটার সময় আমি তোমাকে নিয়ে যাব।'—বলে চলে গেল।

আট

সেই হল আমার প্রথম পেশাদারি সংগীত জীবনের হাতেখড়ি। পরদিন সন্ধ্যায় কমলের সঙ্গে গেলাম রাজকুমারীর বাড়ি—হাতে বিভিন্ন স্কেলের ছ-সাতটি বাঁশি একটা খবরের কাগজে মোড়া। দলের মিউজিক ডাইরেকটর প্রশান্তবাবুর সঙ্গে কমল পরিচয় করিয়ে দিল। প্রশান্তবাবু আমাকে দেখে খুশি হলেন বলে মনে হল না। একটা অবিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে আমায় আগাপাশতলা নিরীক্ষণ করে বললেন, 'এ বাজাবে?' আমাকে বললেন, 'আগে কোন কোন দলে বাজিয়েছ?' কমল তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, ও কলেজ স্টুডেন্ট। প্রফেশনাল দলে কখনো বাজায়নি বটে কিন্তু দারুণ বাজায়।' কমল আমাকে বলেছিল প্রশান্তবাবু নাকি আগে তিমিরবরণের ফার্স্ট অ্যাসিসন্ট্যান্ট ছিলেন এবং খুব ভালো সুর করেন। প্রশান্তবাবু বললেন, 'আচ্ছা দেখি বাঁশি বের করো—ডি সার্প।' আমার হাত তখন থরথর করে কাঁপছে!—জানি না কি বাজাতে বলবেন, পারব কিনা। তাকিয়ে দেখি অন্যান্য যারা যন্ত্রী কেউ সরোদ কেউ এসরাজ সেতার তবলা ইত্যাদি নিয়ে সকৌতুকে আমাকে দেখছে এবং নিজেদের মধ্যে কানে কানে কি সব বলছে আর হাসাহাসি করছে। বাঁশি বের করেছি ঠিক সেই সময় ঢুকলেন রাজকুমারী। ঝলমলে পোশাক পরিহিতা অসাধারণ রূপসী এক মহিলা যেন স্বর্গের কোনো দেবী। তীব্র এক সুগন্ধে সারা ঘরটা ভরে গেল, সবাই উঠে দাঁড়াল।

আমি সম্মোহিতের মতো বসেই রইলাম। কমল হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল আমাকে, তারপর রাজকুমারীকে বলল—'এই যে এই হচ্ছে সলিল। এর কথাই তোমাকে বলেছিলাম। আমাদের দলে আসতে রাজি হয়েছে।'

রাজকুমারী আমার চিবুকটা ধরে মুখটা তুলে বললেন, 'ওমা, এ তো এক্কেবারে ছেলেমানুষ, তুমি বাঁশি বাজাও?' আমি কিছু বলার আগেই প্রশান্তবাবু বললেন, 'দেখা যাক কি বাজায়, তার পরে দেখা যাবে।' রাজকুমারী সোফায় বসলেন। সবাই কার্পেটে বসল! আমিও বসলাম। ইচ্ছে করছিল ছুটে পালিয়ে যাই। এই মহিলার সামনে যদি বাজাতে না পারি? কি লজ্জার কথা হবে! শেষ পর্যন্ত পর্বতরূপী প্রশান্তবাবু একটি মুষিক প্রসব করলেন। বললেন 'বাজাও তো দেখি।' এখনো আমার মনে আছে স্বরলিপিটা—'সগধপ। গমৎ। স।-ন-ন।' সুকিয়া স্ট্রিটে আমার যখন ছবছর বয়স ছিল তখনই আমি এর চেয়ে অনেক শক্ত গৎ-এর স্বরলিপি গোপালদার কাছে শিখেছিলাম। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। প্রশান্তবাবু বললেন, 'কি হল? বাজাও!' তাকিয়ে দেখলাম, রাজকুমারী আমার দিকে তাকিয়ে আছেন সকৌতূহলে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি tempo? কোন লয়ে বাজাব?' প্রশান্তবাবুর ইশারায় তবলচি ঠেকা দিতে শুরু করল মধ্যলয় কাহারবায়। বাজালাম। প্রশান্তবাবু আরো সব মামুলি স্বরলিপি বলতে লাগলেন

'এটা বাজাও দেখি! আচ্ছা এটা বাজাও দেখি।' সব বাজাবার পর রাজকুমারী হেসে হাততালি দিলেন, 'very good!' প্রশান্তবাবুও আমাকে বুকে টেনে নিলেন, অনেক প্রশংসা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। প্রসঙ্গত বোম্বেতে এই প্রশান্তদার সঙ্গে আবার দেখা ১৯৫৭ সালে, তখন মধুমতী ছবি রিলিজ হয়েছে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন পুঁটেদা (তাঁর কথা পরে বলব)। প্রশান্তদা বোম্বেতে তখন কমার্শিয়াল জিঙ্গলের সুর করতেন, মানে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনি ছোট ছোট গান রেডিওর জন্য! আমাকে বুকে জড়িয়ে বললেন,—'কি? আমার Prediction ঠিক কিনা বলো?' বলে পুঁটেদাকে আমাকে সেই প্রথম টেস্ট নেওয়ার গল্প বললেন। বললেন, 'সলিল আমার হাতে গড়া।' সে যাই হোক। প্রতিদিন রিহার্শাল শুরু হল এবং ক্রমশ আমি রাজকুমারীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলাম। তাঁকে আমি দিদি বলতাম। দিদি আমাকে তাঁর অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে বলতেন, 'জানো ভাই, এ লাইনটা বড় খারাপ! এখানে এসে মানুষের পা পিছলানো খুব সহজ। তুমি এখন ছাত্র, পড়াশুনা করছ, ওদের মতো নও (মানে অন্য যন্ত্রীদের মতো যারা বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়) তোমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে।' সত্যি কথা বলতে কি আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না। দিদির দলে আরো সাত-আটটি মেয়ে নাচিয়ে ছিল। তাদের দু-একজন আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করত বুঝতে পারতাম। কিন্তু দিদির ছিল কড়া নজর। একটি মেয়ের ভারী মিষ্টি চেহারা ছিল। যখনই দেখতাম সে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত, আমার সারা শরীরে শিহরন খেলে যেত। একদিন রিহার্শালের পর সবাই যখন চলে গেছে আমি দিদির ঘর থেকে মিষ্টি খেয়ে বেরিয়ে দেখি সিঁড়ির প্যাসেজে সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে। তার নাম ছিল 'শ্যামা'। আমি কাছে আসতেই আমার একটা হাত ধরে বলল, 'এই! আমি তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি! আমার ঘরে একটু যাবে?'

—'কোথায় তোমার ঘর?'

—'কাছেই! দিদি যেন টের না পায় কেমন?'

হঠাৎ দিদির আবির্ভাব। শ্যামা ভয়ে পাথর হয়ে গেল। দিদির চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। বললেন, 'দেখ শ্যামা! আমি তোদের সবাইকে বার বার বলেছি আর যার সঙ্গে যা ইচ্ছে তোরা কর কিন্তু সলিলের সঙ্গে না। ও ছাত্র, পড়াশোনা করছে, ওকে তোরা কেউ ছুঁবি না। সে কথা তুই শুনলি না। কাল থেকে আমি যেন তোকে এ বাড়িতে না দেখি।' বলে আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। তারপর আমাকে বললেন, 'আমি না দেখলে এক্ষুনি তো সর্বনাশ হচ্ছিল? তোমায় বারণ করেছি না?'

কিসের সর্বনাশ? কি বারণ? আমার মাথায় কিছু ঢুকল না। বললাম, 'দিদি, আমি একেবারে-গেঁয়ো। তোমাদের এসব হেঁয়ালি আমি কিচ্ছু বুঝতে পারি না।' দিদি আমার গাল দুটো দুহাতে ধরে বললেন, 'ওরে! তাই তো আমার ভয়! তুই কি কিচ্ছু বুঝিস না—কেন তুই এলি বল দেখি আমাকে জ্বালাতে?'—বলে বললেন—'দাঁড়া! আমি আগরওয়ালাকে বলছি তোকে মেসে ছেড়ে আসবে।'

আগরওয়ালা ছিলেন এই দলের ম্যানেজার ফাইনানসিয়ার। তিনি আমাকে ছেড়ে এলেন একটা ফিটন গাড়ি করে। তার দুদিন পরেই আমরা গেলাম যশোরে 'শো' করতে। কি করে গেলাম, কোথায় 'শো' আজ আর মনে নেই। কিন্তু মনে আছে তার কদিন পরেই আমার অ্যানুয়াল পরীক্ষা। বাক্স ভরতি করে বইটই নিয়ে চললাম যশোর। 'শো'

আমাদের খুব ভালোই হল কিন্তু শোনা গেল যারা টিকিট বেচে 'শো' করেছে তারা টাকা নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। অর্থাৎ যে টাকা ওদের দিদিকে দেবার কথা ছিল তা অগ্রিম না নিয়েই উনি 'শো' করতে এসেছেন। দ্বিতীয় 'শো'তেও হাউস ফুল। অথচ টাকা না পেলে কেউ আর নাচতে বা বাজাতে রাজি নন। ইতিমধ্যে যন্ত্রীদের সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তাঁরা আমাকে বললেন, 'টাকা না পেলে আমরা কেউ বাজাব না ঠিক করেছি। সলিল তুমি আমাদের দলে তো?'

বললাম, 'দিদিও তো টাকা পাননি কিন্তু 'শো' আমাদের করতেই হবে নাহলে যারা পয়সা দিয়ে টিকিট কেটেছে তারা তো ছাড়বে না।' ওঁরা বললেন, 'আগুন জ্বালিয়ে দেবে এবং আমাদের কাউকে বিশেষ করে তোমার দিদিকে আর আস্ত ফিরতে হবে না। সেই তো আমাদের সুযোগ। ওই মেড়ো আগরওয়ালা টাকা দিক।'

টাকা ছিল না। কাজেই দিদি তাঁর যত দামিদামি গয়নাগাঁটি ছিল সমস্ত একটা বাক্সে ভরে বললেন, 'এগুলো তোমরা বন্ধক রাখো। কলকাতায় ফিরেই টাকা দিলে তবে ফেরত দিও। যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে এগুলো সলিলের জিম্মায় থাক।' ওদের কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমি পড়লাম মহা ফাঁপরে! এই এত দামিদামি হিরে জহরতের গয়না যদি চুরি যায় বা কিছু হয়? তবুও আমি নিলাম। কেননা ওদের আমিও বিশ্বাস করতাম না। বললাম, 'ঠিক আছে! আমার জিম্মায় থাক। চলো 'শো' করো।

'শো' তো উতরে গেল কিন্তু তারপরই একটা ঘটনা ঘটল যেটা আমার চিরদিন স্মরণে থাকবে। আগেই একবার জলে ডোবার গল্প বলেছি, এ হল আর এক জলে ডোবা যাতে আমার বাঁচার কোনো সুযোগই ছিল না ওই দিদি না থাকলে। আমাদের ক্যাম্পের কাছেই ছিল এক বিশাল দিঘি। বাজি ফেলে আমি সেই দিঘি সাঁতরে এপার-ওপার করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লাম। প্রায় কুড়ি মিনিট সাঁতরে যখন ওপারে পৌঁছলাম তখনই আমার দম প্রায় শেষ। বর্ষা শেষের জল অসম্ভব ভারী হয়ে ওঠে। আগে বুঝতে পারিনি। ভাবলাম একটু দম বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে গেলে ওপারে পৌঁছে যাব ঠিক। কিন্তু যখন মাঝ বরাবর এসেছি আমার সমস্ত শক্তি তখন নিঃশেষিত, প্রচণ্ড ক্লান্তির ঘুম যেন শরীরকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। বুঝলাম আমি ডুবছি আবার উঠছি। কিন্তু আর বেশিক্ষণ পারব না। তারপরেই আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। যখন জ্ঞান হল দেখি আমি ঘাটে শুয়ে আর ডাক্তার আমাকে বুকে দুহাতে চাপ দিয়ে আর্টিফিসিয়াল রেসপিরেশন করাচ্ছেন। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ফেটে যেতে চাইছে। পরে শুনেছিলাম যখন আমি ওপার থেকে ফের জলে নামি তিনটি স্থানীয় ছেলেও আমার পিছন পিছন জলে নামে। দিদি তাদের টাকা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সেদিন সমস্ত রাত আমার অসম্ভব যন্ত্রণায় কাটল। সারারাত জেগে আমার মাথায় অস্রুতাঞ্জন লাগিয়ে কম্বল চাপা দিয়ে সারা শরীরে গরম সেঁক দিয়ে দিদি আমাকে নিয়ে বসে রইলেন। মাঝেমধ্যে বলতে লাগলেন, 'ওই বুড়ো বুড়ো দামড়াগুলোর একটু লজ্জা করল না একটা কচি বাচ্চাকে এমনি করে লোভ দেখিয়ে জলে নামাতে?' আমাকে বললেন, 'এক হাঁড়ি রসগোল্লা খাবি তা আমাকে বলিসনি কেন?' কি করে বোঝাব যে রসগোল্লাটা বড় কথা নয়, মিষ্টি আমি খাই-ই না। কলকাতায় ফিরে সবাই যে যার পাওনা টাকা নিয়ে চলে গেল। গয়নার বাক্স দিদিকে ফেরত দিলাম। আমার পাওনা ছিল ১৭০ টাকা, দিদি আমাকে দুশো টাকা নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমি কিছুতেই টাকা নিতে পারলাম না। আবার আসব বলে চলে এলাম। কিছুদিন পরে কমল একটা কাগজ এনে আমাকে দেখাল, তাতে

বেরিয়েছে:

'কলকাতার রামবাগান অঞ্চলে রাজকুমারী নাম্নী একটি বেশ্যা রমণীকে খুনের দায়ে পুলিশ আগরওয়াল নামক এক ব্যক্তিকে খোঁজাখুঁজি করছে।'

—'রাজকুমারী? মানে দিদি? বেশ্যা?'—জিজ্ঞেস করলুম।

—'কেন তুমি জানতে না?' এক গাল হেসে কমল বলল—'দারুণ মাল ছিল মাইরি!'

এরপর থেকেই পেশাদারি নাচের জগতে বাঁশি বাজিয়ে হিশেবে আমার নাম ছড়িয়ে পড়ল। নানা দল থেকে ডাক আসতে লাগল। নাচের দলে বাঁশি বাজাবার সময় কত যে মজার মজার ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে! এ-দল সে-দল কত যে ঘুরেছি। এ আর এক জগৎ—চেতনার সম্পূর্ণ অন্য এক স্তরে এর বিচরণ। এখানে সংগীতে সৃষ্টিশীল কিছু করার নেই। অন্যলোকের তৈরি গৎ স্বরলিপি দেখে বাজানো। তবে তার মূল্য আছে নগদ করকরে টাকা। শেষ পর্যন্ত আমি তিমিরবরণের দলে যোগ দিই। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তখন রিহার্শাল হত। বোধহয় কেলু নায়ার এবং শীলা হালদারের নাচের জন্য রিহার্শাল চলছিল। তিমিরদা মাঝেমধ্যে আসতেন— অধিকাংশ সময় ভোম্বল (অমিয়কান্তি—তিমিরদার ভাইপো) পরিচালনা করতেন। এই ভোম্বলের ছিল অসাধারণ সেতার দক্ষতা এবং ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। পরে শুনেছি অত্যধিক মদ্যপানের ফলে অল্প বয়সেই তিনি মারা যান। এমনি কত প্রতিভাই যে আমি শেষ হতে দেখেছি!

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। প্রচণ্ড শীতকাল তখন, কলকাতায় ব্ল্যাক আউট চলছে। 'শ্রী' সিনেমায় আমাদের একটা 'শো' হচ্ছে, নাচবেন শীলা হালদার। প্রথম আইটেম ছিল 'গাগরী ভরণে' নৃত্য। শুরুতেই আমার বাঁশির আলাপের মধ্যেই তাঁর প্রবেশ। সেকেন্ড বেল হয়ে গেছে। সব যন্ত্রীরা যে যার জায়গায় স্টেজে বসে পড়েছে আর আমার পেয়েছে প্রচণ্ড পেচ্ছাপ। আমার পাশের যন্ত্রীকে বলে একদৌড়ে মূত্রাশয়ে ঢুকেই দাঁড়িয়ে আমি যেই বেগে শুরু করেছি প্রচণ্ড চিৎকার উঠল আমার পায়ের কাছ থেকে—'এই কোন শালা শুয়োরের বাচ্চা রে?' এক ভদ্রলোক যে কালো র‍্যাপার গায়ে জড়িয়ে বসে পেচ্ছাপ করছিলেন অন্ধকারে তা দেখতে পাইনি। আমি সেই অর্ধেক পেচ্ছাপ চেপে নিয়ে একছুটে এসে স্টেজে বাঁশি নিয়ে বসে পড়লুম। পরদা উঠল। কিন্তু বাঁশির আলাপ আর আমার বেরোয় না। পেটের মধ্যে খলখলিয়ে হাসি উঠছে। ওদিকে শীলা হালদার উইংসে দাঁড়িয়ে ইশারা করছেন। অনেক কষ্টে অন্যদিকে মন ফিরিয়ে বাঁশির আলাপ শুরু করলুম। বেচারী! সেই প্রচণ্ড শীতের রাত্রে ভদ্রলোকের কি যে অবস্থা হয়েছিল আর কত গালাগাল যে আমায় করেছেন আজও ভাবলে আমার পেটের মধ্যে খলখলিয়ে ওঠে।

পেশাদারি নাচের দলে বাঁশি বাজিয়ে হিশেবে আমার জীবন চলেছে আমার কলেজ জীবনের পাশাপাশি প্রায় তিন বছর ধরে। আমাদের সে যুগের এই নাচের দলের জগৎ ছিল যেন অন্য গ্রহের এক জগৎ। এর ভাষা আলাদা, ভঙ্গি আলাদা, ভাবনা আলাদা। মহড়া ঘরে নানারকম আতর, দেশী বিলেতি এসেন্স এবং ধূপ ইত্যাদি মিলিয়ে এর গন্ধও আলাদা। অথচ একটি সর্বাকর্ষক কেন্দ্রবিন্দু এই বহু বিচিত্রকে এনে জড়ো করে দেয় এক জায়গায়। নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হিংসা প্রেম লোভ ঈর্ষা সহানুভূতি একই বড় কড়ায় সিদ্ধ হতে থাকে। আসলে কিন্তু পিছন থেকে ছড়ি চালায় টাকা। তরল অনুভূতিগুলো যখন সিদ্ধ হয়ে দানা বাঁধে রূপ নেয় মুদ্রার।

এক বা একাধিক বিশিষ্ট নর্তক বা নর্তকীকে কেন্দ্র করে একটি দল গড়ে ওঠে।

কখনো কাহিনীভিত্তিক কোনো নৃত্যনাট্য, কখনো-বা বিভিন্ন ছোট ছোট লোকনৃত্য বা কিছু পৌরাণিক ঘটনাভিত্তিক নৃত্য। এইসব মিলিয়ে একটি ঘণ্টা তিনেকের প্রোগ্রাম তৈরি হয়। একজন সংগীত পরিচালক নিযুক্ত হন। তিনি বিভিন্ন যন্ত্রে বাছা বাছা সব যন্ত্রীদের একজোট করেন। অন্যদিকে ভাড়াকরা নাচের মেয়েরা ছেলেরা এসে জড়ো হয়। তাদের মধ্যে থেকে ঝাড়াইবাছাই করে দল তৈরি হয়। তারপর শুরু হয় রিহার্শাল। নৃত্য এবং অনুগামী সংগীত রচিত হয় দুই পরিচালকের নেতৃত্বে। কখনো কখনো মাসাবধি কিংবা তারও বেশিদিন ধরে চলতে থাকে নাচের এবং অর্কেস্ট্রার রিহার্শাল। তারপর অনুষ্ঠান শুরু হয় সাধারণত প্রথমে কলকাতায় তারপর মফস্বল শহরে, কখনো-বা অন্যরাজ্যেও। এইসব দলে যাঁরা যন্ত্রী তাঁদের অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। (ঘর সংসার ছাড়া) এঁরা পুরোপুরি পেশাদারি, রিহার্শাল বা অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে অন্য দু-চারটি খেপও এঁরা সেরে আসেন। এঁদের মধ্যে বহু ভালো ভালো প্রতিভাবান যন্ত্রীও দেখেছি, পুরোপুরি ক্ল্যাসিকাল হলে পয়সা নেই। নাচের দলে করকরে কাঁচা পয়সা, তাই চলে এসেছেন।

ছাত্রাবস্থায় এইভাবে জড়িয়ে পড়া স্বভাবতই আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এর একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আমাকে অন্যমনা করে দিত। পড়াশোনায় মন বসত না। সেই ছোটবেলায় ছোড়দার মিলন পরিষদ অর্কেস্ট্রা থেকে বেরিয়ে এসে একযুগ পরে আবার সেই পরিবেশে প্রবেশ। অথচ স্টাইলে তার কত পরিবর্তন ঘটে গেছে এই ক-বছরে। তিমিরদা, ভোম্বলদা বা বিশুদার (খগেন দাশগুপ্তর) কাছে আমি অনেক শিখেছি, কেমন করে যন্ত্র নির্বাচন করতে হয়, স্বর সমন্বয় কি করে ঘটাতে হয়, একটি বিশেষ গতি বা ভঙ্গি বা ভাবকে কিভাবে সুরায়িত করতে হয় তার বেশ কিছু প্রয়োগবিদ্যা আমি এঁদের কাছে শিখেছি। কিন্তু পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রার হারমোনিক ভিত্তি বা বহুস্বর প্রয়োগ পদ্ধতি এঁদের জানা না থাকায় এঁদের সংগীত কোনো সময়ই "টু ডাইমেনশন" ছাড়াতে পারেনি। এটা অবশ্য তখন বুঝতাম না, কিন্তু আমার সিম্‌ফনি শোনা কানে একটা অভাব কিছুতেই মিটতে চাইত না। উত্তরকালে বছরের পর বছর বহু বিনিদ্র রাত আমা সেই তৃতীয়ার অন্বেষণে কেটেছে। মাঝেমধ্যে শুধু তার অবগুণ্ঠন খসে পড়ে, তার সচকিত চোখে চোখ পড়েছে এই যা,—তারপর সেই চলা, সেই প্রশ্ন—"আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?"—আজ জীবন প্রায়ান্তে এসে শুধু ভাবি, যখন সবে আমার সেই সংগীত সুন্দরীর আভাস তার নূপুর নিক্কণে ভেসে আসছে ক্রমশ আমার দোরের দিকে, তার কণ্ঠস্বর শুনছি, "আমি চিনি গো চিনি তোমারে"— তখন পিছনের দরজায় কড়া-নাড়া শুনছি— 'দোর খোল, যাবার সময় হল'··· যাক, যে কথা বলছিলাম। এইসব নাচের দলে ক্রমশ ছেলেমেয়ে যন্ত্রী নর্তকী নর্তক ইত্যাদির মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠত।

তার মধ্যে ঈর্ষা, রেশারেশি, কান ভাঙাভাঙি যেমন চলত তেমনি স্নেহ ভালোবাসা পরার্থপরতারও নজির অনেক মিলত। আমার সেই দিদির কথা আগেই বলেছি, কিন্তু এই নাটকের একজন চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও আমি যেন থাকতাম উইংসের পাশে একজন দর্শক হিশেবে। কোনোদিনই মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারিনি। কারণ কুশীলবরাও আমাকে তাঁদের একজন হিশেবে ভাবতেন না বা দেখতেন না। দলের সঙ্গে বাইরে গেলেও আমার অবসর সময় কাটত বই পড়ে বা একা একা ঘুরে বেড়িয়ে। এটা

ওঁদের কাছে স্বভাবতই খুব বিচিত্র ঠেকত। কিন্তু ওঁরা আমাকে সমীহ করতেন— ঘরে বসে হয়তো কুৎসিত মুখখিস্তি চলছে, কিন্তু আমাকে দেখলেই সবাই যেন চুপ হয়ে যেতেন। অবশ্য মাঝেমধ্যে ঠাট্টা বিদ্রূপও যে সহ্য করতে হয়নি তা নয়। একটি ঘটনার কথা বলি— অতীনলালের দলে একজন নর্তকী ছিলেন যিনি একটি কাঁসার থালার কানার উপর দু-পা দিয়ে নাচতেন এবং এটি ছিল একটি দুরূহ নৃত্য, পারদর্শিতার প্রদর্শনী। যাকে বলে 'হিট আইটেম'। ক্রমশ তাল যত দ্রুত হত সেই নর্তকী (তাঁর নাম মনে আছে—বলা যাবে না) অবলীলাক্রমে সেই থালা পায়ের চাপে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সারা স্টেজ পরিক্রমা করতেন এবং সেতারের ঝালার সঙ্গে সঙ্গে চলত আমার 'অ্যাড লিব্' (মানে at liberty বা স্বচ্ছন্দ) বাঁশির আলাপ। যখন হাততালির ঝড় উঠত, মহিলা অনিবার্যভাবে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। প্রথমদিন আরো দু-তিন জনের সঙ্গে আমিও ছুটে গিয়েছি—মাথায় জলটল দেবার পর মহিলা একটু চোখ খুলে তাকিয়ে সবাইকে দেখে মৃদুস্বরে আমাকে বললেন হাত দুটো বাড়িয়ে, 'আমায় ধরো।' ধরে তুললাম। পরের দিনও তাই। তারপর থেকেই মহিলা অজ্ঞান হলেই আর কেউ যেতেন না— সবাই বলতেন, 'এই সলিল, তুই যা। তুই না জড়িয়ে ধরে তুললে ওর জ্ঞান হবে না।'

দু-একবার যাবার পর ঠাট্টার ভয়ে ইচ্ছে থাকলেও আমি আর যেতাম না দেখে মহিলা খানিক পরে নিজে থেকেই উঠে চলে যেতেন। তারপর অবশ্য আর অজ্ঞান হতেন না, কিন্তু আমার ওপর হল তাঁর প্রচণ্ড আক্রোশ। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে অন্য মেয়েদের বলতেন—উঃ! গুমোরে মাটিতে পা পড়ছে না। বি এ পড়ছে তো মাথা কিনে নিয়েছে। ওরকম আমি অনেক দেখেছি। ভিজে বেড়াল। ইত্যাদি···। মেয়েরা সবাই খিল খিল করে হাসত। আমি বুঝতাম না, আমাকে কাছে পাবার জন্য ওঁর অজ্ঞান হবার কি দরকার। যাই হোক এরপরেই আমি দল ছেড়ে দিলাম। দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতের টানাপোড়েনে আমি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলাম। একদিকে আমার কৃষক আন্দোলনের জগৎ, চিন্তার জগৎ, সাহিত্যচর্চার জগৎ, পড়াশোনার জগৎ— অন্যদিকে এই পেশাদারি নাচের জগৎ। যোগসূত্র ছিল শুধু আমার সংগীত। কিন্তু সে সংগীতেরও অন্তঃসারশূন্যতা চিনতে তিন বছরই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। একই জিনিশ চর্বিতচর্বণ করতে করতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। একটাই লাভ হল, টাকা জমিয়ে আমি প্রচুর বইপত্র কিনতে পেরেছিলাম। বিশেষ করে পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রেশন রীতির এবং হারমোনি কম্পিউটার পয়েন্ট সম্বন্ধে বিভিন্ন বই এবং একটা গিটার।

কিন্তু তখনো বইগুলি আমার বোঝার সময় হয়নি। সময় হল আরো আট-দশ বছর পরে, সে কথা সময়মতো বলব। এর আগেও দু-একবারের মতো সেবারেও স্থির করলাম নাচের পার্টিতে আর নয়। ইংরেজি অনার্স নিয়ে বিএ পড়েছিলাম, কিন্তু পার্সেন্টেজের অভাবে অনার্স ছাড়তে হল, নিজেরও ভালো করে পড়াশোনা না করার জন্য প্রস্তুতি ছিল না। কাজেই জোর করলাম না। অধ্যাপক নীরেন রায় আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি আমাদের Shakespeare পড়াতেন। তাছাড়া অধ্যক্ষ প্রশান্তকুমার বসুর আমি ছিলাম অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। এঁরা দুজনেই চেয়েছিলেন আমি অনার্স পরীক্ষা দিই। কারণ ক্লাসে আমি ভালো ছিলাম। পার্সেন্টেজ কোনো সমস্যা হত না। কিন্তু আমি চাইলাম না কেঁদে কঁকিয়ে অনার্স পেতে। তাই পাশকোর্সেই চেষ্টা চরিত্র করে আমি ডিস্টিংশন নিয়ে বিএ পাশ করলাম ১৯৪৪ সালে। কিন্তু এ তো পরের কথা।

এর আগের কথা বলি। একটা কথা আছে 'কমলি নেহি ছোড়তা।' আমি তো ডান্স পার্টি ছাড়লাম কিন্তু কমলিরূপী এক ভদ্রলোক, তাঁর নাম যতদূর মনে পড়ে নির্মল সেনগুপ্ত, একদিন খুঁজে পেতে আমার মেসে এসে হাজির। তখন আমি থাকি 'ইস্টার্ন লজ' নামক স্কট লেনের একটি মেসে। তিনি বললেন তাঁর দল মোটেই তথাকথিত পেশাদারি দল নয়। তাঁর দুটি বোন চিনু এবং মিনু, তারা নাচে এবং তাঁর ভাই অমুক সেনগুপ্ত সরোদ বাজিয়ে (নাম মনে নেই, তাঁকে আমরা মেজদা বলতাম) মিউজিক ডাইরেক্টর। 'আমরা চাইছি নৃত্যে রুচি নিয়ে আসতে, তাই তোমাকে চাই।' ভদ্রলোককে বেশ শিক্ষিত মনে হল কথাবার্তায়। পরে কানাঘুষায় শুনলাম ঢাকার বলধা-র রানী, যিনি বলধা-র রাজাকে হত্যার মামলায় অভিযুক্তা, তিনি নাকি ওঁর আপন বোন। তখন কাগজে কাগজে তাই নিয়ে লেখালেখি চলছে। লোকের মুখে মুখে তাঁর নাম। আফটার অল রানী। রাজাকে হত্যা করেছেন এটা একটা বিরাট ব্যাপার। আর খবরের কাগজওয়ালাদের তো চেনেন। ওরা একটা তিলকে প্রচারের ঘানিতে পিষে এক মণ তেল বের করতে পারে তার থেকে। একটা হাতিকে কিছুদিন শুয়োর করে রেখে পরে ছুঁচো বানাতে পারে। আর যদি জনপ্রিয় পত্রিকা হল তার তো কথাই নেই। তখনো তাই ছিল, এখনো তাই। সে যাই হোক নির্মলদার (তাকে আমরা পরে 'বড়দা' বলতাম) অনুরোধ এড়ানো গেল না। আমাকে নিয়ে গেলেন ওদের মলঙ্গা লেনের বাড়িতে।

প্রায় এক বছর আমার কাটল এই দলের সঙ্গে তাঁদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে। তফাতটা এই যে এঁরা সত্যিই তথাকথিত পেশাদারি দল ছিলেন না। একটি পরিবারের সবাই শিল্পী। দু-একজন আমাদের মতো বাইরের লোক। যাঁরা মোটামুটি সমভাবাপন্ন তাঁরা শুধু এই দলে ছিলেন। আমি অচিরেই এঁদের পরিবারের একজন হয়ে গেলাম। এঁদের আর এক বোন শেফালী সেনগুপ্তা গান গাইতেন, অসাধারণ মিষ্টি গলা ছিল তাঁর। তাঁকে বলতাম শেলীদি। মেজদার কম্পোজিশন ছিল একেবারে আলাদা জাতের। তিনি নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমানে চালাতেন। একই নৃত্যের নানারকম সুর প্রয়োগ করতেন এক-একটি অনুষ্ঠানে। এই সরোদ বাদক মেজদাই প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে রাগভিত্তিক এবং লোকসংগীতভিত্তিক হিন্দি ছবির গান কি অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তিনিই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে একদিন সারা ভারতবর্ষে এই সব গান মানুষের মুখে মুখে ঘুরবে। তখন মধ্যগগনে নওশাদ এবং তাঁর পাশাপাশি অনিল বিশ্বাস, ক্ষেমচাঁদ প্রকাশ, সরস্বতী রাণা প্রমুখ অসাধারণ সব সুরকাররা। কিন্তু তখনো তার জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ ছিল শুধু হিন্দিভাষী অঞ্চলে। মেজদার Prediction ভাবলে আজও আমার অবাক লাগে। মেজদাই প্রথম আমাকে নাচের সহযোগী সংগীত সৃষ্টি করতে উৎসাহিত করেন যা যন্ত্রসংগীতের একটি বিশিষ্ট দিক। পাশ্চাত্য সংগীতে যাকে বলে Ballet Music তার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতে। যেমন ধরুন চাইকোভস্কির (Tchaikovsky) Sleeping beauty বা Swan Lake কিংবা স্টাভিনস্কির (Stlavinsky) অত্যাধুনিক Petrouchka ballet. আমাদের দেশে সত্যিকার ব্যালে সংগীতের জন্ম হয় উদয়শংকরের অনুপ্রেরণায় তাঁর নৃত্যগুলির অনুষঙ্গ সংগীত হিশেবে তিমিরবরণ এবং ক্ষীর আলি ইত্যাদির হাতে। পণ্ডিত রবিশংকরও শচীনশংকরের জন্য কিছু অনবদ্য ব্যালে মিউজিক সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তীকালে শচীনশংকরের অনেকগুলি ব্যালের সংগীত আমি রচনা করেছি সত্তর দশকে। তার মধ্যে আছে The train, Ghost, Waiting, Cricket ইত্যাদি।

ব্যালের জন্য কম্পোজিশন দুভাবে হয়, এক হয় বিষয়বস্তু বা theme-এর ওপর সুরকার স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেন, choreographer বা নৃত্যবিদ তার ভিত্তিতে নৃত্য রচনা করেন। আর একভাবে হয়, নৃত্য পরিচালক স্বাধীনভাবে শুধু কয়েকটি তালের ভিত্তিতে তাঁর রচনা সম্পূর্ণ করেন আর সংগীতস্রষ্টা এবার তাতে অনুষঙ্গ সংগীত রচনা করেন। আমি এই দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই কাজ করেছি। তাতে চ্যালেঞ্জটা আরো বড়, কিন্তু ঠিকমতো সৃষ্টি করতে পারলে নৃত্য এবং সংগীত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলেমিশে এক অভাবনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। নির্ভর করে সুরস্রষ্টার কল্পনার দৌড় কতটা তার ওপর। এ অনেকটা সিনেমায় শুটিং হয়ে যাবার পর তাতে আবহ সংগীত প্রয়োগের মতো ব্যাপার। কিন্তু এ কাজ আরো দুরূহ। তার কারণ সিনেমায় সুরকার ছন্দে বা তালে বাঁধা পড়েন না। তিনি অনেকটা স্বাধীন।

মলঙ্গা লেনের এই সেনগুপ্ত পরিবারের আমার প্রতি স্নেহমমতার কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। বিশেষ করে নীলিমা বা চিনু ছিল অত্যন্ত প্রতিভাময়ী এবং আমার অত্যন্ত প্রিয়। ছোটবোন মিনু সরোজ বাজাত, শেলীদি গান গাইতেন, মেজদা তো সরোদ বাজাতেনই। শুধু বড়দা ছিলেন সমঝদার এবং পরিবারের কর্তা বলতে যা বোঝায় তাই। বাড়িতে গানবাজনা এবং নাচের নতুন নতুন প্রকাশভঙ্গি সৃষ্টি করা ছাড়া খাওয়াদাওয়া আর সবকিছুই ছিল যেন দায়সারা গোছের। এরপর একদিন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রায় কলকাতার স্নায়ুকেন্দ্র ছুঁয়ে গেল। হাতিবাগানে বোমা পড়ল বোধহয় ১৯৪৩ সালে। ইভ্যাকুয়েশনে কলকাতা খালি হতে আরম্ভ হল। বাবার টেলিগ্রাম পেয়ে আমিও কলকাতা ছাড়লাম। সেই শেষ। শুনেছিলাম নীলিমা বিয়ে করে পাকিস্তানে চলে গেছে। শেলীদিরও বিয়ে হয়েছে এক বিশাল বড়লোকের সঙ্গে, আর কিছু জানতে পারিনি। কে যে কোথায় হারিয়ে গেল! কে আছে, কে নেই, যাঁরা আছেন তাঁরা কী করেন কোথায় থাকেন কিছুই আর আজ জানার উপায় নেই। এমনি করে কত যে আপন কত ভালোবসার ধন আমার জীবনের গতিপথে এসে কিছুদিনের জন্য তাকে সমৃদ্ধ করে আলোকিত করে কত কিছু দিয়ে কোন অজানার শূন্যে অন্তর্ধান করে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। হয়তো এইটাই জীবনের নিয়ম। আমার ক্ষেত্রে যা তাঁদের ক্ষেত্রেও হয়তো তাই। তাঁদের জীবনেও হয়তো আমার মতো কত উপগ্রহ জীবনের কক্ষপথে কিছুদিন থেকে আবার মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেছে। লাভ শুধু একটাই, ওই দুদিনের পাওয়া।

১৯৪৩ সালে যখন বোমা পড়ল হাতিবাগানে, যতদূর মনে পড়ে একটা খাটালে বোধহয় দু-একটা মোষ মারা গিয়েছিল। তখন (আগেই বলেছি) আমি থাকতাম স্কট লেন আর আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে একটা লাল রঙের বাড়ির দোতলার একটি ঘরে। বাড়িটার নাম ছিল 'ইস্টার্ন লজ'। এই 'ইস্টার্ন লজ'-এ আমি ছিলাম প্রায় দেড় বছর একটা ঘর নিয়ে একলা। সেই আমি প্রথম একা থাকার সুযোগ পেলাম। বাঁশি বাজিয়ে পয়সার তখন আমার অভাব ছিল না। তার আগে আমি আর দাদা থাকতাম আমহার্স্ট স্ট্রিটে 'ইলিসিয়াম বোর্ডিং' নামক এক 'পাইস' হোটেলে। 'ইলিসিয়াম' মানে স্বর্গ। বোধহয় এটির মালিক ভদ্রলোক ঠাট্টা করে ওই নাম রেখেছিলেন, কেননা আমার কল্পনায় তখন নরকের যা ছবি ভেসে উঠত তার উৎস ছিল এই 'পাইস' হোটেলটি। এর নীচে একতলায় ছিল জুয়ার আড্ডা। ব্যাগাটেল বোর্ডে তখন দু আনি স্লটে ঢুকিয়ে জুয়া চলত। নানাজাতীয় মেয়েপুরুষের ভিড় লেগেই থাকত। পরে অবশ্য পুলিশ বন্ধ করে দেয় ওই আড্ডা।

দাদা তখন ডাক্তারি পড়ছে। আমাদের ঘরের দেওয়ালে ঝুলত একটি স্ত্রীলোকের কঙ্কাল। রবীন্দ্রনাথের কঙ্কালের গল্প পড়ে কতদিন শুয়ে শুয়ে কল্পনা করতুম যে ওই কঙ্কালের অরিজিন্যাল মানচিত্রকে একদিন দেখব আমার পাশে খাটে বসে আছেন, কিন্তু বেরসিক মহিলা তাঁর জীবিতকালের গল্প শোনাতে কোনোদিনই আসেননি। দোতলায় ছিল মেস আর একতলায় পাইস হোটেল। কাঠের পিঁড়ি পেতে সবাই খেতে বসত। তখনকার দিনে বোধহয় দশ পয়সা বড়জোর তিন আনায় ডাল চচ্চড়ি মাছের ঝোল অম্বল এবং পেটভরে ভাত পাওয়া যেত। অনেক হোটেল 'অম্বল ফ্রি'। শচীনদার (শচীনদেব বর্মণ) কাছে গোয়ালন্দের এক হোটেলের গল্প শুনেছিলাম। একজন হোটেলে ঢুকে এক গামলা অম্বল চোঁ চোঁ করে খেয়ে নিয়ে মুখ মুছে দুটো ভাজা মৌরি তুলে নিয়ে চিবোতে চিবোতে চলে গেলেন, মালিক প্রতিবাদ করতে গেলে বোর্ডে আঙুল দেখালেন—লেখা আছে 'অম্বল ফ্রি'। আর একটা গল্প শুনেছিলাম তাঁর কাছে। তখন দু-আনায় পেটভরে যত ইচ্ছে ভাত, ইলিশ মাছের ঝাল ঝোল, অম্বল পাওয়া যেত গোয়ালন্দে পদ্মা পারের হোটেলে। এক ভদ্রলোক এসে কুড়িজনের মতো রান্না একা খেয়ে শেষ করে যখন দু আনা পয়সা দিতে গেলেন হোটেল মালিক তা তো নিলেনই না বরং একটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন—'কাল থেকে ওই পাশের হোটেলটায় খাবেন।' আমাদের ওই ইলিসিয়াম বোর্ডিং-এর পাশের বাড়িতে সকাল সন্ধে এক ভদ্রলোক হেঁড়ে গলায় গলা সাধতেন, শুধু গাইতেন সারে গামা পাধা নিসা—সারে গামা পাধা নিসা। ওপরে উঠতেও তাই, নীচে নামতেও তাই। তখনো বোধহয় সানিধাপা মাগারেসা তালিম পাননি। এত অস্বস্তি এবং বিরক্তি লাগত যে ইচ্ছে হত ছুটে গিয়ে ভদ্রলোককে বলে আসি। একদিন দাদার বন্ধু আমাদের গাঁয়ের গোপীদা এলেন আমাদের মেসে। ওই সারগাম শুনে বললেন, "ওই ভদ্রলোক নিশ্চয় খুব বড় একজন দার্শনিক হবেন। জানেন যে, যা যায় তা আর কোনোদিন ফেরে না, আগেই বলেছি ইলিসিয়াম বোর্ডিং ছেড়ে আমি 'ইস্টার্ন লজ-এ ' একা থাকতে এলাম। হাতিবাগানে বোমা পড়ার পর একদিকে যেমন নিষ্প্রদীপ কলকাতা শহর খালি হতে আরম্ভ হল, অন্যদিকে রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারি লরি জিপ আর মোটবাইকে আমেরিকান শাদাকালো সৈন্য ব্রিটিশ সৈন্য আর দেশী সৈন্যে ভরে যেতে লাগল। আর তখন থেকেই মহামারী দুর্ভিক্ষের প্রকোপ শুরু হয়ে গেছে বাংলার গ্রামে গ্রামে। 'কালোবাজারি' কথাটা তখনই বাংলাভাষায় প্রবেশ করল। মিলিটারিতে চালান দেবার জন্য চাল, ডাল, আটা, নুন, তেল, কেরোসিন সব বাজার থেকে উধাও হয়ে কালোবাজারে ঢুকল আর মূল্যের উত্তাপ ডিগ্রির পর ডিগ্রি চড়তে চড়তে গোটা বাংলাকে একদিন ছারখার করে ছাড়ল। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় কৃষক রমণীদের "ফ্যান দাও মা—একটু ফ্যান দাও গো" আর্তনাদ মিলিটারি লরির ঘড়ঘড়কে বহুগুণ ছাপিয়ে মানুষের আহার নিদ্রাকে অভিশপ্ত করে তুলল। এই সময় অন্ধকার কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে গেলে সাবধানে না চললে ফুটপাতে পড়ে থাকা মৃতদেহে প্রায়ই হোঁচট খাবার ভয় থাকত। ৪৪ সনে গিয়ে এই দুর্ভিক্ষ তার তুঙ্গে উঠল, ৫০ লক্ষ মানুষ মারা গেল মানুষেরই তৈরি দুর্ভিক্ষে। এখন সেটা ইতিহাস। এই সময় কমিউনিস্ট ছাত্রদের একটি সাংস্কৃতিক দল দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্য টাকা তুলতে আসাম যাত্রা করে। সরোজিনী নাইডু একটি চিঠি দিয়েছিলেন দলটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন করে। সেই দলে আমি যোগ দিলাম বাঁশি বাজিয়ে হিশেবে। নাচের দলে যে টাকা পয়সার ছড়াছড়ি আরামে থাকা খাওয়া ইত্যাদি

স্বভাবতই এ দলে তার কিছুই ছিল না। অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন করে নিজের জামাকাপড় নিজেরা কেচে সামান্য ডালভাত বা রুটি ডাল খেয়ে কোনোরকমে কোথাও মাথাগুঁজে আসামের বিভিন্ন স্থানে মাসাধিক কাল ধরে আমরা অনুষ্ঠান করে টাকা তুললাম। কিন্তু এই চেতনা যে বাংলার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষদের জন্য আমরা অর্থসংগ্রহ করছি নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা কাউকে ভাবতেই দিত না। এত আত্মতৃপ্তি শিল্পী হিশেবে এর আগে আর কোনোদিন আমি পাইনি। সেদিন দুঃস্থ বাঙালিকে সাহায্য করতে যেভাবে আসামের মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন তা কোনোদিন ভোলার নয়,—টাকাপয়সা ছাড়া মেয়েরা তাঁদের গায়ের গহনা পর্যন্ত খুলে দিয়েছেন। যতদূর মনে পড়ে আমরা লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করেছিলাম এবং প্রচুর চাল, কাপড় ইত্যাদি। এই দলের নেতৃত্ব করেছিলেন অরুণ দাশগুপ্ত নামক এক কমরেড। তখন আসামের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন গোপীনাথ বরদৈল। মনে আছে সরোজিনী নাইডুর চিঠি নিয়ে গৌহাটিতে তাঁর সঙ্গে আমরা দেখা করতে গিয়েছিলাম এবং তিনি আমাদের সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তা রক্ষাও করেছিলেন। আসাম থেকে সংগ্রহ শেষ করে আমরা সিলেটে যাই। সম্প্রতি হেমাঙ্গদা (বিশ্বাস) বলছিলেন করিমগঞ্জে উনি সেই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন এবং মনে আছে একটি কালো ছেলে সুন্দর বাঁশি বাজিয়েছিল, তিনি এসে আলাপও করেছিলেন সে কথা আমার মনে নেই। সেই ইস্টার্ন লজের কথায় ফিরি। আগেই বলেছি হাতিবাগানে বোমার পর কলকাতা প্রায় খালি হয়ে যাচ্ছিল। বাড়িওলারা ভাড়াটাদের সাধাসাধি করত থাকার জন্য, ভাবা যায়? আমাদের মেসের মালিক আমাদের হাতে পায়ে ধরে থাকতে অনুরোধ করতেন—ভাড়া দিতে হবে না—আপনারা শুধু থাকুন, কারণ বাড়ি খালি দেখলেই মিলিটারি দখল করে নিত। আমাদের ওই লজটিতে অধিকাংশ মেডিকাল ছাত্ররা থাকত। তারা সুযোগ বুঝে মেসের খাওয়াটাও 'ফ্রি' করার জন্য মালিককে চাপ দিতে লাগল। 'না হলে আমরা সবাই দল বেঁধে চলে যাব।' বাধ্য হয়ে বেচারি তাতেও কনসেশন দিতে সম্মত হলেন। তখনকার দিনে আমার হাতে একটিই অস্ত্র ছিল 'বাঁশি'। তাই দিয়ে সহজেই আমি সকলকে জয় করে নিতে পারতাম। ওইসব দুর্দান্ত মেডিকাল ছাত্ররাও অচিরে আমার বশ হল। তখন আমি ভীষণ রোগা ছিলাম। আসাম থেকে ফেরার পর আরো এত রোগা হয়েছিলাম যে আমার হাড়পাঁজরা গোনা যেত। আমাকেই কঙ্কাল বানিয়ে সারা গায়ে খড়ির দাগ টেনেটেনে এক-একদিন ওই ছাত্ররা অ্যানাটমি পড়তে বসত। আমার মজা লাগত। হাড়পাঁজরের মেডিকাল নাম আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ইস্টার্ন লজের উলটোদিকেই ছিল লেডি ডাফরিন হাসপাতাল। ওদের মধ্যে একটি বেশ সুন্দর দেখতে ছেলে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল যে আমি যখন ঘরে বসে বাঁশি বাজাই কয়েকজন নার্স নাকি এসে ছাদে দাঁড়িয়ে শোনে। ওদের মধ্যে একটি নার্সের সঙ্গে ওর নাকি প্রেম চলছিল। তাকে ও গুল মেরেছিল যে বাঁশি ও-ই বাজায়। একদিন আমাকে বলল, 'সলিল, তোকে বাঁচাতেই হবে আমায়। আমি একটা গুল মেরে ফেলেছি হঠাৎ। তোকে শেষ রক্ষে করতেই হবে, নইলে আমার প্রেমের বারোটা বেজে যাবে।' কি করতে হবে জিজ্ঞাসা করাতে বলল, 'তুই বিছানায় বসে বাঁশি বাজাবি আর আমি জানালায় দাঁড়িয়ে একটা বাঁশিতে ঠোঁট লাগিয়ে খালি আঙুল নাড়াব।' ব্যাস এইটুকুই। বন্ধুর প্রেমের ভিত পাকা করতে রাজি হতে হল। ক-দিন ধরে চলল আমার প্লে-ব্যাকে বাঁশি বাজানো আর ওর আঙুল নাড়া। তারপর একদিন বলল, 'ব্যাস! আর দরকার নেই! কেল্লা ফতে!' বললাম, 'যদি তোকে

কোনোদিন সামনে বসে বাজাতে বলে তো কি করবি?' ও বলল—'আরে তাইতেই তো আরো ফেঁসে গেল',—বুঝলি না? আমি যে ওকে প্রেমে ফেলার জন্য বাঁশি বাজানোর অভিনয় করতাম এই কথাটা বলতেই হেসে লুটোপুটি খেতে খেতে আমার অভিনয় ক্ষমতায় ও আরো প্রেমে পড়ে গেল।' তারপর বলল, 'তোকে একদিন দেখতে চেয়েছে।' বলেই বললে—'তুমি যেন শালা ফস্টিনস্টি করতে যেও না।' দেখা দিতে যাওয়া অবশ্য কোনোদিনই হয়নি এবং জানিও না সে প্রেমের শেষ পরিণতি কি হয়েছে। এমনি কত বন্ধুর যে প্রেমপত্র লিখে দিয়েছি! তাঁদের দু-একজনের সঙ্গে এখনো দেখা হয়। বিয়ে থা করে সুখে সন্তান-সন্ততি নিয়ে তাঁরা ঘর করছেন। তাঁদের স্ত্রী-রা কোনোদিনই জানবেন না কার কলমের খোঁচায় একদিন তাঁদের প্রেমরস উত্তাল হয়েছিল।

নয়

আসাম থেকে ছাত্র সংস্কৃতিদলের সঙ্গে ফেরার পর থেকে আমার রাজনৈতিক চেতনা যে বেড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। অরুণদা দলের ডিসিপ্লিন রক্ষা করা, নিয়মিত পার্টিক্লাস করা ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। এর পর থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। মার্কসবাদ নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি, বিশেষ করে রুশবিপ্লব সম্বন্ধে তার ইতিহাস CPSU(B) এবং লেনিনের বিভিন্ন লেখা পড়ে বুঝবার চেষ্টা চলতে থাকে। এদিকে বাবার ঘন ঘন টেলিগ্রাম আসতে লাগল। যুদ্ধের নানারকম গুজব হাওয়ায় ভর দিয়ে উড়ছিল—কলকাতা নাকি শীঘ্রই জাপানিদের কবলে চলে যাবে কিংবা কলকাতা শহরকে বোমা ফেলে নিশ্চিহ্ন করা হবে অনতিবিলম্বে। একদিন তাই সব ছেড়েছুড়ে টিকিট কেটে আবার আসামযাত্রী হলাম ১৯৪৩ সালে। সেই বছরই আমার বিএ ফাইনাল দেবার কথা। বাবা-মাকে কিছুতেই বোঝানো গেল না যে কলকাতায় এখনো ভয়ের তেমন কিছু নেই। স্কুল কলেজ সবই চলছে। ফলে একটা বছর নষ্ট হল। এবার একটু পিছন ফিরি। বলছিলাম যে চেতনার বিভিন্ন স্তরে একই সঙ্গে বিভিন্নখাতে মানুষের জীবন-নদী বইতে থাকে। আমার চেতনার আর একটি খাতে কৈশোর-উত্তীর্ণ যৌবন এসে কুলকুল বইতে শুরু করল কখন আমার অজান্তে।

নারীসঙ্গ পাবার সুপ্ত ইচ্ছা ধীরে ধীরে মাথা তুলতে লাগল, পৃথিবীর রং বদলাতে লাগল আর অন্যদিকে মেয়েরা যেন নতুন চোখে আমাকে দেখতে শুরু করল। তখন আমি ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে যেতে শুরু করেছি,—গ্রাম থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করি। যৌন চেতনা যে পুরোপুরি দানা বেঁধেছে তা নয়। ষোলো সতেরো আঠারো—এ এক অদ্ভুত বয়স, যখন নারী অর্ধেক কল্পনা আর অর্ধেক মানবী হয়ে আসে। এই সময়ে দুটি ঘটনা ঘটল। একটি আমাকে দিশাহারা বিব্রত করে তুলল আর অন্যটি আমায় গাঁ ছাড়া করে কলকাতায় মেসে গিয়ে উঠতে বাধ্য করল। প্রথমটির কথা বলি।

পাশের গাঁয়ে এক বন্ধুর বাড়ি। আমি প্রায়ই আড্ডা মারতে যেতাম। গান গাইতাম, বাঁশি বাজাতাম, কবিতা আবৃত্তি করতাম। ছুটির দিন সারাদিন কাটত কখনো কখনো সেই বন্ধুর বাড়ি। বাড়িতে ছিল তার তিনটি অবিবাহিতা বিবাহযোগ্য বোন আর এক অল্প বয়সী বিধবা মাসী। শুনেছিলাম এই মাসী বিধবা হন যখন তাঁর মাত্র সতেরো বছর বয়স। যখনকার কথা বলছি তখন তাঁর বয়স হবে বড় জোর ২৫-২৬। ভীষণ ভালো পান সাজতেন এই মাসী—আতর জলে ধোয়া সুগন্ধি ছাঁচি পান। ছোটখাটো হলেও দুধে আলতা রং আর সুন্দর মিষ্টি গলা ছিল তার। গুনগুন করে কীর্তন গাইতেন। আমাকে বলতেন—'কেষ্ট ঠাকুর!' স্কুল জীবন থেকেই এ বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা। বলতে গেলে সে বাড়িরই একজন বলে আমাকে সবাই গ্রহণ করেছে। দিন দুপুর রাত-বিরেতে

আমার ছিল ও বাড়িতে অবারিত দ্বার। এক ছুটির দিনে দুপুরে গিয়ে মাসীর কাছে শুনলাম কে এক আত্মীয় মারা যাওয়ায় আমার সেই বন্ধু এবং তার বোনেরা সবাই কলকাতায় গেছে। বাড়িতে তিনি একা। চলে যাচ্ছিলাম। মাসী বললেন—'চলে যাচ্ছ কেন? আমি বুঝি তোমার কেউ নই?' বললাম, 'একি কথা বলছ মাসী?—কই দেখি তোমার ছাঁচি পান দাও, খেয়ে তবে যাব।'

মাসী বললেন, 'এখানে নয় আমার ঘরে এসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।' মাসীর ঘরে যেতেই হঠাৎ তিনি দরজাটায় খিল দিলেন। আমার একটু অবাক লাগল। খিল দিয়ে তিনি আঁচলের গিঁট খুলে একটা চিঠি বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন—'আগে বিছানায় বোসো। বোসে পড়ো।' বিছানায় বসে অবাক হয়ে চিঠি পড়তে লাগলাম। তার সম্ভাষণ হচ্ছে, 'ওগো আমার প্রাণের কেষ্ট ঠাকুর!' ওর দিকে তাকিয়ে দেখি মৃদু মৃদু হাসছেন উনি···· গোটা গোটা অক্ষরে ভুল বানানে লেখা তিন পাতা জুড়ে চিঠি। তার সবটা আমি পড়তেই পারলাম না। আমার হাত-পা তখন কাঁপতে শুরু করেছে। যেটুকু পড়লাম তার মর্মার্থ হচ্ছে আমার বাঁশি শুনে তিনি রাধা হয়ে গেছেন। আমাকে পাবার জন্য তাঁর আহার নিদ্রা সব গেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি···

কাঁপতে কাঁপতে বললাম, 'মাসী, এ সব কথার মানে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমাকে আমি মাসী বলি, শ্রদ্ধা করি···'

মাসী হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে কপালে গালে ঠোঁটে পাগলের মতো চুমো খেতে লাগলেন। থরথর করে তাঁর শরীরও তখন কাঁপছে। বিড়বিড় করছেন, 'আমার কেষ্ট ঠাকুর! আমার কেষ্ট ঠাকুর!' আমি ধাক্কা মেরে—'কি হচ্ছে কি পাগলামি?' বলে উঠে দাঁড়াতেই মাসী হঠাৎ দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'দাঁড়াও এভাবে তোমাকে যেতে দেব না। কেন আমাকে তুমি ভালোবাসবে না? কি নেই আমার উত্তর দিয়ে তবে তুমি যেতে পারবে।' এই কথা বলে একটানে তাঁর থান কাপড় আর শায়া খুলে ফেলে সম্পূর্ণ নগ্না হয়ে সামনে দাঁড়ালেন তিনি। স্বীকার করব মনে হল যেন ভেনাসের মূর্তির দেখছি। ধবধবে ফরশা রং, নিটোল স্তন আর নিতম্ব, উদ্ধত চিবুক আর খোলা চুল। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। উদ্ধত নাগিনীর মতো মাসী মৃদু হাসি ঠোঁটে লাগিয়ে একপাশে ঘাড় বেঁকিয়ে আমার অসহায় অবস্থাকে মনে হল মজা করে দেখতে লাগলেন। তাঁর চোখদুটি আমার চোখে স্থির নিবদ্ধ। আমার দম বন্ধ হয়ে এল। বোধহয় এক মিনিট কি তাও হবে না তিনি আমার একটা হাত ধরে তার স্তনে ঠেকাতেই হঠাৎ যেন আমার সম্বিৎ ফিরল। ভীষণ অশালীন অন্যায় আর গর্হিত যেন একটা কিছু ঘটতে চলেছে। আমি ওঁকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দরজার খিল খুলে ফেলতেই উনি চিৎকার করলেন—'দাঁড়াও!' শশব্যস্তে যতক্ষণে উনি নিজেকে ঢাকতে লাগলেন ততক্ষণে আমি রাস্তায় বেরিয়ে সাইকেলে উঠে বসেছি। এরপর শুরু হল কুৎসার এক কলঙ্ক। আমার বন্ধুর তিন বোনের সঙ্গেই যে আমার অবৈধ সম্পর্ক সেই কথা মাসী ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতে শুরু করলেন। ও বাড়ি যাওয়া আমার চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। পরে অনেকবার ভেবেছি কি এমন অন্যায় করেছিলেন ওই বালবিধবা আমাকে চেয়ে? কেন আমার সাহস হল না? আজ বুঝি যে রক্তেমাংসে সম্পূর্ণ বাস্তব মানবী যে নারী তা আমার কল্পনার মানবীকে ভেঙে চুরমার করেছিল বলেই আমি সেদিন ভয় এবং আঘাত পেয়েছিলাম। কিন্তু কথায় যা বলে 'a jilted woman is worse than a snake' এটা কিন্তু অনেকাংশে সত্যি! আমার জীবনে যে কতবার তার ফলভোগ করতে

হয়েছে, সে কথা কোনোদিন বলাও যাবে না লেখাও যাবে না। তা অলিখিত ইতিহাসের কিংবা আমার মনোজগতের অন্ধকার গর্ভে থেকে থেকে একদিন আমার সঙ্গেই বিলীন হয়ে যাবে। তবে একটা কথা অকপটে স্বীকার করব যে মেয়েরা আমার জীবনের গড়ে ওঠায় অনেক বেশি ভূমিকা পালন করেছে, আমাকে যা দিয়েছে নিঃস্বার্থভাবে তার এক কানাকড়িও আমি তাদের শোধ দিতে পারিনি। এবং তাদের সংখ্যা আঙুলে গুনে শেষ করা যাবে না। সাধারণভাবে আমার বিশ্বাস পুরুষদের থেকে মেয়েরা অনেক বিষয়ে অনেক ভালো। তথাকথিত নিম্নতম শ্রেণীর থেকে শুরু করে উচ্চতম শ্রেণীর মেয়েদের আমার জীবনে আনাগোনা বহু ঘটেছে, শুধু ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর নানা দেশে। কিন্তু এক জায়গায় তারা সবাই এক—মাতৃত্বে মমত্বে প্রেমে এবং স্বাধিকারবোধে অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলে হিংসায়। তবুও তাঁরা কোথায় যেন মহত্তর।

দ্বিতীয় ঘটনাটি যেটি আমাকে গ্রামছাড়া করল সেটি এত হঠাৎ নাটকীয়ভাবে ঘটেনি। ঘটেছিল ধীরে ধীরে। আমি তখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। গাঁ থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করি। একদিন সন্ধ্যায় কলেজ থেকে ফিরে এসে শুনলাম নীচের তলায় দক্ষিণদিকের ঘরে একজন ভাড়াটিয়া এসেছে। এর আগে কখনো মামার বাড়িতে ভাড়াটিয়া দেখিনি। জিজ্ঞেস করতে সেজমামা বললেন, 'না না, ভাড়াটে-ফাড়াটে নয়। বিপদে পড়ে এসেছে তাই থাকতে দিয়েছি, দুদিন পরে চলে যাবে।' জানলাম সদ্যবিবাহিত স্বামী-স্ত্রী একান্নবর্তী পরিবারে ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া হওয়ায় চলে এসেছেন। বেশ কিছুদিন তাদের অন্তত চোখের দেখা দেখার সুযোগ আমার হল না। সকালে যখন খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যাই তখন ওদের দরজা বন্ধ আবার সন্ধ্যায় যখন ফিরি তখনো দেখি দরজা বন্ধ। সেটা ঠিক কৌতূহলের বয়সও নয়। একসময় প্রায় ভুলেই গেছি বাড়িতে অভ্যাগত কেউ আছে। একদিন সকালে খেতে বসে যথারীতি চেঁচিয়ে বলছি,—'ও দিদিমা তাড়াতাড়ি খেতে দাও। ট্রেন ফেল হবে।' দেখি জংলা রং শাড়ি পরা এক সাঁওতালি মেয়ে আমার সামনে ভাতের থালা রেখে চলে গেল। কষ্টি পাথরের মতো কালো গায়ের রং, মাথা ভরতি কোঁকড়ানো চুল, পুরু ঠোঁট, সিঁথেয় টকটকে লাল সিঁদুর। কিছুদিন আগেই দিদিমা ঘাটে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। ভাবলাম হয়তো কোনো রান্নার লোক রাখা হয়েছে। চুপচাপ মুখ বুজে মহিলা যা যা দিলেন খেয়ে উঠতে যাচ্ছি মহিলা বললেন, 'আর একটু ভাত দিই? মাছের ঝাল আছে।' বললাম, 'দিদিমা কোথায়?'

'দিদিমার জ্বর। আমি রান্না করেছি। ভালো হয়নি খেতে বুঝি?' মুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁতে সেই কালো মুখে ঝিলিক লাগিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'ঠিক আছে' বলে উঠে পড়ে হাত ধুয়ে আমি দিদিমাকে দেখতে ওপরে ছুটলুম। গায়ে লেপ চাপা দিদিমা তখন কাঁপছেন। মাথায় ভিজে হাত রাখতেই দিদিমা চোখ খুললেন, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। 'খেয়েছিস?' দিদিমা মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন। আমি ঘাড় নেড়ে থার্মোমিটার তাঁর মুখে দিতে যেতেই 'হুঁ হুঁ' করে ঘাড় নেড়ে আমার হাত থেকে সেটা নিয়ে বগলে দিলেন। জ্বর উঠল ১০৫°। বাড়িতে তখন কেউ নেই। মামারা সাত সকালেই বেরিয়ে যান। ছোটমাসীর বিয়ে হয়ে গেছে। বুড়ো গেছে স্কুলে। আমার মামাতো বোনেরা দাকিদি আর মংলী গেছে মাজদিয়ায় অথচ এক্ষুনি মাথাটা ধুইয়ে দেয়া প্রয়োজন। দিদিমার ওঠার অবস্থা নেই। কি করি? বললুম, 'দিদিমা, তোমার ওই সাঁওতালি রান্নার মেয়েটাকে ডাকি? কি নাম যেন ওর?'—বলতেই শুনলুম 'খিলখিল' করে হাসি। কখন এসে ও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে দেখি মুখে কাপড় চাপা

দিয়ে ও সকৌতুকে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। দিদিমা গোঙাতে গোঙাতে বললেন, "দূর ও সাঁওতালি কেন হতে যাবে? ওই তো বলাই মিত্তিরের বউ। আমাদের বাড়ি যারা নতুন এসেছে। ভারী ভালো মেয়ে রে, কাল থেকে উঠতে তো পারিনি, ও-ই একা সারা বাড়ি সামলাচ্ছে।" দুজনে ধরাধরি করে দিদিমার মাথা ধুইয়ে দেয়া হল—তারপর আমি ডাক্তার ডাকতে ছুটলুম।

এরপর দেখতে দেখতে কদিনের মধ্যেই সেই বলাই মিত্তিরের বউ হয়ে উঠলেন আমার ভীষণ প্রিয় 'বউদি'। বোধহয় মাসখানেকও লাগল না। আমার সবকিছু ভার নিয়ে নিলেন এই বউদি। আমার পড়ার ঘরে বইপত্র গোছানো। আমার জামাকাপড় কেচে ইস্তিরি করা, আমার জন্য জলখাবার তৈরি করা, খাবার খেতে দেয়া থেকে শুরু করে বিছানা করে মাথার কাছে এক গেলাশ জল রেখে দেয়া পর্যন্ত ওই বউদি। তাঁর অন্তরের মমতার রূপ তাঁর চোখেমুখে ফুটে ওঠায় এক একসময় আমার মনে হত কি অপরূপ সুন্দরী আমার এই বউদি। নিটোল পাথরে খোদা স্বাস্থ্য আর দীর্ঘ আয়ত চোখ। এই সদাহাস্যময়ী বউদিকে না হলে আমার এক দণ্ড চলত না। 'বউদি খেতে দাও'—'বউদি কি পরে কলেজ যাব?'—'বউদি আমার কেমিস্ট্রির বইটা দেখেছ?'—'বউদি আমার আঙুল কেটে গেছে—তুমি খাইয়ে দাও'—বউদি যে কোনোদিন আমার জীবনে ছিলেন না সেকথা যেন ভাবতেই পারতাম না। এই যেমন একদিকে চলছিল অন্যদিকে আমার অলক্ষ্যে একটা সন্দেহের কালোমেঘ মাথা তুলেছিল নীচের দক্ষিণের ঘরে। মা-র বড় জ্যাঠাইমা যাঁকে আমি বড় দিদিমা বলতুম তিনি ছিলেন সেই সুকিয়া স্ট্রিটের পিসির কিছুটা স্বগোত্রীয়া। বলাই মিত্তির যখন খেটেখুটে অফিস থেকে সন্ধ্যায় ফিরতেন তখন রীতিমতো তার কান ভাঙাচ্ছিলেন তিনি—'কচি বউ, ও তো কিছু বোঝে না—ওকে সামলাও বাপ! বড্ড বাড়াবাড়ি করছে ওই বাচ্চুর সঙ্গে।' দিদিমাও আমাকে বলতেন, 'তুই একটু সামলে চল।'

একদিন সকালে কলেজ যাবার আগে ডাকাডাকি করেও বউদি আর বেরুলেন না। ঘরের আগল বন্ধ রইল। দিদিমা আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'খবরদার তুই আর ওর সঙ্গে মিশবি না। কাল রাত্রে বলাই মিত্তির প্রচণ্ড মার মেরেছে ওকে।' আমি 'থ' হয়ে গেলুম। চুপচাপ দিদিমার দেয়া ভাত খেয়ে কলেজ চলে গেলুম। সারাদিন মনটা বিষণ্ণ হয়ে রইল। কেবল মনে প্রশ্ন উঠতে লাগল 'কেন? কেন এমন হল? কেন বউদিকে মারল ওই বলাই মিত্তির?' সন্ধ্যায় ফিরে এসে দেখি তখনো দরজা বন্ধ বউদির ঘরের। শুনলাম সারাদিন নাকি বিছানা থেকে উঠতে পারেনি। এমন মার মেরেছে—ঠোঁট এমন কেটেছে যে কিছু খেতে পর্যন্ত পারছে না। তবু দিদিমা জোর করে একটু দুধ খাইয়েছেন। নিষ্ফল রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলতে লাগল। কিন্তু কি করব? পড়ার ঘরে বইপত্র ছড়ানো, বিছানার মশারি যেমন তেমনি ফেলা রয়েছে! আমি চাঁপা ফুল ভালোবাসি বলে বউদি রোজ একটা করমচার ডালের কাঁটায় গেঁথে গেঁথে আমার পড়ার টেবিলে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখতেন। সেটা শুকিয়ে পড়ে আছে। একটা হাতের স্পর্শের অভাবে যে জীবনটা হঠাৎ মরুভূমি হয়ে যেতে পারে, সেই প্রথম বুঝলুম। অনেক ভেবেচিন্তে দেখলুম যে বলাই মিত্তিরের হাত থেকে বউদিকে বাঁচাবার কোনো সাধ্যই আমার নেই। ঠিক করলুম চলে যাব। রাত্রে ছাদে পায়চারি করতে করতে ভাবছি, দেখি আস্তে আস্তে বউদি এসে দাঁড়ালেন। কাছে আসতেই আমার হাত দুটো ধরে চোখের দিকে তাকালেন। ঠোঁটটা কেটে বিশ্রী রকম ফুলে উঠেছে। কপালের ডানপাশে

রক্তজমাট হয়ে আছে। চোখ ছাপিয়ে জলের ধারা নেমেছে। আমার ইচ্ছে হল এখুনি গিয়ে ওই বলাই মিত্তিরটাকে খুন করি। আমার কান্না পেল। বললাম, 'বউদি, সব আমার দোষ। আমার জন্যই তোমার এই দুর্গতি। আমি কাল চলে যাব।' বউদি দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়লেন, 'না তুমি যাবে না। এটা তোমাদের বাড়ি। তুমি কেন যাবে? গেলে ওই শয়তান···মানে আমরা যাব।'

তারপর খানিক চুপ করে থেকে চোখের দিকে তাকিয়ে আমাকে বুকের কাছে টেনে সেই চিরন্তন প্রশ্ন—'আচ্ছা তুমি কি কিছু বুঝতে পার না?' তারপর হঠাৎ কণ্ঠস্বর বদলে বললেন, 'তুমি যদি যাও তো আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো—আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি সারা জীবন তোমার দাসী হয়ে থাকব। আমি তোমাকে ছেড়ে বাঁচব না।' 'ছি ছি বউদি, এ তুমি কি বলছ!' বলে শান্ত করতে যাচ্ছি, এমন সময় চিৎকার এল—'লম্পট মাগী!' চমকে উঠলাম। বলাই মিত্তির ছুটে এসে বউদির চুলের মুঠি ধরে মারতে শুরু করল ঘুসি কিল, লাথি, আর অকথ্য গালাগালি। আমি সহ্য করতে না পেরে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে আমার ব্যায়াম করার মুগুরটা তুলে মারতে যেতেই বউদি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 'না না'—ততক্ষণে সেজমামা দিদিমা সবাই ছাদে এসে গেছেন।'চল নীচে চল'—বলে সেজমামা আমার হাত ধরলেন। তারপর বলাই মিত্তিরকে বললেন—'এ সব ছোটলোকমি আমার বাড়িতে চলবে না। কালই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। আমি যেন সকালে উঠে তোমার মুখ দেখেতে না পাই।'

বলাই মিত্তিরের চলে যাওয়া দেখার জন্য অপেক্ষা না করেই আমি ভোর ছটার ট্রেনে দিদিমাকে বলে একটা বাক্স গুছিয়ে কলকাতা রওনা দিলাম। দাদা একটা মেসে ডাক্তারি পড়ছিলেন। সেই 'ইলিসিয়াম বোর্ডিং'-এ এসে আমি দাদার রুমমেট হলাম।

বলাই মিত্তির আজ আর বেঁচে নেই। শুনেছি বলাই মিত্তিরের বউ পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়ে ছেলেমেয়েদের বিয়ে থা দিয়ে নাতিপুতি নিয়ে দুগ্ধ ধবল পক্ক কেশে সুখে দিনযাপন করছেন। [বলাই মিত্তির আসল নাম নয়।—স]

কলকাতার মেসে এসে থাকাকালীন এত বছর পরে আবার সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে একদিন দাদার সঙ্গে গেলাম। আমার আগেই কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে এসে দাদা সুকিয়া স্ট্রিটের বউদিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন নিয়মিত। একদিন আমাকে বললেন, 'চল তোকে বউদি ডেকেছে।' সেই কত ছোটবেলায় দেখা আমার সেই অসামান্যা রূপসী বউদি, সেই ছোড়দা আর তার মিলন পরিষদ অর্কেস্ট্রা, ছোট ছোট ভাইঝি-ভাইপো সোনা, বাবু, শান্তি, সেই খ্যাঁক খেঁকে বুড়ী, রাশভারী বড়দা—সব যেন চোখের সামনে নতুন করে ভেসে উঠল। দেখতে দেখতে প্রায় এক যুগ পার হয়ে গেছে, কত কিছু বদলে গেছে। দাদার কাছে শুনলাম, সে বুড়ী পটল তুলেছে, মিলন পরিষদ কবে উঠে গেছে, ছোড়দা পাগল হয়ে গেছেন, কি এক দুরারোগ্য রোগে বড়দা শয্যাশায়ী, আরো দুটি ভাইপো এসেছে—কমি আর দেবী, তাদের আমি দেখিনি তখনো। দারিদ্র্যের ছায়া নেমেছে। একা বউদি সংসার নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন, শরীরও ভালো থাকে না। ভাবলাম, যা ছোটবেলায় স্মৃতি হয়ে মানসপটে আঁকা আছে তাই থাক। সেই ফ্রেম খুলে আর নতুন ছবি ঢোকাব না।

বললাম, 'না দাদা, আমি যাব না।' দাদা বোঝালেন, 'ডেকেছেন যখন না গেলে

খারাপ দেখাবে, চল।' গেলাম। না গেলে যে আমার জীবনের একটি দিক অপূর্ণই থেকে যেত আজ তা বুঝতে পারি।

ভাইপোরা তখন সব বড় হয়ে স্কুলে কলেজে পড়ছে। আমার সেই ছোট্ট ভাইঝি সোনা কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিয়েছে। মা-র মতো না হলেও দেখতে ভারী মিষ্টি হয়েছে। সেই কম্বুকণ্ঠ রাশভারী বড়দার গলা দিয়ে ক্ষীণ চিঁচি করে আওয়াজ বেরোচ্ছে। বিছানায় আমায় কাছে ডাকলেন, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মনে আছে তুই খেতে বসেছিলি আর তোকে আমি মুখে লাথি মেরেছিলুম? তুই খাওয়া ফেলে কাঁদতে কাঁদতে উঠে চলে গেলি? এক এক সময় ভাবি সেই পাপে আমার আজ এই অবস্থা।' আমি প্রতিবাদ করলুম, 'ছি ছি বড়দা। ছোটভাই অন্যায় করলে বড়ভাই শাসন করবে তাতে পাপপুণ্যের কথা উঠছে কোথা থেকে?'

বউদি বললেন, 'দেখো না, মাঝে মধ্যেই ওই কথা বলে। তাই তো তোকে ডেকে পাঠালুম।'

বললাম, 'বিশ্বাস করো বড়দা, ছোটবেলার অনেক কথার মতো সেদিনের কথাটাও আমার মনে আছে বটে, কিন্তু তার জন্য আমার মনের কোণে কোথাও কোনো ক্ষোভ বা আক্রোশের লেশমাত্র নেই।'

বড়দার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, আমার মাথায় হাত রাখলেন একবার, তার ওইটুকু কথা বলার ক্লান্তিতেই ঘুমিয়ে পড়লেন। বউদি ইশারা করে পাশের ঘরে ডাকলেন। বউদির সে রূপ কোথায় চলে গেছে। সেই দুধে-আলতা রং মুখের আকাশে যেন ধূসর মেঘ জমেছে, সেই পাতা-কাটা চুল উঠে গিয়ে অযত্নে জড়ো-করা ছোট একটা খোঁপায় পরিণত হয়েছে, তন্বী শরীর আজ মেদে ভারাক্রান্ত, কেবল সেই অসাধারণ খিলখিল হাসিটি যেন কি করে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বউদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানতে চাইলেন। তারপর বললেন 'বাঁশিটি আনিসনি কেন? শুনেছি নাকি দারুণ বাজাস?'

তারপর হারমোনিয়ম এল। দেখলাম এ বাড়ির রক্তে সেই গানের নেশাটা এখনো বুঁদ হয়ে আছে। ভাইঝি-ভাইপোরা সবাই গান করতে পারে, অবিকল সুর তুলতে পারে, নতুন কি কি ভালো গান বেরোল তার খবর রাখে। বউদি তো চিরকালই গান পাগল, নিজে না চর্চা করলেও এতটুকু খুঁত হলে তাঁর কানে বাজত। ভাইঝি-ভাইপোরা ঘিরে বসল, 'ছোটকা গান করো।' ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলল গান। আমাদের গাঁয়ের সেই সুরাসক্ত সুররসিক গান-পাগল যুবকটির কল্যাণে রেকর্ড থেকে শুনে তোলা তখনকার বহু জনপ্রিয় গান আমার মুখস্থ ছিল। সেই সব গান একের পর এক চলতে লাগল। বউদি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ছেলেদের বললেন, 'শেখো, গান কি করে গাইতে হয়, কি করে ভাব ফোটাতে হয় শেখো। শুধু সুরটা ঠিকমতো তুললেই হয় না।'

এরপর থেকে একদিন বউদির কাছে না গেলে আর আমার চলত না। না গেলে আবার বউদি ভাইঝি-ভাইপোদের অভিযোগ উঠত, 'কেন তুমি কাল আসনি?' তখনকার দিনে প্রতি রবিবার পঙ্কজ মল্লিকের 'সংগীত শিক্ষার আসর' বসত রেডিওতে। সেই গানগুলি শিখে আমি অবিকল পঙ্কজ মল্লিকের স্টাইলে গেয়ে শুনিয়ে বউদিকে তাক লাগিয়ে দিতাম। বউদির অকুণ্ঠ প্রশংসা পাওয়া আমার কাছে ছিল পরম সৌভাগ্যের মতো। সহজে তিনি কাউকে প্রশংসা করতে চাইতেন না। তখনকার দিনের বেশ কিছু জনপ্রিয় চটুল গান বউদি বরদাস্ত করতে পারতেন না—'ছিঃ, ওগুলো আবার গান নাকি?'—বলে নাক সিঁটকোতেন।

ছোড়দার বন্ধুরা মাঝেমধ্যে বউদির খোঁজ খবর নিতে আসতেন। একদিন গিয়ে দেখি উপীনদা আর গজাদা ঘরে বসে। উপীনদা ছোড়দার অর্কেস্ট্রায় বেহালা বাজাতেন। ছোড়দার বন্ধুদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন এই উপীনদা, জানি না আজও বেঁচে আছেন কিনা। একমাত্র গজাদাই ছিলেন যিনি গানবাজনা করতেন না, বলতেন—'সবাই বাজালে শুনবে কে?' গজাদার ছিল ইলেকট্রিকের ব্যবসা। ওই সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ির সিঁড়ির নীচের ঘরটায় ছিল তাঁর দোকান, যতদূর জানি এখনো আছে সে দোকান, অন্তত বছর দুয়েক আগেও ছিল।

সে যাই হোক, আমাকে দেখে উপীনদা এবং গজাদা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে 'ককপুল' না?"

এই 'ককপুল'-এর গল্পটা বলি। ছোটবেলায় প্রথম যখন সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে থেকে পড়তে আসি তার আগে আমি দক্ষিণ বারাসতে দুবছর বাংলা স্কুলে পড়েছিলাম। সেখানে ইংরেজি পড়ানো হত না। বাড়িতে মাস্টার রেখে ইংরেজি শেখানোর চেষ্টা হত সে কথা আগেই বলেছি। ক্যালকাটা অ্যাকাডেমিতেই আমি প্রথম ইংরেজি পড়া শুরু করি। কিন্তু ঘরে পড়ে 'K'-তে উচ্চারণ 'ক', 'B'-তে 'ব', 'S'-এ 'স', 'L'-এ 'ল' বা But বাট্ Put পুট ইত্যাদিও জানতাম, প্যারীমোহনের ফার্স্ট বুকও গড়গড় করে মুখস্থ বলতে পারতাম। কিন্তু যখন কোনো নামের প্রথম অক্ষর initial হিশেবে ব্যবহার হয় তার উচ্চারণ কি করে করতে হয় তা জানতাম না। ছোড়দার ঘরে একটা ইংরেজি ক্যালেন্ডার ছিল—কোম্পানির নামটা লেখা ছিল বড় বড় করে। উপীনদা বললেন, 'পড় তো দেখি কতদূর ইংরেজি শিখেছিস।' দেখলাম লেখা আছে K. K. Paul—K-তে ক হয় জানা আছে, কিন্তু Paul-টা আমাকে বিব্রত করল, ওটা 'পাউল' হবে না 'পুল'। শেষ অবধি 'পুল'-কেই সাব্যস্ত করে নিয়ে পড়লাম, 'ক· ক· পুল'। বাস্! ঘরেতে হাসির ঝড় উঠল। সেই থেকে ছোড়দার বন্ধুদের কাছে আমার নাম হয়ে গেল 'ককপুল'। এত বছর পরে আবার উপীনদার মুখে শুনলুম, 'আরে ককপুল না? কি খবর?' তারপর বউদির কাছে সব শুনে বললেন, 'বলো কি! ককপুল কলেজে পড়ছে? সেই ক্যারাম কমপিটিশন মনে পড়ে তোর?' ছোড়দাদের ক্লাবে একটা ক্যারামবোর্ড ছিল। উপীনদা খুব ভালো খেলতেন, অনেক ম্যাচে জিতেছিলেন। ওঁর কাছে অভ্যাস করে আমিও বেশ ভালো খেলোয়াড় হয়ে উঠলুম। উপীনদা ছাড়া ছোড়দার সব বন্ধুদের আমি হারিয়ে দিতুম। একেবার জুনিয়র ক্যারাম কমপিটিশনে উপীনদা আমার নাম দিয়ে দিলেন। ফাইনাল অবধি বেশ সহজে উঠলুম। ফাইনালে দেখি একটি অন্তত ১৩-১৪ বছরের ছেলে, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। বয়ঃসীমা ছিল ১২ বছর। আমার তখন বয়স ছয়। উপীনদা প্রতিবাদ করেও লাভ হল না। আমি অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে খেলা শুরু করলুম। প্রথমটায় সামান্য তফাতে জিতে দ্বিতীয়টায় হারলুম—যাকে বলে গো-হারান। তৃতীয়টায় এমন হাত কাঁপতে লাগল যে সোজা ঘুঁটি অবধি পকেট করতে পারলুম না। আবার হারলুম। তারপরই হঠাৎ 'ভ্যাঁ' করে কেঁদে ফেললুম। সে কান্না আর থামে না! উপীনদা লজেন্স কিনে দিলেন, কোলে করে অনেক আদর করলেন, বোঝালেন, কিন্তু হারার লজ্জায় আমার কান্নার বেগ আর যেন বাধা মানতে চায় না। শেষ অবধি যখন বাড়ি এলুম তখনো ফোঁপাচ্ছি। উপীনদা সেই গল্প বললেন—'ক্যারামে হেরে ককপুলের সে কি কান্না! সেই ককপুল কলেজে পড়ছে?'

এই উপীনদার সঙ্গে অনেক বছর পরে একবার ওই সুকিয়া স্ট্রিটেই দেখা হয়েছিল।

তখন আমি বোম্বের প্রতিষ্ঠিত সংগীত পরিচালক। বয়সের ভারে উপীনদা তখন ভেঙে পড়েছেন, বুকে জড়িয়ে হেসে বলেছিলেন, 'তা তোর যতই নাম হোক না কেন, আমার কাছে তুই সেই 'ককপুল'ই থাকবি।' সেই শেষ দেখা।

আমার সংগীত জীবনে বউদির উৎসাহ আমাকে প্রচুর প্রেরণা জুগিয়েছে। গ্রাম ছেড়ে এসে কলকাতার মেসে থাকাকালীনই 'প্রান্তরের গান আমার' গানটির কথা-সুর মাথায় আসে। অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় গানটি বহুদিন আমার বিস্মৃতির আড়ালে চলে গিয়েছিল। গানটির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল আমাদের গাঁয়ের রঘুদা (এমন আমার ভগ্নীপতি রঘুনাথ চক্রবর্তী)। তখন শেষটুকু রচিত হয়। রেকর্ড হবার আগে এই সম্পূর্ণ গানটির প্রথম শ্রোতা ছিলেন আমার বউদি। কি অকুণ্ঠ প্রশংসা আর আশীর্বাদ যে করেছিলেন! বউদির কাছে নিয়মিত যাতায়াতে একদিন ছেদ পড়ল। তখন আমি রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেছি। তার আগেও মাঝে মধ্যেই ছেদ পড়ত, কারণ একটানা দীর্ঘদিন কলকাতায় থাকলে আমি হাঁপিয়ে উঠতুম। মেস ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ হঠাৎই দিদিমার কাছে চলে যেতুম। বেশ কিছুদিন পরে আবার যখন হঠাৎ একদিন বউদির কাছে উদয় হতুম বউদির প্রথম কথাই হত, 'নতুন কি কি গান করলি শোনা।' মনে আছে 'গাঁয়ের বধূ' রেকর্ড যখন বের হয় তার আগে বহুদিন আমার বউদির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। আমার জগৎ তখন গণনাট্যময়, বেপাত্তা যাযাবর জীবন অন্য এক তন্ময়তা অন্য এক স্বপ্ন আমার এতদিনের চেনা জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আমাকে যত্রতত্র ঘুরিয়ে মারত। সেই সময়ে শুধু নিজের জন্য যে গানটি লিখেছিলাম, অনেক বছর পরে প্রয়াত শিল্পী শচীন গুপ্ত রেকর্ড করেছিলেন, আরো অনেক পরে লতা রেকর্ড করেছিল। আমার তখনকার রোমান্টিক মানসিকতা এতে ধরা আছে। গানটি ছিল :

এবার আমি আমার থেকে
আমাকে বাদ দিয়ে
অনেক কিছু জীবনে যোগ দিলাম,
ছোট যত আপন ছিল
বাহির করে দিয়ে
ভুবনটারে আপন করে নিলাম।
যখন যেখানে তখন সেখানে থাকি।
সুনীল আকাশে নিজের মাথারে ঢাকি
ঘরে ঘরে জননী ভাই ভগিনী পেলাম।...ইত্যাদি।

গণনাট্য আন্দোলনের একেবারে অন্তরঙ্গে অন্তঃস্থলে থাকাকালীনও এমনি বহু গান আমি লিখতাম যেগুলি ছিল আমার ব্যক্তিগত গান—অর্থাৎ গণসংগীত নয়, অথচ গণ-আন্দোলনে লিপ্ত ছিলাম বলেই বোধহয় সেসব গান লেখা সম্ভব হয়েছিল। যেমন 'ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা', কিংবা 'পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি', অথবা 'শ্যামলবরণী ওগো কন্যা' বা :

জানি না জানি না কোন
সাগরের ঢেউ এসে
আমার হৃদয়ে লেগেছে
আমি অন্তহীন কার অন্তরের
ডাক শুনতে পাই তাই আনমনা

কোন মৃত্যুহীন গান যৌবনের
কোন দুর্নিবার কবি কল্পনা

রেকর্ড হিশেবে বেরোবার বহু আগেই এসব গান রচিত হয়েছিল। গণনাট্যের যুগে রেডিও গ্রামোফোন কোম্পানির দরজা আমাদের জন্য ছিল বন্ধ। আমার গান যে কোনোদিন রেকর্ড হয়ে বেরোতে পারে সে কল্পনাও তখন ছিল না, অথচ গণনাট্য প্ল্যাটফর্মে এসব গান গাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠত না। তাই শুধু নিজেকে প্রকাশ করার তাগিদে, অন্য এক সুরের জগতের চাবি খোলার তাগিদে এমনিভাবে রচিত অনেক গান হারিয়েও গেছে। এইসব গানের শ্রোতা ছিলেন আমার বউদি। বউদির মুখ দেখলেই বুঝতে পারতাম কোন গানটা উতরেছে। বউদিই বলতেন, 'এসব গান যদি ভালো শিল্পীর কণ্ঠে রেকর্ড হয়ে কোনোদিন বেরোয় তো বাংলা গানের একটা নতুন দিক খুলে যাবে।' আমার নিজের ওপর অতটা আস্থা ছিল না, ভাবতাম বউদি আমাকে বড্ড বেশি ভালোবাসেন বলেই ওইসব কথা বলেন। অবশ্য বউদি তাঁর জীবদ্দশাতেই দেখে গেছেন, শুনে গেছেন হেমন্তদার গাওয়া, লতার গাওয়া এবং অন্যান্য শিল্পীর গাওয়া অনেক গান রেকর্ড হয়ে বেরোতে। তাঁর ছিল গর্ব যে বাংলা/আধুনিক গানের জগতে আমার অনুপ্রবেশের মূলে তাঁর ছিল অনেক অবদান। 'গাঁয়ের বধূ' বেরোবার পর চারিদিকে যখন বেশ হইচই, বহুদিন পর সেই সময় একদিন বউদির কাছে গিয়ে হাজির। সেই আমার প্রথম আধুনিক বাংলা গানের রেকর্ড। বউদির আত্মীয়স্বজন এমনকী ছোড়দার বন্ধুরাও অনেকে বিশ্বাস করেননি যে বউদির দেওর সলিল চৌধুরী আর 'গাঁয়ের বধূ'র সুরকার গীতিকার সলিল চৌধুরী একই ব্যক্তি। বউদি বাজি ফেলেছিলেন একশো টাকা। বলেছিলেন, 'ওর গানের নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি। এ ও ছাড়া আর কারো হতে পারে না।' আমি যেতেই বউদি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই তে বাচু। বলতো গাঁয়ের বধূ তোর কিনা?' আমি একটু ঠাট্টাচ্ছলে যেন আকাশ থেকে পড়লুম, 'গাঁয়ের বধূ! কোন গাঁয়ের বধূ?' বউদির মুখটা যেন নিভে গেল, 'সেকি? তোর লেখা সুর নয় গাঁয়ের বধূর? এত বড় ভুল হল আমার?'

সোনা বলল, 'মা একশো টাকা বাজি ফেলেছে।' বললাম, 'সত্যি?' তারপর বউদির দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললাম, 'তাহলে তোর মা জিতে গেছে।' বউদি কাছে এসে আমার কান ধরে বললেন, 'হতভাগা, তোর চেয়ে আমি তোকে ভালো করে চিনি। আমার সঙ্গে ঠাট্টা?' বউদির সে কি আনন্দ!

সেই বউদি আজ কত বছর হল চলে গেছেন। আমি তখন বোম্বেতে দাদার চিঠি পেলাম—'বউদি নেই!' বড়দা তো অনেক আগেই গেছেন। ছেলেরা সব বিয়ে থা করে চাকরিবাকরি করছে। সোনার বিয়ে হয়ে মা হয়েছে কতদিন হয়ে গেল। বিয়ের পর আর দেখিওনি। যে যার নিজের বৃত্তে ঘুরছে, আমিও যেমন ঘুরছি পিছন ফেরার মওকাও তো জীবনের ঊর্ধ্বশ্বাস যাত্রায় কমই ঘটে। 'প্রতিক্ষণ'-এর তাগিদের গুঁতো না থাকলে এসব কথা অন্ধকারের গর্ভেই চিরকালের জন্য থেকে যেত। অবশ্য বেরিয়েও যে কারো কোনো লাভ হবে সে কথা নয়। তবু নিজেকে নতুন করে একবার যাচাই করার ছুতো তো পেলাম, আর পেলাম সেই সব ভালোবাসার মানুষ যারা শুধু দিয়েইছে, নেয়নি কিছুই, তাদের স্মরণ করে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ। এমনি কত মানুষের কাছে আমি যে কতভাবে ঋণী—যাদের প্রত্যয় আমাকে শক্তি জুগিয়েছে, আমার নিজের ক্ষমতার ওপর আমার চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাস দেখিয়ে উজাড়-করা ভালোবাসা দিয়ে

যারা আমার মতো সাধারণ এক নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলেকে স্বর্গের সিঁড়ি চড়তে সাহস দিয়েছে—এমনি কত যে মানুষ, বিশেষ করে মেয়েরা, তাদের অনেকেরই কথাই লিপিবদ্ধ করা যাবে না, তবু এই সুযোগে মনের ক্যালিডোস্কোপে তাদের আর একবার দেখে দুফোঁটা চোখের জল তো ফেলতে পারলাম, তাই-বা কম কথা কী?

১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি এক সময় বাবার টেলিগ্রাম পেয়ে আসাম চলে গেলাম। সে কথা বলেছি আগেই। সঙ্গে নিলাম বেশ কিছু কমিউনিস্ট লিটারেচার। ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পড়তাম কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, অরিজিন অব সোসাইটি, ইলিউশন এন্ড রিয়ালিটি, সি পি এস ইউ (বি), হাউ টু বি এ গুড কমিউনিস্ট ইত্যাদি সব বই। অর্ধেক বুঝতাম, অর্ধেক বুঝতাম না। তবু বারবার পড়তাম। এই সময় আমি কথা বলতাম খুব কম। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় গানবাজনার আসরেও ওইসব রেকর্ডের গান যা আগে গেয়ে আসর মাত করতাম, সেগুলি গাইতেও আর প্রবৃত্তি হত না। একটা Metamorphosis বোধহয় তখন থেকেই শুরু হয়েছিল। যখন পড়তাম না, হয় সিম্‌ফনি শুনতাম, নয়তো চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা চলে যেতাম মিকির পাহাড়ে। ওখানে একটা বিশাল হ্রদ ছিল। তার পাশে বসে থাকতাম। দেখতাম বুনো হাঁসের আর পানকৌড়ি মাছরাঙার ব্যালে নাচ। কখনো কখনো আরো ভিতরে যেখানে ছিল পাহাড়ের গায়ে একটা প্রাগৈতিহাসিক গুহা—সেখানে চলে যেতাম। ভিতরে হত অসাধারণ প্রতিধ্বনি, একবার 'আঃ' করলে শব্দটা চলত এক মিনিটেরও অধিককাল ধরে। একদিন ওর মধ্যে বাঁশি বাজিয়ে দেখি এক অসাধারণ কাণ্ড। সুরের পর সুরের লহরি একে অন্যের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে এক অভাবনীয় মায়াজাল বুনছে যা ছিল অবিশ্বাস্য। তখনো জানতাম না যে ওই সুর পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে চলে যায়। ওই পাহাড়ের মাথায় ছিল একটা পরিত্যক্ত মন্দির। সেখানে যাবার কোনো রাস্তা ছিল না। শুনেছিলাম একবার ভূমিকম্প হয়ে পাহাড়টা ফেটে দুখানা হয়ে গিয়ে মন্দিরটাকে দুরধিগম্য করে তুলেছিল। তবুও মাঝেমধ্যে নাকি কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ লোকে শুনেছে।

গুজব রটল যে ওই মন্দির থেকে নাকি বাঁশির আওয়াজ শোনা যায় ভরদুপুর বেলায়। শ্রীকৃষ্ণ মন্দির তো—শ্রীকৃষ্ণ নিজে বাঁশি বাজান। আমার খুব মজা লাগল। আমি যে ওদিকে যেতাম তা আমার মাও জানতেন না। কেননা নানা বন্যজন্তুর আস্তানা ছিল ওই পাহাড়ি জঙ্গল আর হ্রদ। তবে হ্রদের পুবদিকে আমি একমাত্র বানর আর উল্লুক ছাড়া অন্য কোনো জন্তু দেখিনি। দেখেছিলাম প্রায় সিকি মাইল দূরে পশ্চিম পাড়ে হাতির পালকে জলে নামতে দু-একবার। এই হ্রদ থেকেই একটা ঝরনা বেরিয়ে আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে পঞ্চাশ গজ দূর দিয়ে কুলকুল করে বয়ে যেত। ছোট ছোট তেচোখা মাছ উজানে সাঁতার কাটত। এই জলকেই বেঁধে পাইপ বসিয়ে একটা হাইড্রলিক পাম্পের মতো ব্যবস্থা করে চা-ফ্যাক্টরি এবং ম্যানেজার সাহেবের বাংলোতে জল যেত। জলের চাপে একটা লিভার উঠে আবার নেমে আসত। সারা দিনরাত ধরে শব্দ হত— 'ঠক ঠকাস' 'ঠক ঠকাস'। কুলিরা বলত, 'ঠকঠকি'। (বছর পাঁচেক আগে গিয়ে দেখি সেই ঠকঠকি এখনো আছে)। এই ঠকঠকির উৎস সন্ধানে বেরিয়েই প্রথম আমি ওই হ্রদটার দেখা পাই। পাহাড়ের কোলে অরণ্যাবৃত সেই হ্রদ যে কি অপরূপ সুন্দর তা না দেখলে বলে বোঝানো যাবে না। বিশাল বিশাল গাছের ছায়া তার বুকে পড়েছে, মধ্যে আকাশ আর একদিকে সবুজ পাহাড়ের প্রতিবিম্ব। পাহাড়ি ঝিঁঝি-র ডাক চলছে সমানে—যেন

কারখানা চলছে। মাঝেমধ্যে কয়েক সেকেন্ডের বিরতি, তারপর আবার শুরু। এই কয়েক সেকেন্ডের বিরতির সময় বুঝতে পারতাম Pure Silence কাকে বলে। নিজের নিশ্বাস, বুকের ঢিপঢিপ সব যেন শুনতে পেতাম—ভয় করত। আবার যখন শুরু হত 'ঝিং কিড়িকিড়ি' 'ঝিং কিড়িকিড়ি' মনে হত যেন সঙ্গী পেলাম। বাবা-মা দুজনেই আমার সম্বন্ধে চিন্তিত বুঝতে পারতাম। একদিন মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর কি হয়েছে রে বাচু? চুপচাপ থাকিস, একা একা ঘুরে বেড়াস, নয়তো মুখে বই গুঁজে পড়ে থাকিস, কি হয়েছে রে?'

বললাম, 'কিছু না তো মা। কেন বাবা কিছু বলেছেন?'

মা বললেন, 'উনিই তো আমাকে বললেন, জিজ্ঞেস করো বাচুর কি হয়েছে। পরীক্ষা দিতে পারেনি বলে কি মন খারাপ?'

বললাম, 'না মা। পরীক্ষা দিয়ে আর কি হাত পা গজাবে? চাকরি তো আমি জীবনে করব না। কাজেই শুধু তোমরা চাও বলেই পরীক্ষা দেয়া, অন্য কিছু না।'

মা বললেন, 'ওঁকে যেন এসব বলিসনি। তোদের মুখ চেয়ে কত কষ্ট করছেন, কত আশা ওঁর তোরা বড় হবি, ভালো হবি...'

বড় হওয়া ভালো হওয়া কাকে বলে? ওই ঘানিতে জুতে যাওয়া? এ কথা আর মাকে বললাম না। শুধু বললাম, 'ঠিক আছে মা। বাবাকে বোলো আমার জন্য যেন চিন্তা না করেন।' বলে উঠে গেলাম।

এই সময় একটা কাণ্ড ঘটল। একদিন আমি সেই হ্রদের ধারে এসে বসেছি। হঠাৎ দেখি এক জায়গায় একটা শাড়ি ব্লাউজ গলার হার পুঁথির মালা আর তার অল্প কিছু দূরেই পড়ে আছে কয়েকটা রঙিন কাচের চুড়ি। ভাবছি এগুলো কার, কোথা থেকে এল? চারদিক তাকিয়ে জনমানবের কোনো চিহ্ন দেখলাম না। ভাবছি কি ভুতুড়ে কাণ্ড। বাবারে হঠাৎ ভুস করে একটা শব্দ হল! চেয়ে দেখি হ্রদের জলে একটি নারীর মাথা ভেসে উঠল। গাজর রঙের চুল, আর শালগমের মতো শাদা এক মুখ। আমি একটা গাছের আড়ালে চলে গেলাম। তারপর সেই মাথার আধিকারিণী সাঁতরে এসে পাড়ে উঠল—সম্পূর্ণ নগ্না। মনে হল যেন কোনো জলপরী। নির্বিকারভাবে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা গামছা দিয়ে চুল ঝাড়তে লাগল—দুটি নিটোল স্তন ঝাঁকুনির তালে তালে দুলতে লাগল। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। তারপর শাড়ি পরতে শুরু করে হঠাৎ যে গাছের ফাঁকে আমি ছিলাম সেদিকে তাকাল। আমার পা দুটো নিশ্চয় দেখা যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি শাড়ি দিয়ে গা-টা ঢেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কৌন? কৌন বটে উখানেরে?' বলে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। গাছের ফাঁক দিয়ে রোদের আলোটা তার মুখে পড়ল। আমি চিনতে পারলাম। এ সেই আমাদের বেহুলা সুখিয়া। কাছে এসে আমাকে দেখে ও যেন হকচকিয়ে গেল। বলল, 'ডাক্তারবাবুর বেটা নারে? ইখানে কি করছিস বটে?'

আমার মুখ থেকে বেরোল 'তুই বেহুলা না? সুখিয়া না?' বলল, 'হঁ! আর তুতো হামার নখিন্দর, তাই না বটে?' বলে কুলকুল করে হেসে হাওয়া লাগা গাছের মতো দুলতে লাগল। ধপধপে ফরশা ভিজে গায়ের ওপর শাড়িটা চেপে বসেছে। আমার শরীরটা যেন অবশ হয়ে এল। ওর হাতটা ধরে কাছে টানতেই ও বলল, 'তু ইখানে বোস, হামি আসছি'— বলে হাত ছাড়িয়ে আড়ালে চলে গেল। খানিক পরে ফিরে এল গুছিয়ে শাড়ি ব্লাউজ পরে, সামনে এসে বসল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলল, 'তু কত বড়টা

হইছিস কত সোন্দর হইছিস'— বলে আমার হাত দুটো ধরে ওর কোলের ওপর রাখল। তারপর চোখ বড় করে গম্ভীরভাবে বলল, 'সাবধান থাকবি বাবু! বাগানের ছুকরিরা তুকে ছিঁড়ে খাবেক' বলে আমার গায়ের ওপর ঢলে পড়ে সেই কুলকুল হাসি। আমি আর থাকতে পারলাম না। ওকে দু-হাতে জড়িয়ে বুকে টানতেই ও সমর্পণ করল। তারপর ক্ষুধার্তের মতো আমার ঠোঁট দুটো ওর মুখের মধ্যে টেনে নিল আমাকে দু-হাতে জড়িয়ে।

কয়েক মুহূর্ত—তারপর ওর নজরে পড়ল আমার বাঁশি। নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে একবার আমার দিকে, একবার বাঁশির দিকে তাকাল। তাকিয়ে বলল, 'ইটা বানসুরি না? তু বাজাস বটে?' ঘাড় নাড়লাম। তারপর যেন ভীষণ অবিশ্বাস্য একটা প্রশ্ন করছে সেই সুরে বলল, 'আজ ভি তু বাজাইলি বটে?' আবার ঘাড় নাড়লাম। ও সন্দেহভরা চোখে তাকিয়ে বলল, 'বাজা তো শুনি।'

আমি বললাম, 'এখানে নয়। আমার সঙ্গে চল, তোকে শোনাব বাঁশি'— বলে সেই গুহার দিকে হাত ধরে ওকে নিয়ে গেলাম। তারপর গুহাতে বসে খানিকক্ষণ বাজাতেই ও যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল ও যেন ভূত দেখছে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে পিছনে সরতে লাগল। আমি বন্ধ করলাম বাঁশি। বললাম, 'সুখিয়া! কি হয়েছে রে তোর?' ওর মুখেচোখে ভয়, তারপর কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে ফিসফিস করে বলল, 'তু ভগমান বটিস! হামাকে মাপ করে দে'— বলে হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করল। আমি চিৎকার করে ডাকলাম, 'এই সুখিয়া!' গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনি সুখিয়া সুখিয়া সুখিয়া করে ঘুরপাক খেতে লাগল। ততক্ষণে ও মিলিয়ে গেছে সবুজ পাতার আড়ালে। ও কাঠ সংগ্রহ করে একটা আঁটি বেঁধে রেখেছিল, সেটাও পড়ে রইল। এরপর থেকে আমি গুহায় বসে বাঁশি বাজানো বন্ধ করব স্থির করলাম। অযথা একটা কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়ে আমিই তো বাড়িয়েছি। মাকে গিয়ে হাসতে হাসতে সব কথা বললাম— কেমন করে আমাকে সাক্ষাৎ ভগবান ভেবে সুখিয়া ছুটে পালাল। মা আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তা ও তো ভুল কিছু বলেনি রে। আমার ছেলে তো মানুষ নয়, সত্যিই দেবতা।' মা-র এই কথা আজও আমার কানে বাজে। আর যখনই কোনো ব্যবসায়িক খাতিরে শুধু টাকার জন্যে অকিঞ্চিৎকর কাজ কিছু করতে যেতে হয় মা-র কথা মনে পড়ে আর বলি, 'মাগো দেখো তোমার দেবতা-ছেলে টাকার জন্যে কীভাবে নিজেকে বিক্রি করছে, ওকে তুমি ক্ষমা করো।'

সে রাত্রে আমার ছটফট করে কাটল। যতবার চোখ বুজি দেখতে পাই সুখিয়ার সেই জলে ভেজা নগ্ন শরীর আর সেই চুল ঝাড়া! মনে পড়ে ওর সেই তপ্ত চুম্বন আর আলিঙ্গন। মনে মনে বুঝলাম—ওকে আমার পেতেই হবে, 'ওকে না হলে আমার চলবে না। কি করে পাব, কোথায় কেমন করে পাব তা জানি না। ও যে আমাকে পেতে চেয়েছিল তাতে তো কোনো সন্দেহই নেই। কাল হল আমার ওই বাঁশিটা। জঙ্গলে ও কাঠ আনতে গিয়েছিল—কাঠ নিয়ে ফেরার আগে স্নান করতে নেমেছিল—হয়তো প্রায়ই যায়। তাছাড়া মনে পড়ল কাঠের বান্ডিলটা তো ফেলে গিয়েছে—নিশ্চয় ওটা নিতে যাবে। ঠিক করলাম কাল সকাল হতেই চলে যাব মিকির পাহাড়ে, অপেক্ষা করব ওর জন্যে। হ্রদের ধারে পৌঁছুতে পৌঁছুতেই সকাল নটা বাজল। মিকির পাহাড় কাঁপিয়ে তখন কালো কালো উল্লুকগুলো উকুউকু চিৎকার শুরু করেছে। কুলিরা বলে উকু বাঁদর। চা-বাগানের ভিতর দিয়ে পথ, রংবেরঙের শাড়ি পরে মেয়েরা মাথায় টুকরি নিয়ে পাত তুলছে, সবাই প্রায় চেনা, জিজ্ঞেস করে, 'কাঁহা যাছিস গো ডাগদারবাবুর বেটা?' আঙুল

দিয়ে পাহাড়ের দিকে দেখাই। হয়তো সুখিয়াও এদের মধ্যে পাত তুলছে। ফুলন বলে একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করি, "হ্যাঁরে, ফুলন—সুখিয়া আজ পাত তুলতে আসেনি?" ফুলন অবাক হয়ে তাকায়, "সুখিয়া মানে সেই কুলি মেমের বিটি? না, ও তো বাগানের 'কাম ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে"—ফুলন বলে। "সে, কি? কবে গেল?" "এনেক রোজ হইল বাবু—ওই সায়েব মেনেজারটা পিছে লাগল তো" ফুলন বলে। "ও!"—বলে ওকে আর কিছু না বলে হ্রদের দিকে এগোলাম। কাঠের বাক্সিলটা যেখানে ছিল সেখানে এসে দেখি সেটা উধাও। হয়তো লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল কোথায়—আমি যাবার পর তুলে নিয়ে গেছে। কিংবা আরো সকালে এসে নিয়ে গেছে। ভীষণ মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাগানের কাজ ছাড়লে বাগানে তো কেউ থাকতে পারে না, তাহলে গেল কোথায়? ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে যখন দুপুর গড়িয়ে যায়, বাড়ি ফিরলাম। মা চিন্তা করছিলেন—"এত বেলা অবধি একা একা কোথায় ছিলি বাবা? উনি তো আবার জগাকে পাঠালেন বাগানে তোকে খুঁজতে।" চুপচাপ ভাত খেয়ে শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি সুখিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে। বিকেল বেলা উঠে আবার ছুটলাম সেই হ্রদের ধার, বেরোতে দেরি হয়েছে তাই এবার সাইকেল নিয়ে গেলুম যতদূর যাওয়া যায়। বাগান শেষ হয়ে যেখানে জঙ্গল শুরু সেখানে একটা গাছের গায়ে সাইকেল রেখে হাঁটতে শুরু করলুম। জঙ্গলটা আশ্চর্য নিস্তব্ধ—ঝিঁঝি পর্যন্ত ডাকছে না! হঠাৎ দূরে 'ফেউ' ডাকতে শুরু করল। 'ফেউ' ডাকা মানেই বাঘ বেরিয়েছে। তখন দেরি হয়ে গেছে। বাগানের কাজ সেরে কুলিরা সব কলঘরে পাত জমা দিতে গেছে। ওজন হবে, কে কত সের পাত তুলেছে, সেই হিশেবে পয়সা পাবে, আবার যে বেছে বেছে শুধু কচি কচি আড়াই পাতা তুলেছে তার দাম হবে বেশি। জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। 'ফেউ'-এর ডাকটা যেন ক্রমশ এগিয়েই আসছে। এবার ভয় করতে লাগল। সুখিয়া এসে থাকলেও এতক্ষণে নিশ্চয় চলে গেছে—মনকে এই সান্ত্বনা দিয়ে 'পিছন' ফিরলুম। ভাবলুম—'চুলোয় যাক! কাল থেকে আসবই না। মন থেকে মুছে ফেলে দেব ওকে'—এই ভেবে বাড়ি ফিরেই চুপচাপ শুয়ে একটা বই পড়তে শুরু করলুম। কিন্তু বই পড়তে ভালো লাগছে না—বাজনা শুনতে ভালো লাগছে না।—খেতে ভালো লাগছে না। এ আমার হল কি? একেই কি বলে প্রেমে পড়া? যাব না ভেবেও রোজই যেতাম সেই হ্রদের ধারে। এমনি করে চারদিন কেটে গেল, সুখিয়া আর এল না। আর থাকতে না পেরে হাসপাতালের ড্রেসার ঘনিয়াকে একদিন জিজ্ঞেস করলুম—"কোথায় থাকে জানিস সুখিয়া?" ঘনিয়া যা বলল তা এক অদ্ভুত ব্যাপার। বছর দুয়েক আগে নাকি সুখিয়া বাগানের কাজ ছেড়ে মিকিরদের বস্তিতে চলে গেছে। এক বুড়ো মিকিরকে নাকি বাপ বলেছে তার কাছেই ও থাকে।

"সেটা কোথায়?"—জিজ্ঞেস করলাম।

ঘনিয়া বলল—"এই যে পাহাড়টা, এটা পেরিয়ে এর পিছনে আরো একটা পাহাড় আছে, তাতে আছে মিকিরদের বস্তি, ওদের গাঁ।"

আমি বললাম, "আমাকে একদিন নিয়ে যাবি?" ঘনিয়া আঁতকে উঠে বলল যে ওই পাহাড়ি রাস্তা এত খাড়া যে এক মিকির ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না। ওদের মেয়েরা যে টুকরির মধ্যে বাচ্চা নিয়ে, মালপত্র নিয়ে মাথায় ঝুলিয়ে অবলীলাক্রমে খাড়া পাহাড়ে উঠে যায় তা আমি জানতাম। ওদের মেয়েদের যেমনি স্বাস্থ্য, এই চওড়া পায়ের গোছ, নিটোল শক্ত পাছা, মঙ্গোলিয়ান হলুদ গায়ের মধ্যে হাঁটু অবধি স্কার্টের মতো ওদের

নিজেদের তাঁতে বোনা নীল রঙের নিম্নবাস আর বুকে বাঁধা ওই নীল রঙেরই স্কার্ফের মতো এক ফালি কাপড়। ওদের সঙ্গে সুখিয়া কি করে মানিয়ে চলে? ঘনিয়া বলল, "সুখিয়া এখন অনর্গল লংবং করে মিকির ভাষায় কথা বলে আর ওদের মতোই পোশাক পরে। দেখলে কে বলবে মিকির মেয়ে নয়, চুলটা কেবল লাল।" আমি বলতে গেলাম আমি নিজে দেখেছি ওকে শাড়ি ব্লাউজ পরতে, বললাম না। বললাম, "তুই আমাকে রাস্তাটা দেখিয়ে দে, আমি নিজে চলে যাব। কাউকে বলবি না কিন্তু একথা।" ঘনিয়া বলল, "ডাগদারবাবু হামাকে মারি ফেলবেক।"—বলেই বলল, "ওকে দেখতে চাও তো কালই তো রবিবার—মিকির মেয়েদের সঙ্গে ও হাটে আসে সওদা করতে আর সবজি বেচতে। হাটে গেলেই দেখতে পাবে।" বুকটা আমার ধক করে উঠল। যাক, তাহলে দেখতে পাব? জিজ্ঞেস করলাম,"ঠিক বলছিস্ তো?" ঘনিয়া বলল, "হাঁ বাবু, ঝুট কেনে বলব। গেলেই কাল দেখতে পাবে।"

রাতটা আমার এপাশ-ওপাশ করেই কাটল। এক-একবার রাগও হল। আজ পাঁচদিন ধরে আমি জ্বলে মরছি আর ও দিব্বি আরামে আমাকে উস্‌কে দিয়ে মিকির বস্তিতে কাটাচ্ছে—একবার দেখতে পর্যন্ত এল না। ভাবলাম কাল একটা হেস্তনেস্ত করব। আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল—ওর সেই অপরূপ নগ্ন রূপ। মনে পড়ল ওর সেই ঘনিষ্ঠতা! ভাবলাম নিশ্চয় কোনো কারণ আছে যে জন্যে ও আসতে পারছে না। হাজার হোক একটা কুলিমেয়ে তো বটে—'ডাগদারবাবুর ছেলের' সঙ্গে মেলামেশায় তো ওর সর্বনাশ হতে পারে—সে ভয়ও তো আছে। তাছাড়া ওই খাড়া পাহাড় ডিঙিয়ে আসা—কাজেই ওকে দোষ দেব কি করে? আসল কথা আমার দুর্বলতা ছিল এত বেশি যে ওর ওপর রাগ করে থাকা বেশিক্ষণ ধরে আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবার ভাবলাম ঘনিয়াটা মিথ্যে কথা বলল না তো? গত একমাস ধরে আমি তো প্রতি রবিবারই বাবার সঙ্গে হাটে যাই, আমাদের বাড়ি থেকে সাইকেলে গেলে পাঁচ মিনিটও লাগে না। কই, কোনোদিন তো সুখিয়াকে দেখিনি! যতই মিকির পোশাক পরুক ওর লাল চুল আর মুখ দেখলে কি আমি চিনতে পারতুম না? আমি না চিনলেও ও তো নিশ্চয় আমাকে দেখেছে। যে একদেখায় বলে 'তু ডাগদারবাবুর বেটা না?'—সে কি করে আমাকে চিনল না? এইসব নানা কথা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। ভোর রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লাম। আটটা নাগাদ মা-র ডাকে ঘুম ভাঙল—"বাচু, তুই হাটে যাবি না?" আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম, "হ্যাঁ মা হাটে যাব। বাবাকে বলো আমি একটু পরে যাচ্ছি, উনি চলে যান।"

এই হাটের দিনগুলো ছিল ভারী সুন্দর আর বিচিত্র। অন্তত শতখানেক গরুর গাড়ি এসে জড়ো হত দূর দূর জায়গা থেকে। কেউ চারদিন কেউ পাঁচদিন ধরে গরুর গাড়ি চালিয়ে নিজেদের বেসাতি নিয়ে হাজির হত নানা রকমের শাড়ি জামা ফ্রক মনিহারি জিনিশ, নানা রকমের ফুল-তেল (সুগন্ধি তেল), পাউডার স্নো চুড়ি খেলনা, কত রকমের পুঁথির মালা, তামাক পাতার বান্ডিল, কত রকমের শাক সবজি মাছ হরিণের মাংস মুরগি ছাগল বুনোহাঁস তিতির কত জাতের কত ভাষার সব লোক যে জড় হত এই সব হাটদিনে! তাছাড়া নামত মিকিররা পাহাড় থেকে। পুরুষদের পরনে শুধু নেংটি আর কোমরে ঝোলানো রামদাও—মেয়েগুলোর দিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না—এমনি স্বাস্থ্য আর সুন্দর। বয়স্কা মেয়েরা কানে ফুটো করে বিশাল এক একটা আস্ত বাঁশের গোল ফালি রিং-এর মতো কেটে অবিশ্বাসভাবে কানের ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে

দেয়। আর তাম্বুল বলে একটি পদার্থ আছে আসামে যা কাঁচা সুপুরি মাটির তলায় পুঁতে রেখে তৈরি করা হয়—তার গন্ধ অনেকটা গুয়ের মতো, কিন্তু খেলে বেশ নেশা হয়। আমি বেশ কিছুদিন এই তাম্বুলের নেশাগ্রস্ত ছিলুম। আসামের সব জাতি উপজাতি এই তাম্বুল খায় পানের সঙ্গে। মিকিররাও খায়। মেয়েদের পোশাকের কথা আগেই বলেছি। এরা বেচতে আসে বিরাট বড় বড় লাল লঙ্কা—অসম্ভব ঝাল—নাম মিকির লঙ্কা। তাছাড়া লাল লাল একরকম সবজি হয়, ভীষণ টক। তার নাম কুদরুম টেঙ্গা। টেঙ্গা মানে টক, কুদরুম মানে বোধহয় মিকির ভাষায় লাল। মেটে আলু, তাম্বুল, জংলিপান, ওদের তাঁতে বোনা কাপড় ইত্যাদি বেচে মিকিররা চাল ডাল নুন তেল তামাক নানা রকম পুঁতির মালা কানের দুল কাচের চুড়ি এই সব সওদা করে চলে যায়। আমি হাটে যেতাম প্রধানত এই সব দেখতে আর লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট কিনতে। তখনকার দিনে শস্তায় Bioscope বলে এরকম সিগারেট পাওয়া যেত, আমি তাই কিনতাম। মা জানতেন আমি সিগারেট খাই। বাবা স্বভাবতই জানতেন না। একবার বাবা টের পেলেন, তারপর থেকে নিজের ব্র্যান্ড 'গোল্ড ফ্লেক' আরো দুপ্যাকেট বেশি করে এনে মাকে দিতেন আর বলতেন, "বাচুকে দিও। খাবেই যখন বাজে সিগারেট যেন না খায়।"

হাটে পৌঁছেই আমি মিকিরদের অঞ্চলটায় গিয়ে খুঁজতে লাগলাম কোথায় আছে সুখিয়া। তাকে কোথাও দেখলাম না। দু-দুবার চক্কর মেরে ঘোরার পর দেখলাম একটি মিকির মেয়ে, মাথায় নীল কাপড় বাঁধা। আমাকে দেখে উঠেই হাঁটতে শুরু করল। মিকির মেয়েদের মতো বুকে কাপড় বাঁধা, পরনে নীল স্কার্ট। কিন্তু হাঁটা দেখে চিনলাম, সুখিয়া। অল্পদূরেই সেই ঠক্‌ঠকি। ঠক্‌ঠকি পেরিয়ে আগে গেলেই জঙ্গল। ও সেই দিকে চলল। আমি চারদিক একবার দেখে নিয়ে ওর পিছু নিলাম। জঙ্গলে ঢুকে ওকে আর খুঁজে পাই না। চারদিক তাকাচ্ছি। তারপর ওর আওয়াজ পেলাম, 'নখিন্দর'। দেখি একটা গাছের আড়ালে ও দাঁড়িয়ে। আমি কাছে যেতেই ও আমাকে পাগলের মতো দুহাতে জড়িয়ে ধরে আমার কাঁধে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'তু কেনে হামাকে এত দুখ দিলি। হামি রোজ্ গিয়েছি তুর জন্যে। তু একবারও কেনে এলি না?' তুকে ভগ্‌মান ভেবেছি তাই কি তু গুস্‌সা করলি?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'কোথায় তুই গিয়েছিস? আমি তো ওই তালাবের ধারে রোজ তোর জন্যে সকাল-বিকেল গিয়েছি। তুই তো আসিসনি?' সুখিয়া অবাক হয়ে বলল, 'তালাবের ধারে? কেনে? হামি তো রোজ ওই গুফার মধ্যে তুর জন্যে বসে থেকেছি। তু আসবি—বানশুরি বাজাবি।' হা ভগবান! আমার নিজের হাত নিজে কামড়াতে ইচ্ছে করল। প্রায় তিন মাইল পথ পাহাড় ভেঙে প্রচণ্ড গরমে এ মেয়েটা এসে প্রতিদিন ওই গুহায় আমার জন্যে অপেক্ষা করেছে, আর আমি আর বাঁশি বাজাব না বলে ওই গুহার ধারেই যাইনি। ওকে খুঁজেছি হ্রদের ধারে। আর মিছিমিছি ওর ওপর রাগ করেছি। ও বলল,—"শুন, হামি ইতিয়া (মানে এখন) যাছি—উরা সক্ (সন্দেহ) করবেক। তু আজ চারবাজে গুফায় আসবি। হামি থাকব। আসবি তো? না, ভুলে যাবি?" বললাম, "নারে ভুলব কি করে?" ও আমাকে একটা ছোট্ট চুমো খেয়ে ছুটে চলে গেল, "আসবি ঠিক নখিন্দর"—এই কথা বলে।

চারটে বাজার কিছু আগেই গুহার মধ্যে গিয়ে আমি সেই পাথরটায় বসলাম। এটাই ছিল আমার বাঁশি বাজাবার আসন। বিশাল বড় গুহা। সামনের কিছুটা জায়গায় আলো, ভিতরটা থমথমে অন্ধকার। একটা ফাটল থেকে অনবরত ছড়ছড় শব্দ করে জল পড়ে

পড়ে ছোট ঝরনার মতো হয়ে সেই জল পাহাড় গড়িয়ে নীচে পড়ে। স্যাঁতলা প্রাগৈতিহাসিক গন্ধ। কতদিন ভেবেছি একটা টর্চ নিয়ে আসব ভিতরটায় কী আছে দেখব। কিন্তু শেষ অবধি সাহস হয়নি। গুহাটা যে গভীর তা শব্দের দূর থেকে আসা প্রতিধ্বনি থেকে বোঝা যায়। হয়তো যেখানে শেষ হয়েছে বেরোবার পথও আছে, নয়তো শব্দটা গুহা ভেদ করে বেরিয়ে দূরে চলে যায় কি করে? এ প্রশ্নের উত্তর এ জীবনে আর কোনোদিন জানা হবে না। খসখস শব্দে মুখ তুলে দেখি গুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে সুখিয়া। পরনে মিকির পোশাক। "সুখিয়া!" বলে উঠে গিয়ে ওর হাতটা ধরে বুকে টানতে যেতেই ও এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর এক দিক থেকে এল সেই কুলকুল হাসি। সুখিয়া হেসে সামনে এসে দাঁড়াল—"উটা তুমার সুখিয়া লয় গো।—ও হামার সই বটে—উর নাম লম্‌ফো—" বলে 'লম্‌ফো' 'লম্‌ফো' বলে ডাকল সুখিয়া। লম্‌ফো কাছে এল। এবার লম্‌ফোর মুখটা দেখলাম। জাপানি মেয়ের মতো দেখতে। এসে হেসে সুখিয়ার গা ঘেঁষে দাঁড়ল লম্‌ফো। সুখিয়া বলল—"ও ভগ্‌মান দেখতে এসেছে আর বানশুরি শুনতে। তু আজ বাজাবি না বানশুরি?" সুখিয়া একা না এসে আর একজনকে সঙ্গে এনেছে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কেন আনল সঙ্গে? ওকে ভগ্‌মান দেখিয়ে আর বানশুরি শুনিয়ে ওর নিশ্চয় কিছুটা গর্ব হবে। কিন্তু সেইটাই বড় হল? মেয়েদের মন বোঝে কার বাপের সাধ্যি। বললুম, "চল শোনাব বানশুরি।" ওরা দুজনে পাশাপাশি বসল আর সেই পাথরটার ওপর বসে চলল আমার বাঁশির আলাপ। চোখ বড় করে শুনতে শুনতে ওরা মাঝে মধ্যে কানে কানে কি সব ফিসফিস করতে লাগল। তারপর আবার শুনতে লাগল। এক সময় আমি থামলুম। কিন্তু প্রতিধ্বনিটা চলতে লাগল প্রায় মিনিট খানেক ধরে। হঠাৎ লম্‌ফো হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাকে গড় করল। তারপর সুখিয়া কানে কানে ওকে কিছু বলতে ও উঠে বাইরে চলে গেল। এবার সুখিয়া উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বসল আমার পাশে—"হামার উপর গুস্‌সা করছিস নারে নখিন্দর?"—বলে মুখে কপালে গালে চুমো খেতে লাগল—'সুন কেনে—হামি সব বলছি তুকে।' সুখিয়া যা বলল তা হচ্ছে এই যে পাহাড়ের ওপারেও মিকির গাঁয়ে নিশুতি দুপুরে আমার বাঁশি শোনা যায়। ওরাও ভাবে কোনো দেওতা বাঁশি বাজায়—আমার সঙ্গে দেখা হবার পর সুখিয়া গিয়ে ওদের বলে যে ও ভগ্‌মানকে দেখেছে এবং সামনে বসে বাঁশি শুনেছে। স্বভাবতই কেউ বিশ্বাস করেনি। তখন ও বলেছে—"চল তোদের দেখাব।" তাই যে কদিনই ও এসেছে ওর সঙ্গে এসেছে একটি দুটি মেয়ে এবং কোনোদিনই আমার দেখা না পেয়ে সবাই ধরে নিয়েছে ও মিথ্যেবাদী। মিথ্যে কথা বলা মিকিরদের মধ্যে পাপ। ওর হয়ে গেছে ভীষণ বদনাম। তাই আজ ও লম্‌ফোকে সঙ্গে এনেছে ভগ্‌মান দেখাবে আর বাঁশি শোনাবে বলে। আমি যেন ওকে ক্ষমা করি। "তু হামার মান বাঁচালি—বল তু হামাকে মাপ করলি। কালসে কোই আসবেক নাই। হামি একা আসব। বল, তু আসবি?" বললাম, "আসব রে নিশ্চয় আসব।" ও আমাকে আর একবার জড়িয়ে ধরে "আজ হামি যাচ্ছি। কাল তিন বাজে—হ্যাঁ?"—বলে চলে গেল।

এই ঘটনাগুলো যখন ঘটছে তখন আসামে এসে আমার থাকার প্রায় তিনমাস পেরিয়ে গেছে। ওদিকে যুদ্ধের মোড় ফিরেছে, মিত্রপক্ষ প্রচণ্ড আঘাতে ফ্যাসিস্টদের কোণঠাসা করছে। কলকাতায় লোকজন ফিরে আসছে। বোমা পড়ার ভয় আর নেই। কিছুদিন আগেই আমি মাকে বলতাম, 'মা তুমি বাবাকে বলো—আমি এবার কলকাতায়

ফিরে যাই। নতুন ফোর্থ ইয়ার ক্লাস শুরু হবে।' মা বলতেন, 'এসেছিস যখন কিছুদিন থাক না বাবা। তোর ভাইবোনেরা সবাই কত খুশি তোরা এসেছিস বলে। গেলে তো আবার কতদিন তোদের দেখব না।' কথাটা সত্যি। তাই চুপ করে যেতাম। সেদিন বাড়ি ফেরার পর রাত্রে বাবা হঠাৎ বললেন, 'বাচ্চু, তোমাদের কলকাতা যাবার টিকেট কনফার্মড। ২৪ মে সকাল নটায় ট্রেন ছাড়বে।'

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। ২৪ মে মানে আর তো মাত্র দশ দিন বাকি। আজ পনেরো তারিখ। সুখিয়াকে ফেলে আমায় চলে যেতে হবে? কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। বাবা বললেন, 'কি খুশি তো এবার?' ফিকে একটু হাসার চেষ্টা করে ঘাড় নাড়লাম। টিকেট করা ব্যাপারটা হাতিখুলি থেকে সোজা ছিল না। ৫০ কিলোমিটার দূরে নওগাঁ স্টেশনে লোক পাঠিয়ে টিকেট করতে হত। ক্যানসেল করতে গেলেও আবার সেই লোক পাঠানো। তখন ওদিকে বাস ছিল না—ম্যানেজার সাহেবকে অনুরোধ করে কোম্পানির চাপাতা বইবার লরি ধার করতে হত, কিংবা সাইকেলে যেতে হত। আমার অত সাহস ছিল না যে বাবাকে বলব, 'ক্যানসেল করুন। আমি এখন যাব না।' ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। প্রথম প্রেম যাঁরা করেছেন তাঁরা আমার বেদনাটা বুঝবেন। পরদিন তিনটে বাজার একটু আগেই পৌঁছে দেখি দিব্বি স্নানটান করে গোছা করে লাল চুলে খোঁপা বেঁধে গুছিয়ে শাড়ি পড়ে সুখিয়া বসে আছে। খোঁপায় জড়িয়েছে কি এক বেগনি ফুল। সামনে একরাশ পাহাড়ি সুগন্ধি শাদা ফুল, আর ও মালা গাঁথছে। আমাকে আসতে দেখে একটু সলজ্জ হেসে মালা গাঁথতে লাগল। জিজ্ঞেস করলুম, এ সব কি হচ্ছে রে সুখিয়া? সুখিয়া বলল, "হার বানাছি।" বলে মাথা নিচু করে মালা গাঁথতে লাগল। 'কেন? আজ কি তোদের পরব-টরব কিছু আছে?' 'হাঁ তো বটে! পূজা আছে।'—বলে সুখিয়া বলল, 'কেনে তু জানিস না?'—ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল। 'আমি কি করে জানব?' বললাম। সুখিয়া মালা গাঁথা বন্ধ করে ফুলটা মাটিতে রেখে কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'তু হামার দেওতা বটে। আগে তুকে গলায় হার দিব, পায়ে ফুল দিয়ে পূজা করব, তারপর'—চোখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি এনে বলল, 'তারপর তু যো কুছ মাঙ্গবি তাই দিব।'

আমি ওকে ধরতে গেলাম, ছিটকে সরে গেল।

—'না এখন হামাকে ছুঁবি না।'

সত্যিই সুখিয়াকে আমি ভালোবেসেছিলাম। ওর জন্য আমি জাহান্নামে যেতেও প্রস্তুত ছিলাম। আজ চার দশকেরও বেশি বছর পেরিয়ে গেছে, ও হারিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে। কিন্তু এখনো আমি ইচ্ছে করলে ওর ছোঁয়া পেতে পারি, ওর গন্ধ পেতে পারি, ওর গলার স্বর শুনতে পারি। 'নখিন্দর!' এই সুর আমি হারমোনিয়ামে বাজাতে পারি। ও আমার রক্তে মিশে গিয়ে ওর নিঃস্বার্থ—একেবারে আদিম ভালোবাসা দিয়ে আমাকে বহুগুণে ধনী করেছে। আমাকে বলত, 'তুকে তো হামি কোনোদিন পাব না, উতো হামি জানি! শুন, হামাকে একটা বেটা দিবি যে তুর মতো দেখতে হবেক? উকে হামি পালব। পেলে বড় করব। উ হামাকে মা বলবেক। বাস, উকে নিয়ে হামার দিন ওজার হয়ে যাবেক।'

সত্যি ওর ভালোবাসা ছিল খাঁটি সোনা। শুধু উজাড় করে দিতে জানত, চাইত না কিছু। তখনো ওকে বলিনি, যে আর আট দিনের মধ্যেই আমাকে চলে যেতে হবে। একদিন দুদিন অন্তর ও আসত। নিজের হাতে রান্না করে নিয়ে আসত কোনো দিন

হরিণের মাংস, কোনোদিন জংলি মুরগি বা তিতিরের মাংস। কতবার যে ওকে কিছু আমি দিতে চাইতাম, বলতাম 'তোর কি চাই বল'—কিছুতেই কিছু নিতে চাইত না। 'তু কি হামার কর্জ্জা, সব শোধ করে দিবি?'—জিজ্ঞেস করত হেসে। বলতাম, 'দূর, তোর ঋণ কি আমি জীবনে শোধ করতে পারব? তবু তুই যেমন আমায় দিস আমারও তো তোকে তেমনি কিছু দিতে ইচ্ছে করে।' বলত, 'তুকে তো বলেছি—হামার কি চাই। বলতাম, 'সেকি দিতে চাইলেই আমি দিতে পারি? নাকি, নিতে চাইলেই তুই নিতে পারিস? যদি পারিস তো নে···।' ম্লান হেসে বলত, 'এত নসিব হামার নেই, উ হামি জানি।' তারপরেই সুর পালটে বলত, 'আরে খানা তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল—চল খানা খা লে।'

এখন আর আমরা গুহায় যেতাম না। গিয়ে বসতাম সেই দুটো পাথরের পিছনের সবুজ গালিচায়। ও খাবার নিয়ে আসত কাঁসার বাসনে কাপড় বেঁধে। আমাকে হাত লাগাতে দিত না। নিজের হাতে খাইয়ে দিত আর বকর বকর করে নিজের জীবনের সং গল্প বলত। ওর মা এখনো আছে, রাঙ্গাজানের কাছে অনেক জমি আর কাঠের বাড়ি বানিয়ে দিয়ে গেছে সাহেব। গাঁয়ে আছে মহিষ, আছে শুয়োর মুরগি, সব আছে। ও থাকে না কেন মা-র কাছে? কারণ মা আবার শাদি করেছে। আর ওর সেই বাপটা একদিন ওকে জোর করে ওর ইজ্জত নষ্ট করে। দায়ের এক কোপে তার একটা হাত কেটে দিয়ে সুখিয়া পালায়। বাগানে কাজ নেয়। তখন ওর বয়স চোদ্দ। কিন্তু ওর বয়সী মেয়ের বাগানে একা থাকা সম্ভব নয়। সবাই পিছনে লাগে। তাই ও ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড় এক কুলি সর্দারকে 'মরদ' ধরল। লোকটা ছিল ভীষণ সন্দেহবাতিকগ্রস্ত আর মাতাল। ওকে প্রায়ই প্রচণ্ড মার মারত। কিন্তু দাঁত কামড়ে পড়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। কোথায় যাবে, কী করবে? লোকটা আবার ওকে ভালোও বাসত। আদর করত, সাধ্যমতো শাড়ি গন্ধতেল চুড়ি বালা কিনে দিত, আবার মারত। এমনি করে পাঁচ বছর তার সঙ্গে ঘর করল। সেই সময়ই ওর সঙ্গে আমার দেখা বেহুলা পালা করতে এসে। সেই সময়ই ও পড়ে গেল বাগানের নতুন সাহেব ম্যানেজারের চোখে। জানা লোক মারফত প্রস্তাব আসতে লাগল, 'সায়েব তোকে শাদি করবে, বিলেত লিয়ে যাবে।' কিন্তু ওর তাতে এতটুকু স্পৃহা ছিল না। ও ওর মাকে দেখে জানত যে কি লজ্জার এবং অপমানের জীবন এই কুলি মেমদের। ওর মাকে ওর সাহেব-বাবা মদ খেয়ে আরো সব সাহেব বন্ধুদের সামনে ন্যাংটো হয়ে নাচতে বাধ্য করত, যে চাইত তার সঙ্গে শুতে বাধ্য করত। ও যে কার মেয়ে তা ওর মা-ই জানে না। বড় হয়ে বুঝতে শিখে ও নিজেকে ঘেন্না করতে শিখল, আর শাদা চামড়ার লোকদের। ওর বাপ কে তা যদি ও জানত তাকে গিয়ে ও খুন করত, তারপর ফাঁসি যেত। মিকির মেয়েদের দেখে ওর ভীষণ ভালো লাগত। ওরা কারও গুলামি করে না, নিজেরা খেতিবাড়ি করে তাঁত বোনে, হপ্তায় হপ্তায় সওদা করে গাঁয়ে ফিরে যায়। কত স্বাধীন, কত সুন্দর, ও যদি অমন হতে পারত। ওর বরাবরই ছিল স্বপ্ন। একজন বুড়ো মিকির ওকে ভীষণ ভালোবাসত। তার নাকি ওর মতো দেখতে এক মেয়ে ছিল, সে মারা গেছে তাই ওকে ও চাইত নিয়ে যেতে। কিন্তু ও ভাবতে পারত না কি করে যাবে। যাকে ও মরদ করেছে তাকে বেইমানি তো করতে পারে না! কিন্তু একদিন বেইমানি করল ওর সেই মরদ। সায়েবের কাছে অনেক টাকা খেয়ে আর প্রচণ্ড মদ খেয়ে একদিন ওর মুখ-হাত বেঁধে মাঝরাত্তিরে তার গাড়িতে তুলে দিয়ে এল। কাকপক্ষীও টের পেল না। চৌকিদার আর বেয়ারাদের কড়া পাহারায় ওর

বন্দীজীবন শুরু হল সায়েবের বাংলোয় দোতলায়। তবে সায়েব কিন্তু ওকে কোনোদিন জোর করেনি। ওকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে জয় করবার চেষ্টা করত। ভালো ভালো খাবার, নতুন নতুন জামা কাপড়, খাঁটি সোনার গয়না, ভালো ভালো সেন্ট কত কী ওর জন্য আনত। ও ছুঁত না পর্যন্ত। এমনিভাবে দু-তিন হপ্তা কেটে গেল। একরাত্রে সায়েব যখন কেলাবে গেছে ও মাঝরাত্রে ওর শোবার ঘরের জানালা দিয়ে চাদর বেঁধে ঝুলিয়ে নীচের জঙ্গলে নেমে ছুটতে ছুটতে অনেক দূর গিয়ে একটা ছোট গাছে চড়ে সারারাত কাটাল। ও জানত পরদিন রবিবার—হাটদিন। সকাল হতেই ও হাটে এসে সেই মিকিরকে অসমীয়ায় বলল, বাবা আপোনাক ময় বাবা কহিছুঁ—আপনি মোক আশ্রয় দিঅক' (আপনাকে আমি বাবা বলেছি—আপনি আমাকে আশ্রয় দিন)। সানন্দে ওকে গ্রহণ করল ওর সেই মিকির বাবা। মিকিরদের গায়ে হাত দেবে এমন কোনো লোক নেই, সেটা ও জানত। রামদাও-এর এক কোপে ওরা বাঘকে পর্যন্ত দুটুকরো করে ছাড়ে। ওর এই মিকির বাবা ওকে আশ্রয় দিল। সে আজ বছর দুয়েক আগেকার কথা। তারপর থেকেই ও থাকে মিকির বস্তিতে। ওর মা-র সাহেব মরদ যাবার আগে বিটির জন্য দুহাজার টাকা আলাদা দিয়েছিল। সেই টাকা ওকে মা দিয়েছে। তাই দিয়ে ও অনেক জমি জিরেত কিনেছে। গরু ছাগল হাঁস মুরগি সব আছে। মিকিরদের মতো না করে ওর জমিতে ও ফুলকপি বাঁধাকপি আলু বেগুন টম্যাটো সব চাষ করায়। তাই দেখে এখন মিকিররাও কেউ কেউ তা শুরু করেছে। তাই নিয়ে ওর বেশ একটু গর্ব আছে মনে হল।

বললাম, 'তাহলে তো তোর কাছে গিয়ে থাকলে আমার আর খাওয়াপরার কথা ভাবতে হবে না?' সুখিয়া বলে উঠল, 'উরে হামার মরদরে, তু যাবি হামার কাছে? থাকবি হামার সঙ্গে? আর ডাগদারবাবুটা হামার গলাটা চাকু দিয়ে কাটি দিবেক'—গলার কাছে হাতটা নেড়ে মুখে শব্দ করল—'খচাং'। বলে হাসতে হাসতে আমার কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তখন ওকে বললাম যাবার কথা। বললাম, 'সুখিয়া আর চারদিন পরে চলে যাচ্ছিরে।' সুখিয়া যেন চমকে উঠে বলল, 'কুথা?'—

'কলকাতা। এই সামনের মঙ্গলবার। শুক্র শনি রবি সোম, বাস এই চারদিন বাকি।' সুখিয়া বলল, 'আজ তো শুকরবার, তিন দিন বল।'

তারপর বলল, 'আগে কেনে বলিসনি, তাহলে হামি রোজ তুর কাছে আসতাম।' বললাম, 'ওই পাহাড় ডিঙিয়ে রোজ আসা, কত তোর কষ্ট হয়, তাই বলিনিরে।' ওর মুখ রাগে থমথমে লাল হয়ে উঠল। বলল, 'কোসটো! আর তু চলে গেলে হামি খুব আরামে থাকব—বটে?'—বলে উঠে কিছুদূর গিয়ে আমার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে রইল। আজ ও মিকির পোশাক পরে এসেছে।—ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। অনেকক্ষণ আসছে না দেখে ওর কাছে গিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে ওকে সামনে ফেরাতে দেখি দুগাল বেয়ে চোখের জলের ঢল নেমেছে। তাই দেখে আমার যেন বুক ভেঙে কান্না এল। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলুম। তারপর একসময় ও সামনে নিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে আমার মাথাটা ওর কোলে নিয়ে বসল। সব কথা যেন শেষ হয়ে গেছে, ও আমার চুলের মধ্যে আঙুল বোলাতে লাগল। আর মাঝেমধ্যে আমার কপালে চুমো খেতে লাগল। হঠাৎ সেই ফেউটা যেন খুব কাছেই ডেকে উঠল। আমি চমকে তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। এতক্ষণ লক্ষই করিনি যে জঙ্গলে অন্ধকার নেমে এসেছে। সুখিয়া আমার হাত ধরে বলল, 'চল, দের হইয়ে গেছে।'

বললাম, 'বাঘ বেরিয়েছে।'

সুখিয়া বলল, 'ডর নেই চল। বাতাসটা পুবে বইছেক তো আর উ আছে পচ্চিমে হামাদের বাস পাবেক নাই।'

—'কিন্তু তুই একা কি করে ফিরে যাবি?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

'—ফিরবক নাই—মা-র লগে থাকব। রাঙ্গাজানে।' রাঙ্গাজান আমাদের হাতিখুলি বাগান থেকে প্রায় দেড় মাইল দূর—(আমার বাবার এলাকার মধ্যেই।)

—'কিন্তু তোর বাপ?'—জিজ্ঞেস করলুম। 'উ এখন একদম বুঢ্ঢা হইয়ে গেছে, চোখে ভি দেখে না, হামাকে বলে, যো হইয়ে গেছে সো হইয়ে গেছে। তু ফিরে আ সুখিয়া।'—বলে হাসল সুখিয়া। তারপর বলল, 'ই কদিন আর গাঁয়ে ফিরবক নাই। তালে তুকে রোজ পাব।' হাসপাতালটার কাছবরাবর এসে ও একটু আদর করে বলল, 'যা। কাল ঠিক এক বাজে, হাঁ?'—বলে ও বাঁ দিকে মোড় নিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল। সারা পাহাড় কাঁপিয়ে সেই ফেউ তখন চিৎকার করছে—ফেউ! ফেউ! ফেউ!

দশ

তখন আমি জানতাম না, জেনেছি বহু পরে যে সারা বাগান জুড়ে আমাকে আর সুখিয়াকে নিয়ে একটা গুঞ্জন উঠেছে, ফিসফাস শুরু হয়ে গেছে। বাবার কানেও উঠেছে এবং মাকেও বাবা বলেছেন। বাবা নাকি মাকে বলেছিলেন, 'ওকে কিছু বোলো না ও যা করছে করুক—কোনো বাধা দিতে যেওনা, তাতে ফল খারাপ হবে। ও যেন জানতেও না পারে যে আমরা জানি। ওকে শুধু তাড়াতাড়ি কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে হবে।' এবং সেই প্ল্যান অনুযায়ীই আমার কলকাতা যাবার টিকিট বাবা করিয়েছিলেন মা-র অনিচ্ছা সত্ত্বেও। তখন বুঝতাম না, পরে বুঝেছিলাম যে কুলি মেয়েরা আমাকে দেখলেই কেন মুখ টিপে হাসত, আর এ ওর কাছে কানাকানি করত। কেউ কেউ বলত, 'হেই—ডাগদারবাবুর বেটা! হামাদের দিকে ভি একটু দেখ—হামরা কি এতই খারাপ'—বলে হেসে গড়িয়ে পড়ত।

বাবা যে সব জেনেও আমাকে কিছু বলেননি বা কোনো নিষেধ করেননি সেটা আমার জীবনের ছিল একটা মস্তবড় শিক্ষা। আমার নিজের ছেলেমেয়েরাও অনেকে আজ বড় হয়েছে, প্রেম করেছে, কেউ বিয়ে করেছে, কেউ করবে। নিজের নিজের সঙ্গী নির্বাচন ওরা নিজেরাই করেছে। আমার ছেলে বম্বেতে একজনের সঙ্গে প্রেম করে আমেরিকায় আর একজনের প্রেমে পড়ল।

আমি কোনো ব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করিনি বা করতে দিইনি। এখন সে নিজেই স্থির করে নিয়েছে কাকে না হলে ওর চলবে না, কে ওর সারাজীবনের সাথী হতে পারবে। আমার দুই বোনের একজন আপন মামাকে আর একজন আপন মাসতুতো ভাইকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। বাড়িসুদ্ধ ঝড় উঠেছে। শুধু আমার অকুণ্ঠ সমর্থন ওরা পেয়েছে। দক্ষিণদেশে মামাকে বিয়ে করা অত্যন্ত কুলীনবিবাহ বলে আজও প্রচলিত মাতৃপ্রধান সমাজের প্রবহমান সংস্কার হিশেবে, আর ইওরোপিয় সমাজে তো cousin-কে বিয়ে করা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার হিশেবে গণ্য। মনুষ্য সমাজে যা বিধি হিশেবে গৃহীত তা যে কোনো দেশেই হোক না—তার মধ্যে আর যাই থাক অন্তত তথাকথিত 'পাপ' বলে কিছু নেই—এই চিন্তাধারার ভিত্তিভূমি আমার বাবাই আমার মানসিকতায় সৃষ্টি করেছিলেন।

সুখিয়া বলত, 'হামার দেওতা তু কোতো বোড়ো হবি কোতো টাকা কামাবি, সোন্দর সোন্দর মেয়ে তুমে ঘিরে ধরবেক, হামার কানে আসবে আর হামি সব সুনবো দূর থেকে আর হামার ঘমন্ত (গর্ব) হবে কি হামার দেওতা আজ কোতো বোড়ো হইছেন।. তোখন তু সুখিয়াকে ভুলে যাবি—হাঁ না বটে?' বলতাম, 'তোকে জীবনে আমি ভুলব না রে। ও বলত, 'সব ঝুট!'—রোজ জিজ্ঞেস করত, 'যাবি তো ফির কবে লৌটবি?' বলতাম,

'জানি না, একবছর কিংবা দুবছর হবে।' ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত 'বাস, তবে তুর সুখিয়াকে আর তু পাবি না—'

একবার ওকে বলেছিলাম, 'সুখিয়া তুই একটা ভালো মরদ দেখে সঙ্গী কর। একা একা থাকা তো ভালো নয় তোর মতো একটা মেয়ের পক্ষে—'

ও চোখ বড় বড় করে বলল, 'বারে—একটা ভালো মরদ দেখে শাদি তো করলাম, একটা লড়কীর আবার কটা মরদ থাকে?'—

বুঝতে না পেরে বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তাই নাকি? কবে করলি? আমাকে বলিসনি তো?' ও হেসে বলল, 'এই তো সাতদিন আগে করলাম, গলায় হার দিলাম, পায়ে ফুল দিয়ে পূজা করলাম—কেনে তু জানিস না বটে?'··· ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম। ভীষণ কষ্ট লাগল, বললাম, 'সুখিয়া, ওটা তো কাজের কথা নয়—তোকে সবসময় কাছে পাব সে আমার ভাগ্যে তো নেই—কিন্তু তোকে তো জীবনটা কাটাতে হবে আমাকে বাদ দিয়েই?'

ও বলল, 'সো তো হামি জানি। তু জানিস একটা পাহাড়ি ফুল ফোটে রাত বারোটায়—মরে যায় সোকাল বেলা—কিন্তু তার কী মিঠা বাস!—নাম নাগচম্পা—হামার দেওতার ভালোবাসা সেই নাগচম্পার মতো। সো তো হামি জানি—জেনেই তো নাগচম্পাকে শাদি করেছি'—বলে হাসত। কথাচ্ছলে একদিন ও বলেছিল যে মিকিরদের মুখিয়ার ছেলে ওকে শাদি করার জন্যে অনেকদিন ওর পিছনে লেগে আছে, ও তাকে হ্যাঁ না কিছু বলেনি, কেননা মিকিররাও চায় যে ও একজন মিকিরকে শাদি করে ওদের একজন হয়ে যাক। কিন্তু ওর পছন্দ নয়। ভীষণ তাম্বুল খায়, মুখে বিশ্রী গন্ধ। সে অবশ্য বলেছে শাদি করলে ও তাম্বুল খাওয়া ছেড়ে দেবে। ও যখন একথা বলছে তখন আমি বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে তাম্বুল খাচ্ছি। ওর কথা শুনে আমি 'থুঃ' করে তাম্বুল ফেলে দিতেই ও কুলকুল করে ওর সেই অদ্ভুত হাসি হেসে উঠল, 'তুর কথা আলাদা, তু কেনে ফেলছিস?' বলে ঠোঁটে চুমো খেল। সেই দিনই যে ওকে পাওয়ার আমার শেষদিন তা কি জানতাম? ওর কথাটাই যে সত্যি হবে—'বাস, তবে তো তুর সুখিয়াকে আর পাবি না'—তা কি করে ভাবব? যখন শেষে চলে যাচ্ছি ও একটুও কাঁদল না। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'তু ভালো থাকিস হামার দেওতা, হাঁ?'—সেই ওর শেষ কথা। এরপর ছমাসের মধ্যেই আবার আমার আসাম আসার আর একটু সুযোগ হল একটা মিলিটারি এনটারটেনার্স দলে বাঁশি বাজিয়ে হিশেবে যোগ দিয়ে। শুধু সুখিয়াকে দেখতে পাব এই ভেবেই যোগ দিলাম, সে ট্যুরের কথা পরে সংক্ষেপে বলব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন তুঙ্গে। আপার আসাম প্রায় পুরোটাই তখন মিলিটারি অঞ্চল ঘোষিত। ইভ্যাকুয়েশন করে সব অসামরিক লোকদের সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এই গোটা অঞ্চলে বর্মার বর্ডার পর্যন্ত সর্বত্র দেড়মাস যাবৎ প্রোগ্রাম করে হাতিখুলি ফিরলাম বাবা-মাকে অবাক করে দিয়ে। ফিরেই ঘনিয়ার কাছে জানতে চাইলাম সুখিয়ার কী খবর। ওকে একটা খবর দিতে হবে আমি এসেছি, হাটবার পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমার পোষাবে না। ঘনিয়া চুপ করে রইল।—'কি হয়েছে রে ঘনিয়া? সুখিয়া ভালো আছে তো?'

ঘনিয়া ঘাড় নাড়ল। তারপর যা বলল তা হচ্ছে বর্ষার দিনে পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে পা পিছলে সুখিয়া একটা খাদে গিয়ে পড়ে। দুটো পা-ই ওর এমনভাবে ভেঙেছে যে আর কোনোদিন ও চলতে পারবে না।

কেন জানি না কদিন ধরেই মনে হচ্ছিল একটা কিছু দুঃসংবাদ শুনব। আমি চলে

যাবার দিন পনেরোর মধ্যেই নাকি এই কাণ্ড ঘটে।

—'তারপর এখন কেমন আছে?'

ঘনিয়া যা বলল তা হচ্ছে এখন ও ভালো আছে। বাঁশ কেটে দুটো ক্রাচের মতন বানিয়ে নিয়েছে, তাতে ভর করে একটু-আধটু চলা ফেরা করতে পারে। আর সেই মুখিয়ার ছেলে ও পঙ্গু হয়ে যাবার পরেও যখন ওকে শাদি করতে চাইল ও আর তাকে না করল না। ওর সেই মরদই ওর খেতিবাড়ি দেখাশোনা করে, রবিবার করে হাটে আসে। তবে সুখিয়া আর জীবনে কোনোদিন পাহাড় ভেঙে নীচে নামবে না।

হাটবারের দিন আমাকে দেখেই লম্‌ফো আমার কাছে এল। আমি বললাম—আমি সব শুনেছি। মিকিররা সবাই মোটমাট অসমীয়া ভাষায় কথা বলে। আমি ওকে অসমীয়াতে বললুম, 'একবার আমি সুখিয়াকে শুধু দেখতে চাই। ওকে জিজ্ঞেস করে এসে ও যেন আমাকে জানায়।'

আমাদের সেই হ্রদের ধার, সেই গুহা আর দুটো পাথরের পিছনের সেই মখমলের বিছানা আমার কাছে এখন যেন বিভীষিকার মতো মনে হতে লাগল। আর কোনোদিন জীবনে ওদিকে যেতে পারব না তা আমি জানতাম। লম্‌ফোর জন্য প্রতীক্ষা করে রইলাম। সুখিয়া কি রাজি হবে? পরের হাটে লম্‌ফো এসে খবর দিল যে সুখিয়া আর আমাকে দেখতে চায় না।—যে অটুট শরীরে আমি ওকে দেখেছি ও চায় তাই যেন আমার স্মৃতিতে থাকে। আর আমি যেন মনে করি আমার সে সুখিয়া মরে গেছে।

জানি না এতদিনে হয়তো সে মরেই গেছে। কিন্তু আমার শরীরে রক্তচলাচল যতদিন বজায় থাকবে আমার সুখিয়া ততদিনই বেঁচে থাকবে আমার দেহের প্রতিটি অণুপরমাণুতে।

সুখিয়ার কথা এত দীর্ঘ করে বললাম এই জন্য যে ও আমার প্রথম প্রেমিকা বা প্রণয়িনী। পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন যদি তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে থাকি। সবাইকার কথা তো বলা যাবে না। তথাকথিত নিচুজাতির দো-আঁশলা কুলির মেয়ে, না জানে লিখতে, না জানে পড়তে। কাজেই এ সব তথ্যের প্রকাশ তো বেঁচে থাকলেও কোনোদিনই ও জানবে না। তাই সাহস হল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর আমার এত অন্তরঙ্গ এত গোপন সব কথা বলবার। আমি জানি সুখিয়া জানলেও আমাকে ক্ষমা করবে।

ত্রিবান্দ্রমে সলিল চৌধুরী